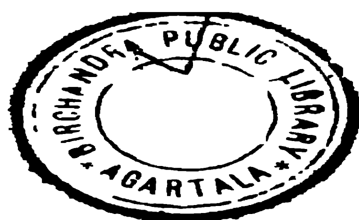
চট্টগ্রাম বিপ্লব

মনোরঞ্জন ঘোষ



বিশ্বাস পাবলিশিং হাউস
৫/১এ, কলেজ রো, কলিকাতা-৯

প্রকাশক :
শ্রীবীরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস
৫/১এ, কলেজ রো, কলিকাতা-৯

নূতন সংস্করণ : এপ্রিল ১৯৫০

প্রচ্ছদ :
শ্রীপ্রভাত কর্ম্মকার

দাম ছয় টাকা মাত্র

মুদ্রক :
শ্রীঅজিতকুমার দত্ত
রামকৃষ্ণ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
৪৪, সীতারাম ঘোষ ষ্ট্রীট
কলিকাতা-৯

উৎসর্গ

স্বাধীনতা সংগ্রামের বহু শহীদ ও সৈনিকের দেশ
চট্টগ্রামকে—

এই লেখকের ঃ

কিশোরদের জন্য

- পরিবর্তন
- প্রত্যাবর্তন
- মঙ্গলের অমঙ্গল
- পরিবর্তন (নাটক)
- জীবন মৃত্যু পায়ের ভৃত্য (যন্ত্রস্থ)

বয়স্কদের জন্য

- আমাদের শহর (নাটক)
- অগ্নিযুগ (যন্ত্রস্থ)

প্রথম সংস্করণের ভূমিকা

এই গ্রন্থের প্রতি ঘটনা সত্য এবং চরিত্রগুলি পার্থিব। কোথাও কল্পনার সাহায্য নেওয়া হয়নি। রচনাটি মূলতঃ ছায়াচিত্রের জন্য। তাই রচনার আঙ্গিক একটু চিত্রনাট্যধর্মী।

এই রচনায় তথ্য দিয়ে সাহায্য করেছেন অম্বিকা চক্রবর্তী, অনন্ত সিং, গণেশ ঘোষ, আনন্দ গুপ্ত, কালি দে, অর্ধেন্দু গুহ, কল্পনা যোশী (দত্ত) ও সুহাসিনী গাঙ্গুলি।

আর একজনের সাহায্য সর্বান্তঃ করণে স্বীকার করি, যাঁর উৎসাহে এই রচনা সম্ভব হলো। তিনি হচ্ছেন নগেন সেন (জুলুদা)—চট্টল বিপ্লবীদের অস্ত্রগুরু, মেসোপটেমিয়া যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী প্রথম বাঙালী সৈন্যদল 'ফর্টিনাইন বেঙ্গল রেজিমেন্টে'র একজন ও প্রাক্তন রাজবন্দী।

এঁদের সকলকে আমার সকৃতজ্ঞ ধন্যবাদ জানাই।

রচনা পূর্ণাঙ্গ করার জন্যে সূর্য সেনের অন্তিম মুহূর্তের কাহিনী সংগ্রহ করেছি সরকারী ঘাতক শিবু বাগদীর কাছ থেকে।

এই গৌরবময় বৈপ্লবিক সংগ্রাম কাহিনী রচনার যা কিছু কৃতিত্ব তা আমায় সাহায্যকারী বিপ্লবীদেরই প্রাপ্য। রচনার দোষ-ত্রুটি আমারই অক্ষমতা।

ঘড়িঘর, টালিগঞ্জ
১৫ই অগষ্ট ১৯৪৮

মনোরঞ্জন ঘোষ

মনোরঞ্জন ঘোষ

দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা

এই গ্রন্থের প্রথম সংস্করণের শেষ ফর্মা যখন ছাপা হচ্ছিল, সেই সময়— ১৭ই সেপ্টেম্বর ১৯৪৮ সালে—প্রেসের উপর এক সরকারী হুকুমনামা আসে যে পশ্চিমবঙ্গ নিরাপত্তা আইন অনুসারে গ্রন্থটি কর্তৃপক্ষের অনুমোদন ব্যতীত প্রকাশ নিষিদ্ধ। উক্ত আইন বলে মুদ্রিত সমস্ত কপি ও পাণ্ডুলিপি সরকারী হেপাজতে চলে যায়।

প্রকাশক 'ভারতী-ভবন' সংস্থার শ্রীবীরেন্দ্রনাথ ঘোষ দৃঢ় কণ্ঠে কংগ্রেসী সরকারের স্বৈরাচারী আচরণের নিন্দা করেন। প্রতিবাদে স্বাধীন সদাশয় সরকার বিন্দুমাত্র কর্ণপাত না করে ফ্যাশিষ্ট-শাসক সুলভ নির্দেশ দেয় যে গ্রন্থটির কিছু কিছু অংশ বর্জন করতে হবে।
নিরুপায় প্রকাশক আর্থিক ক্ষতির হাত হতে রক্ষা পাওয়ার জন্য সরকারী অন্যায় আদেশের কাছে মাথা নত করে গ্রন্থটি কোন রকমে প্রকাশ করেন।

পরাধীন দেশের রাজশক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রামের ইতিবৃত্ত যে স্বাধীন দেশের সরকারের কাছেও অপ্রীতিকর হবে তা প্রকাশক ঘুণাক্ষরেও কল্পনা করেননি। ফলে এই গ্রন্থটি হয় নিরাপত্তা আইনের প্রথম বলি।

প্রেসের উপর সরকারী আদেশ যখন আসে তখন আমি মেদিনীপুরে গিয়েছিলাম আমাদের নির্মিত জাতীয় সংগ্রামের চলচ্চিত্র 'ভুলি নাই' (প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ যোগ্য যে এই ছবিটিরও বহু অংশ সরকারী সেন্সারে বর্জিত হয়) সেখানকার দেশপ্রেমিক সংগ্রামী ব্যক্তিদের ও শহীদ ক্ষুদিরামের মাতৃসমা জ্যেষ্ঠা ভগিনীকে প্রদর্শন করার জন্য। কলিকাতায় ফিরেই আমি স্থির করি মূল রচনার একটি কপি সরকারী হেপাজত হতে গোপনে সংগ্রহ করতে হবে। কারণ বিপ্লবী বীরদের সম্পূর্ণ কাহিনী দেশবাসীর পক্ষে জানা একান্ত প্রয়োজন। চট্টগ্রাম বিপ্লব আমাদের জাতীয় সংগ্রামের ইতিহাসে যেমন এক অবিস্মরণীয় অধ্যায়, ঠিক তেমনি 'চট্টগ্রাম বিপ্লব' প্রকাশ কার্যটিও আমার কাছে অবিস্মরণীয়। গোয়েন্দা-পুলিশের দৃষ্টি হতে আমার মূল রচনাকে কিছুকাল গোপনে রক্ষা করার জন্য কৃতজ্ঞ আছি তদানীন্তন আইন সচিবের এক আত্মীয় ও ডিটেকটিভ ডিপার্টমেন্টের ডেপুটি কমিশনারের এক আত্মীয়ার নিকট।

দুঃখের বিষয় স্বাধীনতার পরেই এই গ্রন্থের উপর ভিত্তি করে যে চলচ্চিত্র নির্মাণের প্রস্তুতি চলছিল, তা শাসকবর্গের বাধা ও 'তথাকথিত' বিপ্লবীদের শাসানির ফলে বন্ধ করে দিতে হয়।

সুদীর্ঘ বাইশ বৎসর পরে এই গ্রন্থের বর্জিত অংশগুলি সংযুক্ত করে দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশের পিছনে আছে 'আমি সুভাষ বলছি' খ্যাত-লেখক বন্ধুবর শ্রীশৈলেশ দের উৎসাহ ও সাহায্য। অন্তরঙ্গতার জন্য তাঁকে ধন্যবাদ জানানো বৃথা।

খিদিরপুর, গ্রন্থকার



সূর্য সেন



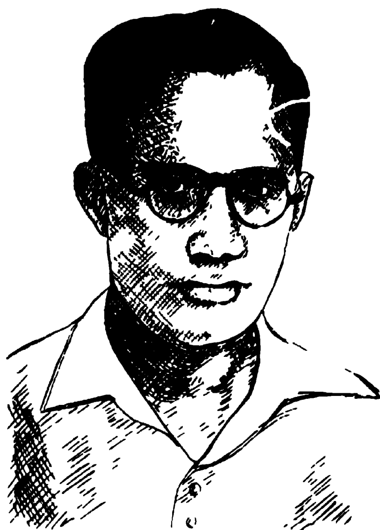
লোকনাথ বল



অনন্ত সিংহ



গণেশ ঘোষ



অম্বিকা চক্রবর্তী



নরেশ রায়, ত্রিপুরা সেন ও বিধু ভট্টাচার্য।



প্রভাস বল, শশাঙ্ক দত্ত ও নির্মল লালা।



টেগরা ও মতি কানুনগো।



তারকেশ্বর দস্তিদার



রামকৃষ্ণ বিশ্বাস



কল্পনা দত্ত (যোশী)



প্রীতিলতা ওয়াদ্দাদার

কথা কও, কথা কও
স্তব্ধ অতীত, হে গোপনচারী, অচেতন তুমি নও—
কথা কেন নাহি কও?
তব সঞ্চার শুনেছি আমার মর্মের মাঝখানে,
কত দিবসের কত সঞ্চয় রেখে যাও মোর প্রাণে।

—রবীন্দ্রনাথ

চট্টগ্রাম। কর্ণফুলী নদীর মোহনায় সমুদ্র উপকূলে পার্বত্য শহর। লঘু তরঙ্গ তুলে বয়ে চলে নদী, অশান্ত বঙ্গোপসাগরের উচ্ছল ঢেউ এসে অনিবার আঘাত করে শহরের প্রান্তে, শান্ত মাটির বুকেও ঢেউ উঠে—অচল পাহাড়ের সারি। বিস্ময়কর প্রাকৃতিক সমাবেশ।

কিন্তু আরও বিস্ময় এই শহরের বুকে সঞ্চিত ছিল। নদীর ঢেউ, সমুদ্রের ঢেউ আর পাহাড়ের ঢেউকে ছাড়িয়ে গেল অপূর্বতায় রাজনীতিক বিপ্লবের ঢেউ। শৌর্যে, বীর্যে ও বেদনায় অমর হলো চট্টগ্রাম।

সারা ভারতবর্ষ একদিন চমকে শুনল চট্টগ্রাম স্বাধীন, সেখানে হয়েছে বৃটিশ শাসনের অবসান। শুনল স্বাধীনতার সৈনিকেরা সশস্ত্র সংগ্রামে সাম্রাজ্যবাদকে নিশ্চিহ্ন করেছে। সকলে সাগ্রহে জানতে চায়—

কাদের কণ্ঠে গগন মন্থে
নিবিড় নিশীথ টুটে?
কাদের মশালে আকাশের ভালে
আগুন উঠেছে ফুটে?

কিন্তু এ প্রশ্নের সঠিক জবাব সেদিন সকলে পায় নি। বৃটিশের নির্মম শাসনের নাগপাশ সংবাদ ও সত্যের কণ্ঠরোধ করে রাখল। তাদের শক্তি, সাহস, সামর্থ ও সাফল্যের কথা দেশবাসীর কাছ হতে সাবধানে গোপন করে রাখা হলো। ইতিহাসের পাতায় ঢেলে দেওয়া হলো কালি, ঘটনা হলো বিকৃত। বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানের সরকারী নামকরণ হলো 'অস্ত্রাগার লুণ্ঠন', হলো বিচারের অভিনয়। যারা বলতে পারতো তাদের কারও কণ্ঠ চিরতরে রুদ্ধ করে দেওয়া হলো ফাঁসির রজ্জুতে, কত জনকে নীরব করে রাখা হলো কারা প্রাচীরের মাঝে, দুস্তর সমুদ্রের মাঝে নির্জন দ্বীপে—আন্দামানে।

বহু বৎসর পরে কয়েকজনকে আজ কাছে পেয়েছি। তাদের ঘিরে ধরি, অনুরোধ করি—বলো, বলো, সেদিনের কথা, বলো তোমাদের কাহিনী।

কিন্তু কাহিনী শোনাবার মত অবসর তো তাদের নেই। তাদের সংগ্রাম কি শেষ হয়েছে? বিদ্রোহী রণক্লান্তদের শান্ত হয়ে গল্প বলার সময় এসেছে কি?

তবু শত ব্যস্ততার মাঝে ক্ষণিক অবসরে তারা শোনায়। অবাক হয়ে শুনি তাদের ত্যাগ দুঃখ কষ্ট নির্যাতনের কাহিনী। প্রশ্নের পর প্রশ্ন করি। নিজেদের কথা এঁরা নিজের মুখে সব বলতে চান না। ঘটনাধারার সঙ্গে তারা একান্তভাবে জড়িত, তাই সব কিছুতে ব্যক্তিগত ছাপ এসে পড়ে। এই নীরব কর্মীরা কোনদিন নিজেদের প্রচার করতে চান না। তাই তাঁরা বলতে গিয়ে দ্বিধাভরে থেমে যান লজ্জায়, আত্মপ্রচারের আশঙ্কায়।

ঐ টুকরো-টাকরা কথাগুলি মনের পটে রেখা টানে। অতীতের অন্ধকার যবনিকায় ভেসে উঠে ছায়াছবি—ভাসা ভাসা সে ছবি, তাতে কল্পনার রং নেই, আছে বাস্তবের প্রতিচ্ছবি······

ওরা বীর, ওরা আকাশে জাগাতো ঝড়
ওদের কাহিনী বিদেশীর খুনে
গুলি, বন্দুক, বোমার আগুনে
আজো রোমাঞ্চকর।

—সুকান্ত ভট্টাচার্য

১৯২৮ সালের শরৎকালে চট্টলের রাজবন্দীরা মুক্তি পেয়ে একে একে ঘরে ফিরে আসেন। চট্টগ্রামের পথে অনন্ত সিংয়ের বেবি অস্টিন মোটর প্রায়ই দেখা যায় ছেলের দলে বোঝাই। সদালাপী গণেশ ঘোষের কাপড়ের দোকানে আবার ছেলেদের ভিড় জমে। ছাত্রনেতা লোকনাথ বল জনপ্রিয়তার জন্য 'লোক বল' বলে খ্যাত হন। স্টেশনের পথে সংবাদ পত্র হাতে ছাতা মাথায় খর্বাকার সূর্য সেনের মূর্তি প্রায় নজরে পড়ে। কংগ্রেস অফিসে ঘনকৃষ্ণ শ্মশ্রু শোভিত অম্বিকা চক্রবর্তী ও দীর্ঘদেহী সুপুরুষ নির্মল সেনকে সর্বদাই দেখা যায়।

দেশের রাজনীতিক গগন সেদিন হতাশার কালো মেঘে আচ্ছন্ন। অসহযোগ আন্দোলন ব্যর্থ হয়েছে। স্কুল, কলেজ, কাছারি, আইন-সভায় আবার সকলে ফিরে যাচ্ছে। উচ্ছ্বাসপ্রবণ জাতির তরল মনে দেশপ্রেমের জোয়ার শেষে ভাঁটার টান শুরু হয়েছে। বিপ্লবীরা বুঝতে পারেন দেশের লোকের প্রাণে অদম্য স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা জাগানোর জন্য এবং তাদের মানসিক জড়তা দূর করার জন্য চমকপ্রদ কিছু করার একান্ত প্রয়োজন। নইলে দক্ষিণপন্থীদের আরাম কেদারার রাজনীতি ও আবেদন-নিবেদনের পালা গান দেশের অচল অবস্থাকে স্থায়ী করে রাখবে। তাই বিপ্লবীরা ভাবেন—

"শিকল-দেবীর ঐ যে পূজা-বেদী,
চিরকাল কি রইবে শুধু খাড়া ?"

জেলের মধ্যে বসে তারা সবাই চিন্তা করেছেন। নিজেদের কর্ম-পদ্ধতির বিশ্লেষণ করেছেন, প্রতিটি ভুল-ভ্রান্তির কথা ভেবেছেন। স্বাধীনতা আন্দোলনের ক্রমবিকাশ তাঁরা পরিষ্কার উপলব্ধি করেছেন।

সন্ত্রাসবাদের উপর তাঁদের আর আস্থা নেই। একটা-দুটো সাহেব মারলে দেশ স্বাধীন হবে না। একজন বিদেশীর জায়গায় অন্যজন এসে বসবে এবং আরও নির্ম্মমভাবে শাসন শুরু করবে। মাঝ হতে বহু নিরীহ নিরপরাধ লোকের নির্যাতন ও লাঞ্ছনার অন্ত থাকবে না।

স্বাধীনতার নিমিত্ত একটা ব্যাপক সংগ্রাম—এক গণ-অভ্যুত্থানের প্রয়োজন তাঁরা অনুভব করেন। কিন্তু অভ্যুত্থানের উপযোগী অস্ত্রের সমস্যা তাঁদের চিন্তিত করে। গোপনে বিদেশ হতে অস্ত্র আমদানি অসম্ভব। এর আগে বিপ্লবী বীর বাঘা জ্যোতিনের সে প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। তাছাড়া প্রচুর বিদেশী অস্ত্র কেনার মত অর্থও বিপ্লবীদের নেই।

পূর্ববর্ত্তী বিপ্লবীরা অর্থের জন্য ডাকাতি করতেন। কিন্তু একটু চিন্তা করলে বোঝা যায় তাতে লাভের চেয়ে ক্ষতিই হয়েছে বেশী।

নতুন যুগের বিপ্লবীরা নতুন পথ খোঁজেন।

নিশীথ রাত্রে গোপনে তাঁরা মিলিত হন মাস্টারদার গৃহে। সূর্যের চারিধারে জ্যোতিষ্কের মত সূর্য সেনকে ঘিরে বসেন নির্মল সেন, অম্বিকা চক্রবর্ত্তী, গণেশ ঘোষ ও অনন্ত সিং।

আলোচনা চলে।

মাস্টারদা বলেন,—তাহলে দেখা যাচ্ছে বিপ্লবের জন্য প্রয়োজন নিখুঁত পরিকল্পনা, অস্ত্র, অর্থ আর iron-nerved youngmen। আমাদের ভাবতে হবে কিভাবে এগুলি আমরা পেতে পারি।

গণেশ ঘোষ বলেন,—পরাধীন দেশে স্বাধীনতার জন্য মরবার

লোকের অভাব হবে না মাস্টারদা। Recruitmentএর ভার আমাদের প্রত্যেককেই নিতে হবে।

দলে ছেলে সংগ্রহের জন্য সত্যই বিশেষ চিন্তিত হবার কোন কারণ নেই। তাছাড়া পুরানো ছেলেরা তো আছেই, তাদের মারফত নতুন ছেলেদের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করা চলবে। তারকেশ্বর, রামকৃষ্ণ, কালি একাজে যথেষ্ট সাহায্য করতে পারবে।

মাস্টারদা পরবর্তী সমস্যার কথা সবার সামনে তুলে ধরেন।··· অর্থ। অর্থের জন্য ডাকাতি আর তাঁরা করবেন না।

রেল ডাকাতির নায়ক অনন্ত সিং মাস্টারদার প্রস্তাব দৃঢ়ভাবে সমর্থন করেন, যুক্তিজাল বিস্তার করেন—ডাকাতিতে অনর্থক অনেক প্রাণহানি হয়। টাকা যা পাওয়া যায়, তা মামলার পিছনেই বেরিয়ে যায়। বিপ্লবীরা লোকের চোখে হীন হয়ে যায়। বাজে কাজে কারাবাস প্রকৃত কাজের সুযোগ দেয় না।

আদর্শবাদী স্বাধীনতার সৈনিক সব—ডাকাতির মত হীন কাজ করতে তাদের মন এমনিতেই চায় না······Means must justify the end.

কিন্তু টাকা কোথা হতে পাওয়া যায়? টাকা ছাড়া যে কোন কাজ করাই সম্ভব নয়।

জটিল সমস্যার দ্রুত সমাধান করতে পারেন নির্মল সেন। যে কোন বিষয়েই তিনি সবার আগে একটা সিদ্ধান্ত করেন, তারপর প্রতীক্ষা করেন সাথীদের সমর্থনের। তিনি বলেন অর্থের চেয়ে মূল্যবান সম্পদ প্রাণ যারা তুচ্ছ করে বিলিয়ে দিচ্ছে, টাকা তারাই দেবে।

অতএব টাকা নিজেদের মধ্য হতেই সংগ্রহ করার সঙ্কল্প গ্রহণ করা হয়।

এর পর আসে অস্ত্রের কথা। বিপ্লবের জন্য চাই প্রচুর অস্ত্র। বোমা বিপ্লবীরা তৈরি করে দিতে পারেন। কিন্তু শুধু বোমা নিয়ে তো আর লড়াই চলে না। লড়াইয়ের জন্য চাই রিভলবার, বন্দুক, গুলি,

বারুদ। কয়েকটি রিভলবার অবশ্য তাদের আছে। রডা কোম্পানীর 'মশার' পিস্তল অপহৃত হওয়ার পর পার্টির মারফৎ বাংলার সব জেলায় গোপনে ছড়িয়ে পড়েছিল। কিন্তু সে মাত্র কয়েকটিই। এ ছাড়া স্থানীয় লোকদের দু একটি বন্দুক চুরি করা সম্ভব হতে পারে। এই সামান্য অস্ত্র সম্বল করে সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে সশস্ত্র সংগ্রাম করতে যাওয়া দুঃসাহসিকতা নয়, বাতুলতা।

অধীর অনন্ত সিং বলেন, কিন্তু অস্ত্রের অভাবে আমাদের কাজ আটকে থাকতে পারে না। যে করে হোক আমাদের অস্ত্র জোগাড় করতেই হবে!

গণেশ ঘোষ বলেন,—অস্ত্র তৈরির গোপন কারখানা করা চলতে পারে। কিন্তু তাতে এতো বেশী বাধা যে প্রায় অসম্ভব।

অনন্ত সিংয়ের মাথায় এক মতলব আসে। তিনি বলেন, অস্ত্র আমরা এই দেশ থেকেই জোগাড় করবো। ইংরাজের মজুত অস্ত্র দখল করে তাদের সঙ্গে আমরা লড়বো।

তাঁর এই কথায় সকলে নতুন পথের সন্ধান পান।

সেদিনের আলোচনায় সমাপ্তি টেনে মাস্টারদা বলেন,—এ বিষয় আমাদের ভাল করে ভাবার দরকার। আপাততঃ প্রথম ও প্রধান কাজ —বেছে বেছে ছেলে recruit করা। স্কুল ও ক্লাবগুলি হবে আমাদের প্রধান recruiting centre।

স্কুলের ছেলেদের মধ্যে দলের সংশ্লিষ্ট তরুণ কর্মীদের দ্বারা ছড়িয়ে দেওয়া হয় নিষিদ্ধ পুস্তক···নানা দেশের বিপ্লবীদের জীবনী··· বিদ্রোহের বাণী।

আনন্দমঠ, পথের দাবী, ক্ষুদিরামের কথা, বাঘা জ্যোতিনের কাহিনী, ডি. ভ্যালেরার জীবনী ছেলেদের দেশাত্মবোধ জাগান এবং বৈপ্লবিক কর্মে আগ্রহ বাড়ানর জন্য প্রচারিত করা হয় বিশেষ ভাবে।

সেই সঙ্গে যুবকদের মধ্যে শরীরচর্চার প্রচলন করা হয়। চারিদিকে ব্যায়ামাগার ও সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠিত করা হয়। স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর সৃষ্টি হয়। গণেশ ঘোষ হন তার সর্বাধিনায়ক। অনন্ত সিং হন শহরের ব্যায়াম শিক্ষক।

নতুন উৎসাহ নিয়ে দলে দলে ছেলেরা যোগ দেয় বিভিন্ন ক্লাবে। জড়তার তুষার গলে জীবনের জোয়ার আসে চট্টগ্রামে।

সারা জেলায় ব্যায়াম-ক্রীড়া প্রদর্শন করে বেড়ান এঁরা। লোকনাথ বল চলন্ত মোটর থামান। অনন্ত সিং লোহার শিকল ছেঁড়েন। যুবক মহলে এঁদের প্রভাব অবারিত হয়ে উঠে।

খেলাধূলার মধ্য দিয়েই ছেলে বাছা এবং দলে নেওয়া শুরু হয়।

সদর ঘাট ক্লাব। ব্যায়াম শেষে ছেলেরা বাড়ির দিকে যায়। একটি ছেলে গণেশ ঘোষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে, তাকে দলে আনা চলতে পারে। নাম তার ত্রিপুরা সেন, দীর্ঘ বলিষ্ঠ দেহ। গণেশ ছেলেটির সঙ্গ নেন।

পথে ছেলেটিকে প্রশ্ন করেন, তোমার বাড়ি বুঝি এই দিকে?

হ্যাঁ। আপনি এদিকে কোথা যাচ্ছেন গণেশদা?

আমি যাচ্ছি একটু কাজে। তা চলো এক সঙ্গে যাওয়া যাক, যখন একই দিকে যাচ্ছি।

খুব ভাল হয় তাহলে। আপনি সঙ্গে থাকলে বেশ সাহস হয়।

না হলে বুঝি ভয় করে রাস্তা হাঁটতে?

বাঃ রে! গুণ্ডাদের ভয় করে না বুঝি।

চট্টগ্রামে সত্যিই সে সময় গুণ্ডাদের দৌরাত্ম্যের অন্ত ছিল না। তাদের অত্যাচারে সকলে সন্ত্রস্ত হয়ে থাকতো। মাঝে মাঝে বিপ্লবীদের সঙ্গে তাদের সংঘর্ষ হতো। অনন্ত সিং তাদের অনেককেই সায়েস্তা করেছিলেন।

তাই ত্রিপুরা প্রশ্ন করে, আচ্ছা, অনন্তদার গায়ে খুব জোর, না? গুণ্ডাদের সব মেরে ঠাণ্ডা করে দিয়েছেন।

হ্যাঁ। যত বদমাইস গুণ্ডাগুলোকে আমরা মেরে ঠাণ্ডা কবে দেবো। আচ্ছা, বদমাইস লোকদের শাস্তি দিতে তোমার ইচ্ছা করে না?

নিশ্চয়ই করে।

এদেশে সবচেয়ে বদমাইস কারা জানো?

সাগ্রহে ত্রিপুরা জিজ্ঞাসা করে, কারা?

ইংরেজ!

কেন?

আচ্ছা, এ কথা আর এক দিন বুঝিয়ে দেবো।

কবে?

আগামী মঙ্গলবার সন্ধ্যা সাতটায় আমার সঙ্গে দেখা করো নদীর ধারে।

নদীর ধারে অন্ধকারে গণেশ ঘোষ অপেক্ষা করেন। একবার দেশলাই জ্বেলে হাতের ঘড়ি দেখেন। ত্রিপুরা আসে নির্দিষ্ট সময়ে।

এই যে এসেছো!

হ্যাঁ। ঠিক সময়ে আসি নি?

তা এসেছো। কিন্তু কেন এলে?

এ কথায় ত্রিপুরা একটু অবাক হয়। বলে, বাঃ রে! আপনি যে আসতে বলেছিলেন।

আমি বল্লেই তুমি আসবে?

হ্যাঁ।

আমি যা বলবো তুমি তা করবে?

নিশ্চয়।

আমি বল্লে মরতে পারবে?

অকুণ্ঠিত চিত্তে ত্রিপুরা বলে, পারবো।

এত সহজেই। গণেশ ঘোষ উচ্চ কণ্ঠে হেসে ওঠেন।

এত সহজেই সব ছেলেকে টানা যায় না। পারিবারিক বন্ধন, মায়ের স্নেহ, জীবনের মায়া ছিন্ন করে রক্তাক্ত মৃত্যুর মুখে স্বেচ্ছায় ছুটে আসতে পারে না।

নির্জনে পথ চলতে চলতে অনন্ত সিং একটি ছেলের সঙ্গে আলাপ করেন। নানা কথাবার্তার পর আত্মীয় স্বজনের মধ্যে কেউ পুলিশে আছে কিনা জানবার চেষ্টা করেন।

বাড়িতে কে কে আছেন?

বাবা আছেন, মা আছেন আর ছোট ভাই-বোন আছে।

তোমার এক মামা পুলিশে চাকরি করেন না?

কই, না তো।

লেখাপড়ায় তুমি তো খুব ভাল। সকলে প্রশংসা করে। দেশ শুদ্ধ লোকের প্রশংসা যাতে পাও তার ইচ্ছে করে না?

করে।

ক্ষুদিরামের নাম শুনেছো?

শুনেছি। স্বদেশী করায় ফাঁসি হয়েছে।

তার মত হতে ইচ্ছে করে না?

করে। কিন্তু···

কিন্তু কি বলো।

কিন্তু···কিন্তু আমার বাবা-মাকে ছেড়ে আমি মরতে যেতে পারবো না। বাবা-মার দুঃখ দূর করতে হবে। আমাকে চাকরি করতে হবে। না-না অনন্তদা, আমি ক্ষুদিরামের মত হবো না।

ছেলেটির এ কথায় নেপথ্যে ভাগ্যবিধাতা হয়তো একটু মুচকে হেসেছিলেন। ভবিষ্যতে বোধহয় তাঁরই খেয়ালে ছেলেটির ঈপ্সিত জীবনের গতি বদলে গিয়েছিল। দেশের লোকের জন্য তাকে মরতে হয়—পুলিশের অত্যাচারে।

চট্টলের গোয়েন্দা বিভাগের কর্তা অনুচরদের নির্দেশ দেন, কড়া নজর রাখা চাই পুরানো রাজবন্দীদের উপর। সূর্য সেন, অম্বিকা চক্রবর্তী, নির্মল সেন, অনন্ত সিং, গণেশ ঘোষ, লোকনাথ বল—দিন রাত এদের পিছনে থাকবে। এদের প্রত্যেকটা গতিবিধি লক্ষ্য করবে। যে সব ছেলেদের সঙ্গে এরা বেশী মিশছে, তাদেব ওপরও চোখ রাখা চাই।

জনৈক গোয়েন্দা অফিসার গোয়েন্দা বিভাগের কর্তাকে বলে, গুণ্ডার দল কেবল তৈরি হচ্ছে স্যার। দিন রাত খালি exercise,—পলিটিক্সের নাম গন্ধ নেই।

ছেলেদের অভিভাবকেরাও ভাবেন, ছেলেগুলি বুঝি গোল্লায় গেল। দিনরাত হৈ হৈ—দেশোদ্ধার করে সকলের মাথা কিনবে। কেরানীর জাত বাঙালী—চাকরি যাদের মোক্ষ, নির্ঝঞ্ঝাট জীবন যাদের কাম্য তাদের গোকুলে এরা কারা ধীরে ধীরে বাড়ছে!

প্রায় সকলেই আবার এদিকে ছেলেদের সরাসরি ঐ পুলিশের মার্কা-মারা কজনের সঙ্গে মিশতে বারণ করতে পারেন না। কারণ সূর্য সেন, অনন্ত সিং প্রভৃতির মধ্যে এমন অনেক গুণ আছে যা সকলকার মনে শ্রদ্ধা জাগায়, আপনা হতে আকর্ষণ করে ছেলেবুড়ো সবাইকে। ওদের ব্যক্তিত্ব, আচার ব্যবহার, চরিত্রবল, পরোপকার প্রবৃত্তি শত্রুমিত্র নির্বিশেষে সকলের কাছেই ওদের প্রিয় করে রাখে। আগুনের আকর্ষণে মরণোন্মুখ পতঙ্গ যেমন ছুটে আসে, এঁদের জ্বালা মুক্তিযজ্ঞের আগুনে ঝাঁপ দিতে ছেলেরাও তেমনি এগিয়ে আসে।

পুলিশের চোখ এড়িয়ে আবার একদিন বিপ্লবীরা মিলিত হন। দলে ছেলে আনা সম্বন্ধেই আলোচনা চলে। অম্বিকা চক্রবর্তী মন্তব্য করেন, ছেলে ভালই আসছে দলে।

মাস্টারদা মৃদু হেসে বলেন, এবং ভাল ভাল ছেলেই আসছে।

নির্মল সেন বলেন, তবে একটু অল্প বয়সের ছেলে নেওয়া হচ্ছে—

অনন্ত সিং বলেন, তা হোক নির্মলদা। অল্প বয়সের ছেলেরা বেপরোয়া হবে, তাদের মধ্যে বিচারশক্তি বেশি জাগেনি বলে।

নির্মল সেন আর একটি প্রশ্ন তোলেন, বড়লোকের ছেলেদেরও নেওয়া হচ্ছে—আরাম ও সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের মধ্যে যারা লালিত-পালিত, তারা কি বিপ্লবী জীবনের দুঃখ কষ্ট বরণ করতে পারবে? শেষে সংগঠন না দুর্বল হয়ে যায়।

মাস্টারদা জবাব দেন, সেটা নির্ভর করে আমাদের সংগঠন শক্তির উপর ও শিক্ষার উপর।

অনন্ত সিং বলেন, বড়লোকের ছেলেদের আনার একটা উদ্দেশ্যও আছে। টাকার জন্যে আর তো আমরা ডাকাতি করবো না। দরকার হলে—

হঠাৎ দরজায় করাঘাত হয়। সূর্য সেন খবরের কাগজের একটা পাতা তুলে নিয়ে এদের পড়ে শোনান শুরু করেন। গণেশ ঘোষ উঠে দরজা খুলে দেন। একটি ছেলে হাঁপাতে হাঁপাতে ঢোকে। নাম তার মনোরঞ্জন সেন।

ছেলেটি বলে, অনন্তদা, অনন্তদা—আমায় একটা রিভলবার দিন। আমার বাবাকে আমি গুলি করে মারবো আর গুলি করবো ওই বদমাইস গোয়েন্দাটাকে।

অনন্ত জিজ্ঞাসা করেন, কেন? কি হয়েছে?

ছেলেটি উত্তেজনায় ও আবেগে ফুলে ফুলে ওঠে। বলে, কি হয়েছে? জানেন—গোয়েন্দাটা আমায় এসে বলেছে, তোমায় টাকা দেবো যদি তুমি রোজ আমায় জানাও অনন্ত সিং, গণেশ ঘোষ এরা কি করে—কোথায় যায়।

শান্ত কণ্ঠে গণেশ ঘোষ বলেন, এতে উত্তেজিত হবার কি আছে? গোয়েন্দা অমন করবেই।

অভিমানাহত কণ্ঠে সে বলে, কিন্তু আমার বাবা কি বলেছেন জানেন? আপনাদের সম্বন্ধে দুটো কথা বলে যদি আমাদের দু'পয়সা

আসে তো মন্দ কি ? বোকামি করে টানাটানির সংসারে এ সুযোগ হাতছাড়া করা উচিত নয়।

এঁরা মৃদু হাসেন। ছেলেটির হৃদয়ের রুদ্ধরোষ অশ্রুর আকারে দু-নয়ন পথে বের হয়। কান্না জড়ানো কণ্ঠে বলে, বোকামি আমি করবোই, সেই সঙ্গে শেষ করে দেবো ওদের চালাকি—

অম্বিকা চক্রবর্ত্তী তাকে সান্ত্বনা দেন। বলেন ছিঃ ভাই ! অতো উত্তেজিত হতে নেই ! সব সময় মাথা ঠাণ্ডা রেখে কাজ করা উচিত। তোমার বাবা অভাবের জন্যই অমন কথা বলেছেন, তাঁর ক্ষেত্রে নিজেকে রেখে বিচার করলে বুঝবে অন্যায় বিশেষ বলেন নি। সে তুলনায় তুমি যতটা উত্তেজিত হয়েছো, তাতে পুলিশের সন্দেহ আমাদের উপর ভীষণ বেড়ে যাবে, যেন আমরা সাংঘাতিক কিছু করছি।

ছেলেটি একটু সংযত হয়ে বলে, কিন্তু গোয়েন্দাটাকে শিক্ষা দেওয়া দরকার।

অনন্ত সিং বলেন, সে ভার আমরা নিলাম। কাল আমাকে আর গণেশকে একবার গোয়েন্দাটাকে দেখিয়ে দিও। তারপর দেখবে তোমার ত্রিসীমানায় আর কোন দিন সে আসবে না। যাও, বাড়ি যাও—

ছেলেটি চলে গেলে অনন্ত সিং সহকর্মীদের উদ্দেশ্যে বলেন, বড়লোকের ছেলে নেওয়ার আর একটা কারণ, পুলিশ টাকার লোভ দেখিয়ে তাদের বশ করতে পারবে না।

নির্মল বলেন, ছেলেদের উপর পুলিশের নজর পড়েছে। তারা ঘুষ দিয়ে সুবিধা হবে না দেখে নিজেদের লোক ভেতরে ঢোকাতে পারে।

গণেশ ঘোষ এতক্ষণ একমনে কি ভাবছিলেন। মৌনতা ভঙ্গ করে তিনি ধীরে ধীরে বলেন, আচ্ছা, আমাদেরও একটা গোয়েন্দা বিভাগ করলে কেমন হয় ?

মাস্টারদা বলেন, খুব ভাল হয়। এটা একটা সম্পূর্ণ নতুন কাজ হবে। এতদিন পুলিশ আমাদের উপর নজর রাখতো,—এবার থেকে

পুলিশের প্রত্যেকটা মুভমেণ্ট, প্রতি বড় অফিসারের উপর আমরা নজর রাখবো। আর একটা কথা—এবার নতুন ছেলে নেওয়া বন্ধ করা উচিত।

একথায় অনন্ত সিং বলেন, আমিও তাই ভাবছি, মাস্টারদা। এখন বরং যাদের নেওয়া হয়েছে তাদের সব রকম ট্রেনিং দিয়ে তৈরি করে নেওয়া যাক্।

ছেলেদের সাঁতার কাটা, ঘোড়ায় চাপা, নৌকা বাওয়া শেখান হয়।

অনন্ত সিংয়ের মোটর নিয়ে ছেলেরা ড্রাইভিং শেখে।

নরেশ রায় ছেলেদের যুযুৎসু শেখায়। বিপ্লবীদের গোয়েন্দা বিভাগের ভার তার উপর থাকে।

গণেশ ঘোষের নেতৃত্বে ছেলেরা কুচকাওয়াজ করে।

স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গড়ে উঠে। টাউনহলের মাঠে ও হরিমেলা ময়দানে তারা প্রায়ই প্যারেড করে। একশো জনের এক বাইসাইকেল বাহিনীও গঠিত হয়।

১৯২৯ সালের মে মাসে এদের প্রচেষ্টায় জেলা কংগ্রেস সম্মেলন, যুব সম্মেলন, নারী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। বহু নেতা অনুষ্ঠানে উপস্থিত হন। দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন, সুভাষ বসু স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী পরিদর্শন করেন।

এই সব অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে ছেলেদের ভেতর সংগঠন-শক্তি ও কর্মপ্রেরণা জাগান হয়। অবশ্য দলে নেওয়া অনেক নতুন ছেলে একটি কারণে মনঃক্ষুণ্ণ হয়। মাস্টারদার নির্দেশ ছিল পুলিশের মার্কা মারা পুরাণো ছেলেরা ছাড়া স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীতে যেন কারুকে নেওয়া না হয়।

এইজন্য অনেকেই এতে স্থান পায় না শত আগ্রহ থাকা সত্ত্বেও।

সামরিক পরিচ্ছদে শোভিত হয়ে সদর্পে বীরগর্বে ঘোরার সুযোগ হতে বঞ্চিত হওয়ার বেদনা বালক-মনে সত্যি ব্যথা জাগায়। কিন্তু ভবিষ্যতের বৈপ্লবিক প্রয়োজনের উদ্দেশ্যে পুলিশের সন্দেহ হতে দূরে রাখার জন্য তারা বাতিল হয়। দূরদর্শী নেতা ছিলেন বিপ্লবী সূর্য সেন।

এই সম্মেলনের সময় কল্পনা দত্তের কর্মকুশলতা বিপ্লবী নেতাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। কিন্তু তখন গুপ্তদলে মেয়ে নেওয়ার নিয়ম ছিল না।

সেদিন রজতের বাড়িতে ছেলেদের বন্দুক ছোঁড়া শেখান হচ্ছে। শহরের এক নির্জন প্রান্তে বলেই এ বাড়িটা নির্বাচিত করা হয়। তা ছাড়া অন্য সুযোগ-সুবিধা ছিল।

হঠাৎ দেখা যায় দূর হতে প্রাণপণে সাইকেল চালিয়ে একটি ছেলে আসছে। এরা বোঝে নিশ্চয় কোন জরুরী বা ভয়ের খবর আনছে।

ছেলেটি এসে হাঁপাতে হাঁপাতে বলে, মাস্টারদা খবর পাঠিয়েছেন, পুলিশ হানা দিতে পারে।

গণেশ ঘোষ বলেন, ট্রেনিং বন্ধ করা যাক।

অনন্ত সিং বলেন, তা হয় না। এ বাড়ির সকলকে নিমন্ত্রণ করে আমাদের বাড়ি সরিয়ে রেখেছি আজকের জন্য। আবার অন্য দিন সরাতে গেলে সন্দেহ জাগবে।

গণেশ ঘোষ বলেন, তাহলে পুলিশ আসার আগে সরে পড়ার ব্যবস্থা করতে হবে।

নরেশ রায় বলেন, তার জন্যে ভাবনা নেই। আমাদের গোয়েন্দারা পুলিশের চেয়ে কাজের। পুলিশের গতিবিধির উপর তাদের ভাল করে নজর রাখতে বলছি। পুলিশ আসার আগেই খবর পাওয়া যাবে।

নরেশ রায় সাইকেলে চেপে অদৃশ্য হয়। অদ্ভুত উত্তেজনার মধ্য দিয়ে সেদিনের শিক্ষা শেষ হয়।

তারকেশ্বর দস্তিদার এসে অনন্ত ও গণেশকে বলে, আর একটি ভাল ছেলে আছে। আপনারা দেখা করবেন তার সঙ্গে ?

অনন্ত সিং তাকে জানান, মাস্টারদার মতে এখন আর কোন ছেলের সঙ্গে দেখা করে লাভ নেই।

গণেশ ঘোষ জিজ্ঞাসা করেন, কি করে ছেলেটি ?

ঠিকাদারি !

কি নাম ?

স্বদেশ রায়।

নামটি বেশ। কিন্তু ছাত্র নয়, ঠিকাদার। অল্প বয়সে রোজকার শুরু করেছে। টাকার মায়া ছেড়ে সে কি আমাদের পথে আসবে ?

অনন্ত সিং তারকেশ্বরকে জিজ্ঞাসা করেন, যাতে সে কোনদিন আমাদের বিপদ না ডেকে আনে তার জন্য তুমি দায়ী থাকবে তো ?

সদ্য পরিচিত একজন সম্বন্ধে হঠাৎ এত বড় দায়িত্ব নিতে তারকেশ্বর একটু দ্বিধা করে।

অনন্ত সিং বলেন, একজনকে অবিশ্বাস করে দূরে সরিয়ে রাখতে পারি, কিন্তু অহেতুক বিশ্বাস করে সংগঠনকে নষ্ট হতে দিতে পারি না।

কিন্তু স্বাধীনতার সংগ্রাম থেকে স্বদেশকে সরিয়ে রাখা যায় নি।

একটি একটি সূর্য-কণা তুলে নিয়ে বুকে
দুরাশার তুরঙ্গে সওয়ার
দুর্গম যুগান্ত-মরু পার হবে বলে
তারা সব হয়েছে বাহির।

—প্রেমেন্দ্র মিত্র

শিক্ষা শেষে ছেলেদের পরীক্ষার পালা শুরু হয়।

পাঁচ ছয়টি ছেলেকে নিজের ঘরে ডেকে এনে গণেশ ঘোষ গোপনে কিছু বলেন।

অনন্ত সিংও উপস্থিত থাকেন। তিনি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ছেলেদের হাবভাব লক্ষ্য করেন।

গণেশ ঘোষ জিজ্ঞাসা করেন, তাহলে তোমরা সকলেই রাজি?

দুজন বলে, হ্যাঁ, হ্যাঁ।

একজন সাগ্রহে বলে, নিশ্চয়ই।

একজন ঘাড় নাড়ে। অপর একজন নীরব থাকে।

গণেশ তাদের প্রশ্ন করেন, তোমরাও রাজি তো?

ঘাড়-নাড়া জন বলে, আমিও রাজি।

গণেশ ঘোষ বলেন, কিন্তু ভেবে দেখো—ম্যাজিস্ট্রেট্‌কে মারতে যাবে, বিপদের সম্ভাবনা খুব।

ডানপিটে বালক টেগরা তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বলে, তাতে কি!

আচ্ছা, এ ব্যাপারটা নিয়ে তোমরা বেশ করে ভেবে দেখো। কাল আমায় তোমাদের মতামত জানিও। আমিও ভেবে দেখি।

ছেলেরা চলে যায়। গণেশ অনন্তকে প্রশ্ন করেন, কেমন দেখলে, অনন্তলাল?

তোমার এই কল্পিত গল্প শুনতে যাদের ভেতর উৎসাহের অভাব দেখলাম তাদের বাদ দাও। Callous লোককে দিয়ে কোন কাজ হয় না। বিপদের নাম শুনে যারা দ্বিধা করলো তাদের সম্বন্ধেও বেশ করে ভেবে দেখো।

দুটি ছেলেকে লোকনাথ বল বলেন, এই নাও ছোরা! রাত দশটার সময় জাহাজ-ঘাটার পথের উপর যে লোককে পাবে তাকে ভয় দেখিয়ে টাকা কড়ি কেড়ে নিয়ে আসতে হবে। খবরদার ধরা পড়ো না। বিপদ বুঝলে খুন করতে দ্বিধা করো না।

একটি ছেলে বলে, আমি পারবো না। ভদ্রলোকের ছেলে হয়ে চুরি-ডাকাতি করতে পারবো না।

অনন্ত সিং তাকে জিজ্ঞাসা করেন, দেশের জন্য তুমি সব কিছু করতে প্রস্তুত নও?

কিন্তু ধরা পড়লে কী ভীষণ অপমানিত হবো ভেবে দেখেছেন?

ধরা দিতে তো বারণ করে দেওয়া হলো। আচ্ছা, তোমায় যেতে হবে না।

তুমি পারবে? অন্য ছেলেটিকে জিজ্ঞাসা করা হয়।

পারবো।

বেশ, তুমি যাও। আর তুমি বাড়ি যাও।

নির্জন পথে ছোরা হাতে ছেলেটি চলে। দূরে দেখে এক পথিককে। এক গাছের আড়ালে সে আত্মগোপন করে। পথিক কাছাকাছি এলে অতর্কিতে পিছন হতে তার কণ্ঠের উপর ছোরা স্থাপিত করে বলে, চেঁচিয়েছ কি মরেছ! কাছে যা আছে দাও।

লোকটি অবিচলিত কণ্ঠে বলে, কাছে তো কিছু নেই। তবে

কাছাকাছি ওই গাড়িতে লোকনাথ আছে, তার কাছে যদি কিছু থাকে। you deserve some reward.

বিস্ময়ে ছেলেটি বলে, অনন্তদা ? তুমি।

হ্যাঁ রে! তোকে পরীক্ষা করছিলাম, পাশ করেছিস। সত্যি করে ছোরা দেখিয়ে নিরীহ পথচারীর পকেট মারতে আমরা চাই না। আমরা গুণ্ডা নই।

কংগ্রেস অফিসে অম্বিকা চক্রবর্তী, একটি ছেলেকে বলেন, যা তো, শিগগির অনন্তকে বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে আয়। জরুরী দরকার। রাস্তা দিয়ে না গিয়ে মাঠ দিয়ে চলে যা, তাড়াতাড়ি হবে।

ছেলেটি ছুটে বেরিয়ে যায়।

অন্ধকার মাঠের উপর দিয়ে ছেলেটি চলে। হঠাৎ তার সামনে আসে লুঙ্গি পরা, ওয়েস্ট কোট গায়ে, চাপ দাড়িওয়ালা এক মুসলমান। ছেলেটি ভয়ে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে। মুসলমানটি হাত বাড়িয়ে তার জামার কলার ধরতে যায়। এবং জিজ্ঞাসা করে, কিধার যাতা ?

ওরে, বাবারে, মেরে ফেল্লেরে বলে ভয়ে প্রাণপণে সে দৌড় মারে।

ছেলেটি অনন্ত সিংএর বাড়ি গিয়ে চীৎকার করে, গু—গু—গুণ্ডা···

দরোয়ান জিজ্ঞাসা করে, কিধার ?

জড়িত স্বরে সে বলার চেষ্টা করে, কি ধার—কি ধার যাতা—বোলতা—গুণ্ডা !

বাড়ির লোকজন লাঠিসোটা ও আলো নিয়ে বেরিয়ে পড়ে গুণ্ডার সন্ধানে।

অম্বিকার কাছে ফিরে এসে ছেলেটি দেখে অনন্তও সেখানে আছেন।

এই যে অনন্তদা, তুমি এখানে। আর তোমায় ডাকতে গিয়ে মাঝে কী ভীষণ বিপদে আমি পড়েছিলাম।

অম্বিকা হাসি চেপে প্রশ্ন করেন, কি হয়েছিলো?

তিন-তিনটে গুণ্ডা আমায় আক্রমণ করেছিলো। কী তাদের চেহারা—কা ভীষণ জোয়ান! অনন্তদা, তোমার থেকেও বেশী বোধহয় গায়ের জোর। কী মাসল্‌স্‌!

অম্বিকা বলেন, ঐ অন্ধকারেও মাসল্‌স্‌ দেখতে পেলি?

অনন্ত জিজ্ঞাসা করেন, তুমি কি করলে?

প্রথমটাকে মারলুম এক ঘুষি—straight left, তারপর দ্বিতীয়টাকে একটা right cut, তৃতীয়টা যেই এগিয়ে আসছে তার পেটে এক লাথি মেরে দৌড়লাম। কারণ তিনজনের সঙ্গে একা বেশীক্ষণ লড়াই করা তো সম্ভব নয়।

অনন্ত বলেন, তাই না কি? তা আমি তো ছদ্মবেশে ঐ সময় মাঠের উপর দিয়ে আসছিলাম। আমায় বল্লি না কেন, দুজনে অদৃশ্য গুণ্ডাদের ঠাণ্ডা করতাম—আমিই তো তোকে জিজ্ঞাসা করলাম—কিধার যাতা।

বিস্ময়ে লজ্জায় হতবুদ্ধি হয়ে সে বলে—এ্যাঁ! অনন্তদা! তুমি! অম্বিকা হো হো করে হেসে উঠেন।

ছেলেদের শিক্ষা ও পরীক্ষা শেষ হওয়ার পর এঁরা পাঁচজন প্রায়ই মিলিত হয়ে ভাবেন কাজের কথা। বিপ্লবভীত নেতাদের মতো বৃথা কালহরণে তাঁরা ইচ্ছুক নন। এখনও সময় হয়নি, দেশ তৈরি নেই ইত্যাদি বুলি দ্বারা আত্মপ্রতারণা তাঁরা করতে চান না। তাছাড়া চট্টলের বিপ্লবীদল যে শক্তি সঞ্চয় করেছে তা নিষ্ক্রিয়ভাবে বেশীদিন রাখা সম্ভব নয়। তার বেগ ও আবেগ রুদ্ধ করে রাখা যায় না। তাই অনন্ত সিং বলেন. কাজ না দিলে ছেলেদের বেশিদিন

আটকে রাখা যাবে না। ছেলেরা কাজের আশায় অপেক্ষা করে করে শেষে কাজ না পেয়ে হতাশ হয়ে পড়ে সংস্রব ত্যাগ করবে।

ছেলেদের দলত্যাগ সম্বন্ধে দরদী নেতা মাস্টারদা আর একটা কারণ দেখান। বলেন, ছেলেদের পেছিয়ে যাওয়ার কারণ শুধু কাজের অভাব নয়, ভালবাসার ও সহানুভূতির অভাবটাই বেশী। ছেলেদের ভালবাসা ও মমতা দিয়ে আপন করে রাখতে হবে। তাদের ভেতর হতে বিশ্বাসঘাতক হওয়ার পথ বন্ধ করে রাখতে হবে স্নেহ বন্ধনে।

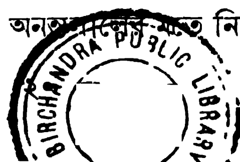
গণেশ ঘোষ বলেন, আগের যুগে অনেক বিপ্লবী একটা রিভলভার বা বোমা দেখিয়ে লোককে তাক লাগাতো, সাময়িক ভাবে দলে টেনে আনতো। কিন্তু অল্পদিনেই তাদের মোহ ভেঙ্গে যেতো। লোককে মোহগ্রস্ত করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। আমাদের উদ্দেশ্য এমন একটা কিছু করা যা সমস্ত দেশকে প্রেরণা দেবে।

অম্বিকা চক্রবর্ত্তী বলেন, ব্যাপকভাবে কিছু করতে হলে অন্য দলের বিপ্লবীদের সঙ্গে একবার পরামর্শ করলে ভাল হয়। তাদের সহযোগিতা কতখানি পাওয়া যাবে জানা দরকার।

অম্বিকা চক্রবর্ত্তী বিপ্লবী বাঘা জ্যোতিনের সময়ও গুপ্তদলের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। তখন ভারতের সব বিপ্লবীদলের মধ্যে এক ঐক্য প্রচেষ্টা হয় সম্মিলিত সশস্ত্র অভ্যুত্থানের জন্য। ঐক্যে বিশ্বাসী অম্বিকা চক্রবর্ত্তী কাজের আগে সব দলের সঙ্গে একবার সংযোগ করতে চান। তাছাড়া তিনি ছিলেন সকল দলের পরিচিত বিপ্লবী নেতা। তাঁর ডাকে হয়তো সকলে সাড়া দিতে পারে।

কিন্তু অনন্ত সিং বলেন, সারা ভারত জুড়ে কিছু করতে হলে সব সমস্যার কথা আমাদের ভাল করে ভাবতে হবে। কোথাও কোন লোকের দুর্বলতা বা অবহেলার জন্য সব কাজ পণ্ড হতে পারে। রাসবিহারী বোসের ব্যর্থতা হতে গুপ্ত আন্দোলন সম্বন্ধে এ শিক্ষা আমরা পেয়েছি।

সূর্য সেন বলেন, তাহলে অনন্তলালের মতে নিজেদের সাধ্য যত



দূর তত দূরই আমাদের করা উচিত এবং গোপনীয়তা একান্তভাবে রাখা দরকার।

গণেশ ঘোষ বলেন, কিন্তু আমি জানি অন্য দলের ওরাও একটা কিছু করার জন্য ব্যগ্র। দেখাই যাক্ না ওদের সঙ্গে একবার কথা কয়ে।

মাস্টারদা স্বল্পভাষী নির্মল সেনকে জিজ্ঞাসা করেন, এ সম্বন্ধে আপনার মত কি, নির্মল বাবু?

নির্মল অল্প কথায় তাঁর মত ব্যক্ত করেন, আমি বলি conspiracy আর নয়, এবার চাই action।

মাস্টারদা খুশী হয়ে বলেন, চমৎকার কথা। দেশে অনেক বড় ষড়যন্ত্র হয়েছে কিন্তু তা সফল হয়নি। সেজন্য শুধু ষড়যন্ত্র করার অপরাধে আমরা ধরা পড়তে চাই না। কাজ করে মরতে চাই। তবু গণেশ একবার কলকাতায় গিয়ে সাবধানে ওদের সঙ্গে কথা বলে এসো। আর আমাদের কর্তব্য সম্বন্ধে আরও ভাল করে ভেবে আবার আমরা এক রাত্রে আলোচনা করবো।

গণেশ ঘোষ কলকাতায় এসে কলাবাগান বস্তির গুপ্ত কেন্দ্রে নিরঞ্জন সেনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। সে সময় সারা বাংলায় তরুণ বিপ্লবীদের মধ্যে একটা কর্মচাঞ্চল্যের ভাব এসেছিল। তাঁরা নেতাদের নিষ্ক্রিয়তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে সর্বদল সম্মিলিত ভাবে কাজ করার পক্ষপাতী হয়েছিলেন। কলকাতায় তাঁরা পরস্পরে সঙ্গে আলাপ আলোচনা করে অত্যাচারী ইউরোপীয় নিধনের জন্য যুক্ত কর্মপন্থা গ্রহণের উদ্যোগ করছিলেন। এই তরুণ বিদ্রোহী দলের নিরঞ্জন সেন একজন নায়ক স্থানীয়।

গণেশ ঘোষ ফিরে এসে সারা বাংলা জুড়ে আসন্ন আন্দোলনের কথা এঁদের বলেন। এঁরা আশান্বিত ও আনন্দিত হয়ে উঠেন। স্বপ্ন সফল হওয়ার দিন তাহলে এগিয়ে আসছে। সারা দেশ প্রস্তুত

হচ্ছে। চট্টলের বিপ্লবীরা প্রথম আগুন জ্বালার সংকল্প গ্রহণ করেন—তারপর 'সে আগুন ছড়িয়ে গেল সব খানে'…

এমন সময় সারা ভারতের উপর নেমে আসে বিষাদের ছায়া—বন্দী বীর যতীন দাস তেষট্টি দিন অনশনের পর লাহোর কারাগারে মৃত্যুবরণ করেছেন। বাংলার বিপ্লবীরা তাদের এক প্রিয় সহযোদ্ধাকে হারিয়ে শোকে মুহ্যমান হয়ে পড়ে।

সেদিন—১৯২৯ সালের ১৪ই সেপ্টেম্বর বিকালে চট্টগ্রামের টাউন হলে এক সভা হচ্ছে যতীন দাসের মুক্তি দাবি করে, এমন সময় মাস্টারদার কাছে আসে রক্তমাখা টেলিগ্রাম—ইংরেজের কারাগার হতে অনশন-বন্দী যতীনদাসকে মুক্তি দিয়েছে মৃত্যু!

রাত্রের অন্ধকারে মিলিত হন মাস্টারদা, অম্বিকা, নির্মল, অনন্ত, আর গণেশ। গণেশ সেদিন বজ্রবিদ্যুতের জ্বালাভরা বর্ষার ঘন কৃষ্ণ মেঘের মতন। যতীন দাস ছিলেন তাঁর বন্ধু, মেদিনীপুর জেলে তাঁরা দুজনে এক সঙ্গে ছিলেন। আজ Patroclus is slain and Achilles hates to live। যতীন দাসের মৃত্যুর প্রতিশোধ তিনি নিতে চান। অনন্ত সিং সাধারণতঃ কোন একটা কাজ করার আগে সব দিক ভাল করে ভেবে নেন।

মেঘমন্দ্র স্বরে গণেশ ঘোষ তাঁকে বলেন, অতো ভাবছো কি? বল এর শোধ নিতে চাও কি না? হ্যাঁ কি না?

বন্ধুর গম্ভীর থমথমে মুখের দিকে অনন্ত চান। তাঁর হয়তো মনে পড়ে মৃত বিপ্লবী বন্ধুদের কথা—গোপীনাথ সাহা, প্রমোদ চৌধুরী—ইংরেজ যাঁদের ফাঁসি দিয়েছে।

ধীরে ধীরে তিনি বলেন, শোধ নিতে নিশ্চয় চাই। তবে—

বন্ধুকে তিনি শান্ত সংযত কণ্ঠে বোঝান যে যতীন দাসের মৃত্যুর প্রতিশোধ আমরা নেবো বিরাট ভাবে। যে-আদর্শের জন্য যতীন দাস প্রাণ দিল, সেই আদর্শকে আমরা জয়যুক্ত করে যতীন দাসকে

অমর করবো। আমাদের পরিকল্পনার কথা ভুললে চলবে না। উত্তেজনার মুখে তাড়াতাড়ি একটা কিছু করে সব পণ্ড করা চলে না। যতীন দাসের মৃত্যুর প্রতিশোধ শুধু আমরা কজনে নেওয়ার চেষ্টা করবো না, তার দেশবাসী লক্ষ লক্ষ লোকের সঙ্গে নেবো।

পরদিন এদের নেতৃত্বে চট্টগ্রামে এক বিরাট মিছিল বের হয়। মিছিলের পুরোভাগে রক্তাক্ষরে লেখা থাকে—

তারা দু পায়ে দলে গেল মরণ শঙ্কারে,
সবারে ডেকে গেল শিকল ঝঙ্কারে।

বিকালে জনসভায় আগ্নেয়গিরির মত গণেশ ঘোষের মুখ হতে জ্বালাময়ী বাণী বের হয়। শ্রোতাদের সকলেই সংকল্প করে যতীন দাসের মৃত্যুর প্রতিশোধ নেবার।

সেপ্টেম্বর মাসের শেষেরদিকে কংগ্রেস নির্বাচন উপলক্ষে চারিদিকে দলাদলি শুরু হয়।

সুভাষ-সেনগুপ্ত দ্বন্দ্বে রাজনৈতিক কর্মীদের মধ্যে বিভেদ শুরু হয়। সূর্য সেন ও তাঁর সহকর্মীরা সুভাষবাবুর পক্ষ সমর্থন করেন। এদিকে যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত চট্টগ্রামেরই লোক, তাঁর প্রভাবও সামান্য নয়। প্রতিদ্বন্দ্বিতা পরিণত হয় সংঘর্ষে।

এক নির্বাচনী বক্তৃতা সভায় গুণ্ডারা এঁদের আক্রমণ করে। কিন্তু অনন্ত সিং, গণেশ ঘোষ, নরেশ রায়, বিধু ভট্টাচার্য, মনোরঞ্জন সেন, ত্রিপুরা সেন প্রভৃতি রুখে দাঁড়িয়ে তাদের হটিয়ে দেন। গুণ্ডারা মার খেয়ে পালায়।

সূর্য সেন যখন বক্তৃতা দিতে উঠেন, তখন গুণ্ডাদের নিক্ষিপ্ত ঢিলে তিনি আহত হন। তাঁর প্রশস্ত ললাট বেয়ে রক্তের ধারা গড়িয়ে পড়ে, তিনি সেদিকে বিন্দুমাত্র ভ্রূক্ষেপ না করে বক্তৃতা দিয়ে চলেন। তাদের

নেতা আহত হওয়ায় ছেলেরা ক্ষিপ্ত হয়ে উঠে। কিন্তু তাদের বাহিনীর সর্বাধিনায়ক গণেশ ঘোষের বিনা অনুমতিতে সভাস্থল ছেড়ে তারা যেতে পারে না। অনন্ত সিং সিংহের মত রুদ্ধরোষে ফুলে ফুলে উঠেন গুণ্ডাদমনের জন্য।

সভা শেষে স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর সুখেন্দুবিকাশ দত্ত বাড়ি যাওয়ার পথে ছুরিকাহত হয়। তার কিশোর বন্ধুরা তক্ষুনি গুণ্ডাদের সঙ্গে মারামারি করার জন্য ছুটে যেতে চায়। অনেক কষ্টে তাদের সংযত করে রাখা হয়। সুখেন্দু ও মাস্টারদাকে সেই রাত্রে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়।

সুখেন্দুর অবস্থা গুরুতর হওয়ায় তাকে কলকাতায় নিয়ে যাওয়া হয়। সঙ্গে যান অম্বিকা, নির্মল, অনন্ত ও গণেশ। বেলগাছিয়ার কারমাইকেল কলেজ হাসপাতালে তাকে ভর্তি করা হয়।

সুভাষ বসু, যতীন্দ্রমোহন, কিরণশঙ্কর প্রভৃতি নেতারা তাকে দেখতে আসেন। কিন্তু সুখেন্দুকে শেষ পর্যন্ত বাঁচানো যায় না। বিপ্লবীদের সঙ্গে সুভাষবাবুও তার শবদেহ বহন করেন।.

রৌদ্রের মধ্যে সারাপথ খালি পায়ে তিনি হাঁটেন। অন্যেরা তাঁকে অনুরোধ করে কষ্ট না করার জন্য। কারও কথায় তিনি কর্ণপাত করেন না এবং কষ্টে কাতরও হন না। সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্যের মধ্যে লালিত হওয়া সত্ত্বেও তাঁর কষ্টসহিষ্ণুতা সকলকে বিস্মিত করে। দেশের সামান্য কর্মীদের জন্য তাঁর এই দরদ তাঁকে দেশের প্রিয় নেতা করেছিল।

শ্মশানে অগ্নিসংযোগের পূর্বে যে কিশোর তাঁর জন্য প্রাণ বিসর্জন দিল তার সম্বন্ধে দুটি কথা বলতে গিয়ে তিনি কেঁদে ফেলেন। সারাদিন অনাহারে থাকেন, জলস্পর্শ পর্যন্ত করেন না।

দক্ষিণ কলিকাতা কংগ্রেসের স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী নিমতলা শ্মশানে সুখেন্দুকে গার্ড অফ অনার দেয়।

দলাদলির বিষে ফুলের মত সুন্দর এক প্রাণ অকালে ঝরে যায়।

চট্টগ্রামে এঁরা ফিরে এলে এক গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা হয়। প্রতিশোধ নেবার জন্য ছেলেরা উদ্‌গ্রীব হয়ে আছে। তাছাড়া এরকম অমূল্য প্রাণ এভাবে গুপ্তঘাতকের হাতে বলি যাওয়া অসহ্য। এত বেছে এত খেটে একটি ছেলেকে তৈরি করার পর যদি তার দ্বারা বৈপ্লবিক কাজই না করানো গেল তো সবই বৃথা। গুণ্ডাদের চিরতরে ঠাণ্ডা করার কথা হয়।

কিন্তু অনেক যুক্তি তর্কের পর এ-প্রস্তাব অগ্রাহ্য হয়। প্রধান শত্রুর কথা ভুললে চলবে না। গুণ্ডাদের সঙ্গে গুণ্ডামির প্রতিযোগিতায় নামলে তারই সুবিধা।

অনন্ত সিং কাজ সম্বন্ধে তাঁর পরিকল্পনা সকলের কাছে প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, এই শহরকে আমরা স্বাধীন করবো এবং এই শহরে বৃটিশের মজুত অস্ত্র দিয়েই আমরা বৃটিশের সঙ্গে লড়বো—মারবো এবং মরবো। সেইজন্য পুলিশ ব্যারাক ও অস্ত্রাগার, টেলিফোন-টেলিগ্রাফ অফিস, অক্সিলিয়ারি ফোর্সের হেড কোয়ার্টার্স দখল করা প্রয়োজন। ইউরোপীয়ান ক্লাবের সব সাহেবকে বন্দী করতে হবে, প্রয়োজন হলে হত্যা করতে হবে। বাইরের সঙ্গে শহরের সংযোগ ছিন্ন করতে হবে রেলপথ ধ্বংস করে।

এই পরিকল্পনা সকলেই পছন্দ করেন। প্রত্যেকটি আক্রমণস্থলের প্রয়োজনীয় সংবাদ সংগ্রহের সিদ্ধান্ত করা হয়। এই কাজের জন্য এবার টাকার প্রয়োজন হবে, তাই টাকা সংগ্রহের চেষ্টা শুরু হয়।

রজত অনন্তকে একলা পেয়ে চুপি চুপি বলে, অনন্তদা, আমার গার্জেন বড় ষ্ট্রিক্ট। আমার পক্ষে টাকা আনা সম্ভব নয়।

তাইতো, টাকার যে বড় দরকার।

কিন্তু কি করবো বলুন।

ক্ষণিক চিন্তার ভান করে অনন্ত সিং বলেন, একটা কাজ করলে মন্দ হয় না। এখানকার ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কটা যদি লুঠ করা যায় তো অনেক টাকা পাওয়া যায়। পারবি চেষ্টা করে দেখতে?

উৎসাহ ভরে রজত বলে, পারবো, নিশ্চয়ই পারবো।

তীব্র শ্লেষভরা কণ্ঠে অনন্ত সিং বলেন, তুমি ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক লুঠ করতে পারবে, আর বাড়ি থেকে টাকা আনতে পারবে না? বন্দুক-ধারী সেপাইয়ের চেয়ে তোমার বাবা বেশী স্ট্রিক্ট? ছিঃ, লজ্জার কথা! যত সাহস মুখেই? কথায় কাজ হয় না, কাজ করে দেখাতে হয়।

বলা বাহুল্য এ কথার পর রজত যে করে হোক টাকা নিয়ে আসে। অনেকে আবার টাকার বদলে চুরি করে গয়না নিয়ে আসে। সেগুলি গালিয়ে বিক্রি করে বিপ্লবীদের তহবিল বৃদ্ধি করা হয়।

সন্দ্বীপের লালমোহন জ্যাঠার সিন্দুক ভেঙে টাকা এনে দেয়। হরিপদ মহাজন যা টাকা এনে দেয় বিপ্লবীরা তাতে একটি মোটর কিনবেন স্থির করেন।

সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা জীবন ঘোষালের (মাখন) টাকা আনা।

সে তার বাবার এক চেক নিয়ে ব্যাঙ্কে দাখিল করে।

ক্যাশিয়ার তাকে জানায়, তোমার বাবার সই একটু তফাত হ'চ্ছে। তাঁকে দিয়ে চেকে আর একটা সই করিয়ে টাকাটা নিয়ে যাও।

মাখন একটু বিরক্ত সহকারে বলে, ঠিক মত হয়নি মানে? তাঁকে দিয়ে আর একটা সই এখন কি করে হবে? চেক সই করে আমার ভাঙাতে দিয়েই তো তিনি অফিস চলে গেছেন।

ক্যাশিয়ারের সঙ্গে ওর এই কথা কাটাকাটি একটু দূরে উপবিষ্ট এ্যাকাউন্টেন্টের কানে যায়। তিনি বলেন, ওর বাবা আমার খুব পরিচিত, তাঁকে আমি অফিসেই ফোন করে জানছি।

মাখন ক্যাশিয়ারকে বলে, বেশ তো, উনি ফোন করে জানুন, আপনি ততক্ষণ টাকাটা দিন আমি গুণি। গুণতেও তো সময় লাগবে।

ছোট ছেলে বলছে তার বাবার সই করা চেক, তার বাবাও পরিচিত এবং এখুনি সব সন্দেহের অবসান হবে, এই সব কারণের জন্যই বোধহয় ক্যাশিয়ার ড্রয়ার থেকে নোটের তাড়া বের করে মাখনকে দেবার জন্য গোণা শুরু করেন। ইতিমধ্যে যিনি ফোন করছিলেন তিনি রিসিভার রেখে চেঁচিয়ে উঠেন, ওর বাবা আজ কোন চেকই সই করেন নি। টাকা দেবেন না।

বিদ্যুতের মত চকিতে কাউন্টারের ওপাশে হাত গলিয়ে মাখন একতাড়া নোট ছোঁ মেরে তুলে নেয়। বলে, আর দেবেন না! যা পেয়েছি এই নিয়ে আমি হাওয়া হলাম।

দৌড়ে ব্যাঙ্কের বাইরে এসে সাইকেলে চাপে।

ব্যাঙ্কে চীৎকার উঠে—পাকড়ো! পাকড়ো!

ক্যাশিয়ার মাথায় হাত দিয়ে বসেন। দু' হাজারের মধ্যে প্রায় ষোলশো নিয়ে পালিয়েছে।

বেলা শেষে পলাতক বালক পদব্রজে বাড়ি ফেরে। দুর্ভাগ্যবশতঃ বাড়িতে প্রবেশ মাত্রই বাপের সঙ্গে দেখা হয়। তিনি ছেলের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েন। অনেকক্ষণ ধরে অপেক্ষা করছিলেন এবং ক্রোধে জ্বলছিলেন।

হতভাগা ছেলে! জালিয়াতি শিখেছো? তোমায় আমি খুন করে ফেলবো।

এই ভীষণ সংকট মুহূর্তে ছেলে কিন্তু বাপের চেয়ে উৎকৃষ্ট যুদ্ধ কৌশল দেখালে। গুরু আঘাত শুরু হওয়ার পূর্বেই সে আহত হয়। ওরে বাবারে, মেরে ফেল্লে রে—বলে ভীষণ চীৎকার করে বাপকে সম্পূর্ণ হতবুদ্ধি করে দিয়ে যাত্রাদলের কাটা সৈনিকের মত মাটিতে টিপ করে পড়েই মূর্ছিত হয়ে যায়।

বাড়ির ভিতর হতে চীৎকার শুনে নিরুদ্দিষ্ট পুত্রের জন্য চিন্তিত মা ব্যস্ত ভাবে ছুটে আসেন। ছেলের ঐ দশা দেখে তিনি তো ভয়ে আর্তনাদ করে উঠেন। ধুলায় লুণ্ঠিত ছেলের মাথা কোলে তুলে নেন।

তিনি স্বামীকে বলেন, দেখো দিকিনি কি করলে! একেবারে ছেলেটাকে মেরে ফেল্লে গা! উঃ, তুমি কি মানুষ! টাকাই তোমার কাছে সব চেয়ে বড় হলো? বাছা যে আমার সারাদিন কিছু খায় নি।

হ্যাঁ···খাওয়াবে। অমন ছেলেকে কেটে পুঁতে ফেল্লে তবে আমার রাগ যায়।

মুখে ক্রোধ প্রকাশ করলেও মনে মনে বোঝেন পরিস্থিতি প্রতিকূল। ছেলের উপর তিনি যতটা রেগেছেন তার থেকে তাঁর উপর স্ত্রী বেশী রেগে উঠবেন আর বেশী কিছু বল্লে। তিনি ঘরের ভিতর পশ্চাদপসরণ করেন।

মা এদিকে উদ্বিগ্নভাবে ছেলেকে ডাকেন, কথা ক' বাবা, চোখ চেয়ে দেখ—এই যে আমি।

বাপ চলে যাওয়ার পরেই ছেলে চোখ পিট পিট করতে থাকে।

তারপর অবস্থা সম্পূর্ণ নিরাপদ বুঝে তড়াক করে উঠে বসে। এমন ভাবে ওঠে যে মা পর্যন্ত একটু অবাক হয়ে যান। যাহোক ছেলের মাথায় হাত বুলাতে বুলাতে তিনি জিজ্ঞাসা করেন, টাকা নিয়েছিস কেন ব্যাঙ্ক থেকে?

ছেলে নীরব থাকে।

বলবি না? তুই তো আমার এমন ছেলে নস্ যে টাকা নিয়ে বাজে খরচ কববি। কি করেছিস টাকা, বল্ বাবা।

ছেল গম্ভীর ভাবলে, দেশের কাজে দিয়েছি, মা।

ভীত বিস্মিত মাতা বলেন, দেশের কাজে? সে কি রে! তুই কি স্বদেশী হয়েছিস না কি?

ছেলে বিজ্ঞের মত বলে, স্বদেশের এই দুর্দিনে সকলের তো স্বদেশী হওয়া উচিত, মা।

মার ভয় আরও বেড়ে যায়। কি সব্বনেশে কথা তুই বলিস, শুনলেও যে ভয়ে বুক কাঁপে। স্বদেশী করলে যে পুলিশে ধরে অপমান করবে।

ছেলে এবার পাখীর মত শেখান বুলি বললে, শুধু অপমান নয় মা। তারা হয়তো জেলে দেবে—দ্বীপান্তরে পাঠাবে—ফাঁসি দেবে। কিন্তু তবু আমরা থামবোনা—তবুও আমরা ভয় পাবো না—আমাদের কাজ আমরা করেই যাবো—যতদিন না দেশ স্বাধীন হয়।

মা ছেলেকে নিবিড় ভাবে বুকে টেনে নেন। বলেন, অমন কথা বলিস নি, বাবা। টাকা দিয়েছিস—দিয়েছিস, কিন্তু তুই ও দলে যাস নি। আমি তোকে যেতে দেব না। গলা তাঁর কান্নায় ভেঙ্গে আসে। তোকে ছেড়ে আমি বাঁচবো কেমন করে? বল্—বল্ বাবা, তুই যাবি না—ও দলে মিশবি না। আমাকে ছুঁয়ে বল্ বাবা!

মায়ের চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ে। কিংকর্তব্যবিমূঢ় মাখন অধোবদনে বসে থাকে।

জননীর অনুরোধ আর জন্মভূমির আহ্বান—কার ডাকে সাড়া দেবে জীবন?

মোদের আঁধার রাতে বাধার পথে
যাত্রা নাঙ্গা পায়
আমরা শক্ত মাটি রক্তে রাঙাই
বিষম চলার ঘায়।

—নজরুল

দুই দল ছেলেকে অনন্ত সিং বলেন, এই দেখো রেলের ম্যাপ। তোমরা যাবে পায়ে হেঁটে চট্টগ্রাম স্টেশন থেকে রেল-লাইন ধরে। পথে কোথায় কতগুলি ব্রিজ, কালভার্ট, সিগন্যাল পোষ্ট আছে তার হিসেব চাই। রেল-লাইন হতে কত দূরে দূরে গ্রাম, কোন জায়গা সবচেয়ে নির্জন, সমুদ্র কত দূর, পাহার কত দূর এসব সঠিক জানা চাই।

সন্ধানী দলের কাজ শুরু হয়।

রেল-পথ ধরে চার-পাঁচটি ছেলে চলে যায়।

তাদের রিপোর্ট অনুযায়ী সম্ভাব্য আক্রমণস্থলগুলি একদিন গণেশ ঘোষ ও অনন্ত সিং সাধারণভাবে পরিদর্শন করে আসেন।

সুবোধ চৌধুরীর উপর ভার পড়ে অক্সিলিয়ারী ফোর্সের হেড-কোয়ার্টার্স পর্যবেক্ষণের। মাঠের মধ্যে শুয়ে চোখে দূরবীণ লাগিয়ে সে গোপনে সব লক্ষ্য করে।

নরেশ রায়ের উপর ইউরোপীয়ান ক্লাবের ও বিধুর উপর টেলিফোন-টেলিগ্রাফ অফিসের সব তথ্য সংগ্রদের দায়িত্ব দেওয়া হয়।

তারকেশ্বর রেল-লাইন উপড়াবার উপযুক্ত স্থান নির্বাচন করে।

অনন্ত সিং ও গণেশ ঘোষ রাত্রে ছেলেদের নিয়ে গিয়ে ক্রো-বার দিয়ে কেমন করে রেল-লাইন তুলতে হয় শিখিয়ে দেন।

কামারের দোকান হতে বড় বড় লোহার রড তৈরি করান হয়। ওয়াটার-বটলের অর্ডার দেওয়া হয়।

অনন্ত কলকাতা হতে রিভলবার সংগ্রহের চেষ্টা করেন। অনুকুল মুখোপাধ্যায় ও ফরটিনাইন বেঙ্গল রেজিমেণ্টের যুদ্ধফেরৎ চট্টগ্রামেরই বিপ্লবী নগেন সেন তাঁকে যথেষ্ট সাহায্য করেন।

নির্জন ভাটিয়ারি স্টেশনে অনন্ত বে-আইনী মাল নিয়ে নামেন। গণেশ ও মাখন সেখানে তাঁর অপেক্ষায় ছিল।

গণেশ ও অনন্ত চট্টগ্রামের পুলিশ সেপাইদের সঙ্গে আলাপ জমান। কথাচ্ছলে খবর বের করাব চেষ্টা করেন।—

এৎনা কম তলব আউর এৎনা জাদা কাম করনে হোতা আপকো?

হাঁ, জি। আট ঘণ্টা রাতশে ডিউটি দেনে পড়তা।

আপ একেলা আট ঘণ্টা ডিউটি দেতে হেঁ?

একেলা নহি। চারো আদমী মিল কর।

চারো আদমী রহনেসে ভি সুবিস্তা কুছ নেহি। আপকো তো শোনে নেহি মিলতা?

জি, নেহি!

লিজিয়ে, বিড়ি পিজিয়ে।

গণেশ তাকে বিড়ি দেন। পশ্চিমী পুলিশদের সংগে বন্ধুত্ব করার জন্য গণেশ খৈনী খাওয়া অভ্যাস করেন, দেহাতী হিন্দি ভাষা শেখেন।

বিপ্লবীদের গুপ্ত বৈঠকে মাস্টারদা জানান, রিপোর্ট সব পাওয়া গেছে। বেশ বিস্তারিত রিপোর্টই পাওয়া গেছে। কোথায় কত পাহারা থাকে, কখন পাহারা বদল হয়, পাহারাদার কি রকমভাব থাকে, এমন

কি পাহারার সময় তারা ক পা হাঁটে, কতটা গিয়ে পিছন ফেরে তা পর্যন্ত। বাকী ঘর দোরের নক্সাও পেয়েছি, ফটোগ্রাফ পেয়েছি কয়েক জায়গারও।

মাস্টারদা খুব খুশী হন। অত্যন্ত সতর্ক নেতা তিনি, পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে সব জেনে তিনি কাজে হাত দেন। আন্দাজে ঢিল ছোঁড়ার মোটেই পক্ষপাতী তিনি নন।

অম্বিকা বলেন, অস্ত্রাগারে, টেলিফোন-টেলিগ্রাফ অফিসে বেশী লোক থাকে না। একমাত্র পুলিশ ব্যারাকেই বেশী লোক—শ তিনেক পুলিশ।

মাস্টারদা বলেন, পুলিশ ব্যারাকের রিপোর্ট সঠিক কিনা সেটা আমাদের ভালভাবে পরীক্ষা করা দরকার। একটু ভুলচুক থাকলে বিষম বিপদ হতে পারে।

অনন্ত বলেন, আমি আর গণেশ পুলিশ ব্যাবাকেব রিপোর্ট verify কববো ছদ্মবেশে ওর ভেতর ঢুকে।

নির্মল বলেন, খুব সাবধানে এবং সশস্ত্র হয়ে যেতে হবে। মাস্টারদা দলের নেতা হিসাবে অনুমতি দেন অস্ত্র সংগে নিয়ে ঘোরাব। তিনি আরও বলেন, এখন থেকে সাবধানে থাকতে হবে। পুলিশের নজর একটু বেড়ে উঠেছে। তারা দিনরাত্রি লক্ষ্য করছে। আমাদের এক জনের পিছনে চারজন করে গোয়েন্দা লাগিয়েছে।

রাত্রে পুলিশ সেজে অনন্ত সিং ও গণেশ ঘোষ পুলিশ ব্যারাকে প্রবেশ করেন। চারিদিক তন্ন তন্ন করে ঘুরে দেখেন।

গভীর রাত্রে বাড়ি ফেরার পথে হঠাৎ তাঁরা দেখেন ইউরোপীয়ান ক্লাব থেকে ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব একা বেরিয়ে বাড়ি ফিবছেন। অত্যধিক মদ্যপানে একটু অপ্রকৃতিস্থ। তাঁকে আক্রমণ বা অপহরণ করার ইচ্ছা এঁদের মনে একবার জাগে। কিন্তু পরক্ষণেই বোঝেন এখন ম্যাজিস্ট্রেটকে কিছু করলে কাল সারা শহরে হৈ হৈ পড়ে যাবে এবং

প্রধান কাজে বাধা পড়তে পারে। অগত্যা শত্রুকে হাতের মধ্যে পেয়েও ছেড়ে দেন। ম্যাজিস্ট্রেটকে সেলাম জানায় দুটি নকল পুলিশ।

পরিকল্পনার পর প্রস্তুতির পালা শুরু হয়।

পুরানো রিভলভার পরিষ্কার করা হন। ছোরায় শান দেওয়া হয়। বোমার খোলে বারুদ ভরা হয়। দুটি বিভিন্ন স্থানে তারকেশ্বর দস্তিদার ও রামকৃষ্ণ বিশ্বাসের তত্ত্বাবধানে বিস্ফোরক প্রস্তুত আরম্ভ হয়।

অনন্ত ও গণেশের নির্দেশমত বুলেট তৈরি করা হয়।

ইউনিফরম ও ব্যাজ তৈরি করানোর ভার নেয় দেবু গুপ্ত। ত্রিপুরা হ্যাভারস্যাক তৈরি করার ভার নেয়।

টর্চ লাইট ও প্রাথমিক চিকিৎসার সরঞ্জামাদি ক্রয় করা হয়। বিভিন্ন দোকান হতে পেট্রোলের টিন কেনা হয়। মাখন হাতুড়ি, রেঞ্জ ইত্যাদি কেনে। রজত কাছি, কুড়াল ইত্যাদি কেনে। এক রায় বাহাদুরের বাড়ির ছোট ছেলেকে ভুলিয়ে গণেশ ও অনন্ত তিনটি তরবারি সংগ্রহ করেন। লোকনাথ বল লুকিয়ে সেগুলি শান দিইয়ে আনেন। কিছু কুকরিও কেনা হয়।

'কলকাতা হতে দুটি ছেলে সংগে নিয়ে নিরঞ্জন সেন আসেন। তাদের মারফত অস্ত্রশস্ত্র আমদানির ব্যবস্থা করা হয়। কিন্তু দুর্ভাগ্য-বশতঃ পুলিশ কলাবাগানের বস্তি তল্লাস করে নিরঞ্জন সেন, সতীশ পাকড়াশী ও কয়েকটি ছেলেকে গ্রেপ্তার করে। সেখানে চট্টগ্রামের একটি ছেলের ঠিকানা পুলিশ পায়। চট্টগ্রামেও খানাতল্লাসি হয়। পুলিশ ও বিপ্লবীদল উভয়েই সতর্ক হয়ে উঠে।

পুলিশ সাহেব জনসন ও আই. বি. ইন্সপেক্টর সারদা ভট্টাচার্য প্রভৃতি মিলে এদের সম্বন্ধে আলোচনা করেন।

গোয়েন্দাদের জিজ্ঞাসা করা হয়, সে রকম কোন রিপোর্ট নেই?

না, উল্লেখযোগ্য কিছু নেই।

অনন্ত সিং, গণেশ ঘোষের গতিবিধি কি সন্দেহজনক নয়?

না, স্যার। watch করে যা বোঝা যায় তাতে তারা ক্লাব করে ভলান্টিয়ার দল গড়ছে জনসেবার জন্য। সভা-সমিতি মেলায় খবরদারি করে বেড়ায় খালি, আর কিছু নয়।

আর সূর্য সেন?

তিনি স্যার একবারে নিরীহ গোবেচারী। পড়াশোনা, মাস্টারি আর নিজের রান্নাবান্নার কৃচ্ছসাধনা নিয়েই আছেন। তবে মাঝে মাঝে কংগ্রেসের নামে একটু মাতেন।

কিন্তু ওই ছোট্ট দুর্বল নিরীহ লোকটিই বেশী বিপজ্জনক। দক্ষিণেশ্বর বোমার মামলা, রেল ডাকাতি, নাগারখানার লড়াইয়ের কথা ভুলে যেওনা সব।

ইতিমধ্যে এক মজার ঘটনা ঘটে। পুলিশ একটি ছেলেকে (বিধু ভট্টাচার্য) থানায় ধরে আনে। সন্দেহজনক কি এক পদার্থ ট্রাঙ্ক ভরে সে নিয়ে যাচ্ছিল কংগ্রেস অফিসের দিকে। থানায় হৈ হৈ পড়ে যায়। যে গোয়েন্দা বিধুকে ধরেছে সে জানায় ট্রাঙ্কটি বোমায় ভর্তি।

অফিসার এসে বিধুকে প্রশ্ন করেন, কি আছে ট্রাঙ্কে?

রহস্যপ্রিয় বিধু গম্ভীরভাবে বলে, খুলেই দেখুন না।

অফিসার পার্শ্ববর্তী একজনকে বলেন, খুলুন তো!

তিনি ভয়ে দু'পা পিছিয়ে গিয়ে বলেন, যদি স্যার ফাটে?

এ কথায় সকলেই একটু ভীত হয়ে পড়ে। বিধু মুখ টিপে হাসে। অফিসার তার দিকে ফিরে হুকুম করেন, খোলো ট্রাঙ্ক।

বিধু ব্যংগভরে অনুকরণ করে বলে, যদি স্যার ফাটে?

তার কথায় উপস্থিত সকলে পরস্পরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে।

বিধু উচ্চকণ্ঠে হেসে উঠে এগিয়ে গিয়ে ট্রাঙ্কের ডালা তোলে। ভিতরে এক গাদা লোহার জিনিস—বোমার খোল বলেই মনে হয়।

ভীত সন্ত্রস্ত পুলিশ কর্মচারীদের দিকে ফিরে হেসে বিধু বলে, ভয় পাবেন না। এগুলি ওয়াটার বটল, আমাদের স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর জন্য।

এই রকম হাস্যকর দুরবস্থার মধ্যে পড়ে পুলিশ অফিসার রাগ চেপে রাখতে না পেরে বিধুর সামনেই কর্মচারীদের দিকে ফিরে গর্জে উঠেন, তোমরা সব গাধা!

অনন্ত-গণেশের কানে আসে মাস্টারদা নাকি কল্পনা দত্ত ও প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার সম্বন্ধে আগ্রহ প্রকাশ করেছেন, খুব সম্ভবত তাদের পার্টিতে নেবেন। এই সংবাদে দুই বন্ধুই খুব উত্তেজিত ও ক্রুদ্ধ হয়ে উঠেন। মাস্টারদার কাছে গিয়ে তীব্র ভাষায় আপত্তি জানিয়ে তাঁরা বলেন যে মেয়েদের কোন ক্রমেই দলে নেওয়া চলে না। তাদের জন্য এ পথ নয়।

মাস্টারদা মৃদু হেসে জিজ্ঞাসা করেন, মেয়েদের উপর তোমার এ রকম ধারণা কেন বল তো?

সে সময় সকলের ধারণা ছিল বিপ্লবের রক্তাক্ত পথে পা বাড়াবার মত মেয়ে এই নরম মাটির দেশে জন্মায় না। পূজা-অর্চনা, পতি সেবা, সন্তান ধারণ ও পালনের মধ্যেই মেয়েদের জীবন সীমাবদ্ধ। এর বাইরে মেয়েরাও কিছু ভাবতে পারে না, করতেও পারে না।

কিন্তু মাস্টারদা মেয়েদের অন্য চক্ষে দেখতেন। শক্তির পূজারী সূর্য সেন শক্তিরূপিনী নারীর রুদ্রাণীমূর্তি কল্পনা করতেন···হস্তে আয়ুধ, বদনে বরাভয় আর বক্ষে অমৃত।

অনন্তও চাইতেন মেয়েদের অবলা নাম ঘুচুক। শক্তি ও সাহসে তারা পুরুষের সমকক্ষ হোক। তাঁর দিদি ইন্দুমতীকে তিনি লাঠি ছোরা, যুযুৎসুতে পারদর্শী করে তুলেছিলেন। তবে তাঁর মতে প্রত্যেকে নিজের পরিবারের মেয়েদের সর্ব বিষয়ে উপযুক্ত করে তুলুক। এ দায়িত্ব ব্যক্তিগতভাবে প্রত্যেকে নিলেই প্রয়োজন কালে সাহায্য পাওয়া যাবে। পার্টির মধ্যে মেয়েদের আনতে তিনি ইচ্ছুক ছিলেন না। ছেলে মেয়ের অবাধ মেলামেশা তিনি অপছন্দ করতেন। তাতে শৃঙ্খলা ভংগের ভয় করতেন।

মাস্টারদাকে বলা হয়, জানেন তো ক্লিওপেট্রার জন্য এক সাম্রাজ্য ধ্বংস হয়েছিল।

জবাবে মাস্টারদা বলেন, দেশের মুক্তির জন্য জোয়ান অফ আর্কের কথাও জানিস তো।

এ দেশে সে রকম মেয়ে কই? এ কথা জিজ্ঞাসা করতে গিয়ে থেমে যেতে হয়।

চোখের সামনে ভেসে উঠে চাঁদ সুলতানা…ঝাসীর রাণী লক্ষ্মীবাঈ …রাজপুত রমণী তারাবাঈ…আরও কত বীর নারীর চিত্র।

মাস্টারদার সামনে ভেসে উঠে আরও একটি মুখ—এই শ্যামল কোমল বাংলার এক বধু—পুষ্পকুন্তলা সেন—সূর্য সেনের জীবন কাব্যের উপেক্ষিতা সীতা। তাঁর সঙ্গে বিবাহ বন্ধন ব্যতীত আর কোন বন্ধন ছিল না। মনে পড়ে সহধর্মিণীর মনে সহকর্মিণী হবার জন্য কি ব্যাকুল আগ্রহ ছিল। বন্দী অবস্থায় তাঁর অসমাপ্ত কর্ম—সকলের সঙ্গে গোপনে সংযোগ রক্ষা—কি সুনিপুণভাবেই সে করতো। কিন্তু তবু তাকে স্ত্রীলোক বলে জোর করে বিপ্লবীর জীবন হতে দূরে সরিয়ে রাখতে হয়েছিল।

অতীতের পুনরাবৃত্তি ভবিষ্যতে তিনি করতে চান না। তাছাড়া দূরদর্শী নেতা বলে হয়তো তিনি বুঝেছিলেন যে অচিরেই এমন এক-দিন আসবে যেদিন পুরুষের চেয়ে মেয়েরা বেশী কার্যক্ষম হবে।

সে দিন সত্যি এসেছিল। চট্টগ্রামে পুরুষদের স্বাধীনভাবে ঘোবার অধিকার যেদিন লুপ্ত হয়েছিল—দলের সবাই প্রায় জেলে না হয় গুপ্ত আশ্রয়ে—মিলিটারি কারফিউ, পারমিট প্রভৃতি বাধার বেড়াজাল ভেদ করে যুবকদের কোন কিছু করা যেদিন অসাধ্য হয়েছিল, সেদিন কল্পনা, প্রীতি, ইন্দুমতী পুলিশের সতর্ক দৃষ্টিকে ফাঁকি দিয়ে বিপ্লবীদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ করতেন।

ভাই, তুমি অভিনব,
প্রতিদান তুমি নেবে না, কেবল
দিয়ে যাবে প্রাণ তব।

—**অন্নদাশঙ্কর রায়**

কংগ্রেস অফিস সংলগ্ন মাস্টারদার ঘরে টেগরা সেদিন দুপুরে আসে। বলে, মাস্টারদা, পয়সা দিন তো। এক ভিখিরি এসেছে বাইরে।

মাস্টারদার দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল রবীন্দ্রনাথের কাব্যগ্রন্থে। বই থেকে মুখ তোলেন তিনি। হাওয়ায় পাতাটা উড়ে যায়। চোখে পড়ে কটা পংক্তি—মাস্টারদার অতি প্রিয়—

'উদয়ের পথে শুনি কার বাণী
ভয় নাই, ওরে, ভয় নাই।
নিঃশেষে প্রাণ যে করিবে দান
ক্ষয় নাই, তার ক্ষয় নাই।'

ধীর শান্ত স্বরে টেগরাকে তিনি বলেন, পয়সা তো নেই।

ও! আচ্ছা! এক মুঠো চাল দিয়ে দিচ্ছি! সপ্রতিভ টেগরা তাড়াতাড়ি সে ঘর হতে মাস্টারদার রান্নাঘরে ঢোকে।

চাল রাখা হাঁড়িতে হাত ঢুকিয়ে দেখে শূন্য। ঘরের চারিদিক চেয়ে দেখে।

মাস্টারদার রান্নার হাঁড়ি পরিষ্কার মাজা অবস্থায় এক কোণে রাখা। উনানের অবস্থা দেখে বোঝে রান্না হয়নি। সে আরও বোঝে মাস্টারদা অন্নাভাবে অভুক্ত।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে দ্রুত মাস্টারদার কাছে এসে সে প্রশ্ন করে, আপনি আজ রান্না করেন নি ?

না। তুই ভিখিরিটাকে গণেশের বাড়ি নিয়ে গিয়ে কিছু খাইয়ে দে।

নিজের আহারের দিকে তাঁর ভ্রূক্ষেপ নেই, অন্যের জন্য অথচ চিন্তা করেন। এমনি অদ্ভুত মানুষ মাস্টারদা। মাইনের টাকা যা পেয়েছেন কোন দুঃস্থকে দান করে বসে আছেন। বিলাস ব্যসনের উপকরণ দূরে থাক, জীবনের অতি প্রয়োজনীয় দ্রব্যগুলির জন্যও তিনি পরোয়া করেন না। স্বাধীনতার সাধক সূর্য সেন সত্যি যেন সন্ন্যাসী।

গণেশের কাপড়ের দোকানে এসে টেগরা রুদ্ধকণ্ঠে বলে, জানেন, গণেশদা, আমাদের মাস্টারদা ভিখিরির চেয়ে গরিব। ভিখিরিটার ঝুলিতে তবু দু' মুঠো চাল ছিল, মাস্টারদার তাও নেই !

হুঁ, মাস্টারদা আমাদের ওই রকমই, গম্ভীরভাবে বলে গণেশ ঘোষ। দোকানের ক্যাশ বাক্স খুলে দশটাকার একটা নোট হাতের মুঠায় নেয়।

মাস্টারদার কাছে এসে গম্ভীরভাবেই গণেশ বলেন, এই নিন। আপনার সঙ্গে আমাদের আর কোন সম্পর্কই নেই।

টাকাটা গ্রহণ না করে মাস্টারদা মৃদু হেসে বলেন, কেন রে ? কি হলো ?

আপনি তো আমাদের আপন জন বলে মনে করেন না। এই যে না খেয়ে আছেন আমাদের ঘুণাক্ষরেও তো জানান নি।

ব্যাপারটা লঘু করার জন্য পরিহাস-তরল কণ্ঠে তিনি বলেন, না খেয়ে আছি কে বল্লে ? দুদিন সমানে চা খেয়ে আছি।

অভিমানে, বেদনায়, ক্ষোভে ও দুঃখে গণেশের কণ্ঠ ভারী হয়,—থামুন, থামুন ! আপনার দুঃখ কষ্ট বলে কিছু না থাকলেও, আমাদের আছে।

একটু থেমে তিনি আবার বলেন, আচ্ছা, মাস্টারদা, নিজের টাকা ফুরিয়ে গেলেও কাজের টাকা তো আপনার কাছে ছিল। সে টাকা

নিলে পারতেন। আপনার জীবনের চেয়ে সে টাকার মূল্য তো বেশী নয়।

গম্ভীর কণ্ঠে মাস্টারদা বলেন, কাজের টাকা কাজেরই জন্য গণেশ।

বেশ। তবে আমার টাকাই নিন। মাস্টারদা, আমরা কি আপনার পর?

মাস্টারদা গণেশ ঘোষকে বুকে টেনে নিয়ে বলেন, তা নয় রে পাগল, তা নয়। তবে এই সামান্য ব্যাপারে এতো বিচলিত হচ্ছিস কেন? আমাদের আদর্শই তো নিজেদের নিঃশেষে বিলিয়ে দেওয়া···

দুর্ভাগ্যক্রমে বিস্ফোরক প্রস্তুতের ভার যাদের উপর ছিল তারা দুর্ঘটনায় দগ্ধ হয়। প্রথমে রামকৃষ্ণ বিশ্বাস পুড়ে যায়। গণেশেরা তাকে এক নিরাপদ স্থানে নিয়ে গিয়ে ডাক্তার ডাকেন।

ডাক্তার স্বভাবতঃই প্রশ্ন করেন, কি করে পুড়লো

চা করতে গিয়ে স্টোভ ফেটে যায়। এঁরা মিথ্যা কারণ দেখান।

ডাক্তার বিশ্বাস করেন না। তিনি পুলিশে খবর দেন। পাছে ভবিষ্যতে তাঁকে শুদ্ধ কোন হাঙ্গামায় জড়িত হতে হয়। অবশ্য বিপ্লবীদের একটু উপকার তিনি করেন—থানায় খবর দেওয়ার কথা তাঁদের তিনি জানিয়ে দিয়েছিলেন। ফলে পুলিশ এসে যখন সে বাড়ি ঘিরে ফেলে তখন কাকেও পায় না। অবশ্য বাণ্ডেজ তুলো ইত্যাদি দেখে পুলিশ ঘটনা সম্বন্ধে রহস্যের গন্ধ পায়। এরপর পুলিশ রামকৃষ্ণের জন্য সারা শহরে খুব জোর অনুসন্ধান শুরু করে। বিপ্লবীদের গোয়েন্দা বিভাগ পুলিশের গতিবিধি সম্বন্ধে সর্বদা সংবাদ রাখতো এবং রামকৃষ্ণকেও বিভিন্ন স্থানে নিরাপদে সরিয়ে ফেলায় সাহায্য করতো। এমন হয়েছে পুলিশ সন্ধান পেয়ে আসার মাত্র আধঘণ্টা আগে তাঁরা স্বচ্ছন্দে স্থান ত্যাগ করে চলে গেছেন।

এই ঘটনায় কয়েকদিন পর বেলা দ্বিপ্রহরে কংগ্রেস অফিসে এক

বিরাট বিস্ফোরণ হয়। বোমা প্রস্তুত কালে তারকেশ্বর ও অর্ধেন্দু ভীষণ ভাবে আহত হয়। তারকেশ্বরের সারা দেহ দগ্ধ হয়, গায়ের চামড়া কালো হয়ে পুড়ে ফেটে যায়, মাথার চুলও সম্পূর্ণ পুড়ে গিয়ে চিতায় অর্ধ দগ্ধ শবের মত বীভৎস দেখতে হয়।

মাস্টারদা ও নির্মল সেন সেই সময় সেখানে উপস্থিত ছিলেন এবং ফকির সেন বাইরে পাহারায় ছিল। তাঁরা তাড়াতাড়ি ঘরের রাসায়নিক দ্রব্যাদি ও অন্যান্য উপকরণ লুকিয়ে ফেলেন রবাহুতদের আগমন আশঙ্কায়।

অনন্ত সিংয়ের বাড়িতে সাইকেলে করে একটি ছেলে এসে খবর দেয়। অনন্তদা, শিগ্‌গির আসুন! মাস্টারদা ডেকে পাঠিয়েছেন। তারকেশ্বর ভীষণ পুড়ে গেছে।

অনন্ত সিংয়ের উপর পুলিশের সে সময় ভীষণ নজর। গুণ্ডাদের সঙ্গে মারামারির কয়েকটা মামলায় তিনি জড়িত, জামিনে খালাস আছেন। তাই ছেলেটিকে তিনি জিজ্ঞাসা কবেন, আমার বাড়ির সামনে I. B. Watcher বসে আছে?

হ্যাঁ।

এক মুহূর্ত তিনি কি ভেবে নেন। তারপর বলেন, আচ্ছা, ঠিক আছে চল।

পথে নেমে অনন্তদা এক দিকে চলেন। ছেলেটি বলে, এদিকে নয়।

আমি জানি।

বাড়ি হতে বের হতেই অনন্ত সিংয়ের পিছু নেয় গোয়েন্দা। অনন্ত তাকে একবার দেখে উপেক্ষা করে এগিয়ে চলেন।

কি করে পুড়লো?

বো: : হয় মর্টারে, কিছু sulphur-এর trace ছিল। ভাল করে না ধুয়ে তাতেই chlorate of potash গুঁড়োচ্ছিল,—explosion হয়।

আরও সাবধান হওয়া উচিত ছিল। এরপর দেখছি সব কাজ আমাদের নিজের হাতে করতে হবে।

মৃদুস্বরে কথা বলতে বলতে তারা খানিক দূর চলেন। হঠাৎ অনন্ত ছোঁ মেরে সাইকেলটি ছেলেটির কাছ থেকে নিয়ে তাতে চড়ে উল্টো দিকে পাড়ি দেন। গোয়েন্দাটি কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে যায়। অনন্ত সিংয়ের পিছনে দৌড়ান অনর্থক বুঝে ছেলেটির কাছে এসে প্রশ্ন করে, কোথায় গেলেন উনি ?

জানি না।

গোয়েন্দা কটমট করে চায়। ছেলেটি তার নিষ্ফল ক্রোধে হেসে উঠে।

অনন্ত খুব অল্প সময়ের মধ্যেই বাহন বদলে মোটরে গণেশ ঘোষকে নিয়ে কংগ্রেস অফিসে হাজির হন।

চিকিৎসা বিজ্ঞানের ছাত্র নরেশ তখন দগ্ধ ব্যক্তিদের প্রাথমিক চিকিৎসা করছে। তারকেশ্বরের অবস্থা দেখে বোঝা যায় তাকে বাঁচানো অসম্ভব। অলৌকিক ক্ষমতা ব্যতীত এরকম দগ্ধ হওয়ার পর কোন মানুষ বাঁচে বলে ধারণা করা চলে না।

সে যন্ত্রণায় চীৎকার করে, আমায় মেরে ফেলুন। মেরে ফেলুন! এ যন্ত্রণা সহ্য করতে পারছি না।

বিপ্লবী নেতারা পরস্পরের দিকে চান। কি করবেন তাঁরা বুঝে উঠতে পারেন না। রামকৃষ্ণের চিকিৎসা করাতে গিয়ে তাঁরা সকলে প্রায় ধরা পড়েছিলেন। আজও পুলিশ রামকৃষ্ণের খোঁজ করছে। একেও লুকিয়ে রাখা কি সম্ভব হবে ? সুচিকিৎসার কি ব্যবস্থা হবে ? সব কিছু সম্ভব হলেও এ কি শেষ পর্যন্ত বাঁচবে ?

এদিকে তার কাতর আর্তনাদ কানের ভিতর দিয়ে মর্মের মধ্যে প্রবেশ করছে।

বড় জ্বালা! বাবা রে! আমায় গুলি করো! অনন্তদা! আমায় গুলি করো!

প্রিয়জনের এ যন্ত্রণা দাঁড়িয়ে দেখা চলে না। বিপ্লবী অনন্ত সিং মনকে কঠোর-কঠিন করে তোলেন। কোমর হতে রিভলভার টেনে বের করেন তার সব যন্ত্রণা চিরতরে অবসান করার জন্য।

কিন্তু বজ্রমুষ্টিতে গণেশ ঘোষ বন্ধুর হাত চেপে ধরেন। তার দুচোখে তীব্র ভর্ৎসনা।

সূর্য সেন অনন্ত সিংকে বলেন, Save him! একমাত্র তুমিই মারতে পারো, আবার তুমিই বাঁচাতে পারো।

অনন্ত সিংয়ের শক্তির উপর সূর্য সেনের অগাধ আস্থা ছিল।

মুমূর্ষু সহকর্মীকে মোটরে তুলে বেরিয়ে পড়েন অনন্ত সিং।

চট্টগ্রামের পথে পথে তার মোটর ঘুরে বেড়ায়। মাঝে মাঝে ছেলেরা গোপনে তার গাড়িতে পেট্রোলের টিন জোগায়।

সূর্য ডুবে যায়। রাত্রি আসে।

এক মোড়ে অন্ধকারে গাড়ি থামিয়ে একটি ছেলে জানায়— আস্তানা ও ডাক্তারের ব্যবস্থা হয়েছে।

নিশীথ রাত্রে নদীর ধারে গিয়ে এক মাঝির সঙ্গে গণেশ আলাপ করেন। দূরে মোটরের মধ্যে অপেক্ষা করেন অনন্ত। গণেশ এসে তাকে জানান মাঝি রাজী হয়েছে। শহর থেকে দূরে গ্রামে তারকেশ্বরকে লুকিয়ে রাখা হয়।

দুর্ঘটনা দুটির পর হতে অনন্ত ও গণেশ আর কারুকে বিস্ফোরক প্রস্তুতের ভার দেন নি। তাঁরা নিজেদের হাতেই সব করতেন এবং আত্মরক্ষার জন্য ইস্পাতের বর্ম ব্যবহার করতেন।

পুলিশ এদের উপর লক্ষ্য রাখার পদ্ধতির পরিবর্তন করেছিল এই সময়। প্রতিনিয়ত এদের অনুসরণ করার বদলে এদের প্রধান আড্ডা-গুলির উপর কড়া নজর রাখতে শুরু করে। এদের সাময়িক ভাবে অবাধ ঘোরাফেরার সুযোগ এইজন্য দিয়েছিল যাতে সব গুপ্তকেন্দ্র-

গুলির সন্ধান সহজে পাওয়া যায়। এঁরা যথেষ্ট সতর্ক ছিলেন এবং বিপ্লবীদের গোয়েন্দা বিভাগ খুব কার্যক্ষম হয়ে উঠেছিল।

থানার সামনে হঠাৎ সেদিন পুলিশ হাত দেখিয়ে অনন্ত সিংকে গাড়ি থামাতে বলে।

গাড়িতে গণেশ ঘোষও ছিলেন। তাঁকে অনন্ত জিজ্ঞাসা করেন, থামাবো ?

থামাও। সঙ্গে অস্ত্র আছে তো !

হ্যাঁ। একটু হেসে বলেন, আজকাল Ananta and weapon go together.

ইন্সপেক্টর ওদের থানার ভিতরে আহ্বান করেন। প্রবেশ করার আগে দু'বন্ধু একবার চারিদিকে সতর্ক দৃষ্টি বুলিয়ে পর্যবেক্ষণ করে নেন—প্রয়োজন হলে পালাবার পথ পরিষ্কার আছে কি না।

ইন্সপেক্টর ওঁদের সরাসরি বলেন, আপনাদের কাছ হতে একটা খবর জানার আছে।

তাঁর কথায় কোন গুরুত্ব আরোপ না করে এঁরা জবাব দেন, একটা কেন, গোটা খবরের কাগজের খবরই আপনাকে জানাতে পারি।

না, না। সে খবর নয়। গোপনীয়।

কৃত্রিম গাম্ভীর্য ভরে জবাব দেওয়া হয়, গোপনীয় ? সর্বনাশ ! রাজনৈতিক নয়তো ?

রাজনৈতিকও বলা চলে। তবে আপনাদের রাজনীতি সংক্রান্ত, দেশের সাধারণের খোলাখুলি রাজনীতি নয়।

ও ! আমাদের রাজনীতি ? তা সে তো মোটেই গোপনীয় নয়। নির্বাচনে আমরা সুভাষ বাবুকে সমর্থন—

তামাসা রাখুন ! ইন্সপেক্টরের ধৈর্যের বাঁধ ভাঙে। রামকৃষ্ণকে আপনারা কোথায় লুকিয়ে রেখেছেন ?

আমরা লুকিয়ে রেখেছি ? এঁরা আকাশ হতে পড়ার ভান করেন।

হ্যাঁ। সে খবর আমরা পেয়েছি।

তাহলে কোথায় লুকিয়ে রেখেছি সে খবরটাও নিশ্চয় পেয়েছেন।

ইন্সপেক্টর বোঝেন এভাবে প্রশ্ন করলে সুবিধা হবে না। এতে পুলিশের অক্ষমতাই প্রকাশ পাবে। এবার আলোচনা তিনি অন্য পথে চালান।

শুনলাম আপনারা রিভলভার নিয়ে ঘুরে বেড়ান।

অনন্ত ও গণেশ উচ্চকণ্ঠে হো হো করে হেসে উঠেন। কথাটা তাঁরা হেসেই উড়িয়ে দিতে চান।

শুধু রিভলভারের কথাই শুনেছেন? আর মেসিনগানের কথা শোনেন নি?

আপনারা তামাসা করছেন?

আমরা তামাসা করছি? আর অন্যলোক আপনার সঙ্গে তামাসা করেছে আমাদের নিয়ে তা বোঝেন না?

থানা হতে বেরিয়ে অনন্ত বলেন, শুধু strong nerve থাকায় আজ আমরা বেঁচে গেছি।

গণেশ বলেন, দুজনকার কাছেই ভর্তি রিভলভার ছিল। সহজে আটকাতে পারত না।

থানায় বোধ হয় ইন্সপেক্টর তখন সহকর্মীদের কাছে গর্ব করছিলেন, আমি হলফ করে বলতে পারি ওদের কাছে কিছু থাকে না। সত্যি করে বে-আইনী অস্ত্র শস্ত্র রাখলে আমার জেরায় ঘাবড়িয়ে গিয়ে ঠিক ধরা পড়ে যেত।

১৯৩০ সালের জানুয়ারি মাসে লাহোর কংগ্রেসে প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়—পূর্ণ স্বাধীনতার। কংগ্রেস সংকল্প করে আইন-অমান্যের।

চট্টগ্রামের বিপ্লবীরা আলোচনা করেন দেশের অবস্থা সম্বন্ধে। শীঘ্রই ভীষণ বিক্ষোভ শুরু হবে। এঁরা সিদ্ধান্ত করেন এদের পরিকল্পিত অভ্যুত্থান ও কংগ্রেস আন্দোলন একই সময়ে হওয়া উচিত। দেশ-জোড়া উত্তেজনার আবহাওয়ায় কাজ করলে সবার সাহায্য ও সমর্থন পাওয়া যাবে।

তাই মাস্টারদা জিজ্ঞাসা করেন, তোমাদের preparationএর আর কত বাকী?

সব হয়ে এসেছে। এখন উপযুক্ত মুহূর্তের জন্য অপেক্ষা করা।

সর্ব বিষয়ে সচেতন নেতা মাস্টারদা আর অনন্ত সিং লক্ষ্য করছিলেন কাজের মাঝে কোথা দিয়ে কেমন করে যেন ঢিলেমি এসে যাচ্ছে—একটা হচ্ছে-হবে গোছের ভাব ধীরে ধীরে সবার মনে আসছে। বিশ্লেষণ প্রিয় অনন্ত বোঝেন এ হচ্ছে মানব মনের স্বাভাবিক দুর্বলতা—অলসতা নয়। বিপ্লবীর অবচেতন মনে বাঁচার মোহ তাকে এত শীঘ্র জীবনের হিসাব নিকাশ মিটিয়ে দিতে চায় না। সব কিছু প্রস্তুত করার পরও পরম ক্ষণকে পিছিয়ে রাখা—শুধু ষড়যন্ত্র করার আকর্ষণ, বিপ্লব নিয়ে বিলাস—এর থেকে মুক্ত হতে হবে।

তাই তাঁরা দৃঢ় মনে প্রতিজ্ঞা করেন যে কাজ যা বাকী আছে, যা কিছু আয়োজন করার প্রয়োজন—আজ থেকে ঠিক দু'মাসের মধ্যে সব শেষ করতে হবে।

নির্মল সেন কলকাতা হতে একটি হ্যাণ্ড প্রেস কিনে আনেন। শক্তিমান লেখক গণেশের উপর ভার পড়ে ইস্তাহার লেখার।

অনন্ত সিং এক কম্পোজিটারের সঙ্গে আলাপ করে টাইপ সংগ্রহ করেন এবং ছাপাবার কায়দা শিখে নেন।

নির্মলের বাড়িতে গোপনে নিম্নলিখিত ঘোষণাপত্র গণেশ ও অনন্ত ছাপান:

THE INDIAN REPUBLICAN ARMY

The Indian Republican Army, Chittagong Branch, hereby solemnly declares its intention to stand today against the age-long repression by the British people and their government which they have followed as a cruel policy to keep the three hundred millions Indian people subjugatad for unlimited time and to eradicate the slightest trace of nationalism and their national originality amongst them.

The right of ownership of India and the control of her destiny belongs to the people of India only and the long usurpation of that right by a foreign people and government has not extinguished that right nor it ever can. The Indian Republican Army proclaims today its intention of asserting this right in arms in the face of the world and thus putting into actual practice the idea of Indian independence declared by the Indian National Congress, and hereby pledges the life of every one of its members to the cause of freedom, to the welfare and exaltation of the Motherland amongst all other nations. It remembers today with sorrwful indignation the inhuman massacre of the Indian people perpetrated

by the British Government of the Indian soil, the blowing up of her womenfolk in the mouth of guns, the indiscriminate hangings and cold-blooded murders of her manhood, the crushing of her infants under the cruel British boots and the complete destruction of her trade and industries and takes up the sacred vow of retaliating and avenging the blood of her late wronged children.

The Indian Republican Army is entitled to and hereby claims the allegiance of every Indian people for the upkeep of national cause and honour and also prays that no person who reveres this cause will dishonour it by callousness, cowardice and inhumanity. In this supreme hour the Chittagong people must, by their valour and patriotism and by the readiness of her children to sacrifice themselves for the common good, prove themselves worthy of the august destiny to which they are called.

By order,
President-in-Council,
Indian Republican Army,
Chittagong Branch.

(দি ইণ্ডিয়ান রিপাবলিকান আর্মি)

ভারতীয় প্রজাতান্ত্রিক বাহিনী, চট্টগ্রাম শাখা, এতদ্বারা আজ ঘোষণা করিতেছে ইংরাজ সরকারের যুগ যুগ ধরিয়া দমনমূলক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে তাঁহাদের রুখিয়া দাঁড়াইবার দৃঢ় সঙ্কল্প। ইংরাজদের নিষ্ঠুর নীতি ত্রিশ কোটি ভারতবাসীকে চিরতরে পরাধীন করিয়া রাখিবার

জন্য এবং ভারতবাসীর মধ্যে বিন্দুমাত্র জাতীয়তাবোধ ও বৈশিষ্ট্য বিলুপ্ত করিবার জন্যই অনুসৃত হইয়াছে।

ভারতের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণের অধিকারী একমাত্র ভারতীয় জনসাধারণই। এই অধিকার বিদেশী সরকার বহুকাল অস্বীকার করিলেও সম্পূর্ণ বিনষ্ট করিতে সক্ষম হয় নাই এবং কখনও হইবে না।

ভারতীয় প্রজাতান্ত্রিক বাহিনী জগৎ সম্মুখে এই অধিকার অস্ত্রবলে প্রতিষ্ঠা করিবার সঙ্কল্প আজ গ্রহণ করিয়াছে এবং ভারতের জাতীয়-কংগ্রেসের স্বাধীনতার স্বপ্নকে এইভাবে বাস্তবে রূপায়িত করিবে। ভারতীয় প্রজাতান্ত্রিক বাহিনীর প্রতিটি সৈনিক দেশের স্বাধীনতার জন্য, মাতৃভূমির মঙ্গলের জন্য, বিশ্বের জাতিসমূহের মধ্যে ভারতবর্ষের মর্যাদাপূর্ণ আসন প্রতিষ্ঠার জন্য তাঁহাদের জীবন উৎসর্গ করিবার শপথ গ্রহণ করিতেছে।

এই সেনাবাহিনী গভীর ক্ষোভের সঙ্গে আজ স্মরণ করিতেছে —বৃটিশ সরকারে অমানুষিক অত্যাচার—ভারতের মৃত্তিকা দেশবাসীর রক্তে রঞ্জিত করিবার কথা, ভারতীয় নারীদের কামানের মুখে নিক্ষেপ করিবার কথা, দেশভক্তদের নির্বিচারে ফাঁসি দেবার কথা, স্থির মস্তিষ্কে পুরুষদের হত্যা করবার কথা, শিশুদের বৃটিশ-সেনার বুটের তলায় নিষ্পেষণ, দেশের ব্যবসা-বাণিজ্যের সম্পূর্ণ ধ্বংস সাধন। এই নির্যাতিত ভারতসন্তানদের রক্তের ঋণ পরিশোধ করিবার জন্য, প্রতিশোধ গ্রহণ করিবার জন্য ভারতীয় প্রজাতান্ত্রিক-বাহিনী পবিত্র শপথ গ্রহণ করিতেছে।

ভারতীয় প্রজাতান্ত্রিক বাহিনী এতদ্বারা জাতীয় স্বার্থ ও সম্মান সংরক্ষণের জন্য প্রতিটি দেশবাসীর আনুগত্য দাবী করিতেছে এবং প্রার্থনা করিতেছে যে যাঁহারা এই উদ্দেশ্যকে সম্মান করেন তাঁহারা কেহ যেন ভীরুতা ও নিস্পৃহতার বশবর্তী হইয়া এই ঘোষণাকে অবহেলা বা অবমাননা না করেন।

এই চরম লগ্নে চট্টগ্রামবাসীরা তাঁহাদের সাহসিকতা ও

স্বদেশিকতা দ্বারা এবং জাতীয় স্বার্থে তাঁহাদের সন্তানগণের আত্ম-ত্যাগের আগ্রহ দ্বারা প্রমাণিত করিবেন যে দেশের মহান ভবিষ্যৎ গঠন কর্মের উদাত্ত আহ্বানে তাঁহারা সাড়া দিতে সক্ষম।

অনুমত্যানুসারে
সপারিষদ সভাপতি,
ভারতীয় প্রজাতান্ত্রিক বাহিনী,
চট্টগ্রাম শাখা।

The Students and Youths of Chittagong.

Dear Brothers,

The Indian Republican Army has made an attempt to assert its rightful claim to liberate the country from the cruel yoke and oppression of the British people and their government and has kept up flying the ensign of free India. The British Government during the last two hundred years of their tyrannical reign in India have crushed with very cruel hands the Indians every time they have tried to achieve freedom, and this time also they will not spare any energy to restore their illegal establishment for predatory exploitation. So, brothers, rise to the situation. try to feel the anguish of subjugation, see to the sad plight your country has been put to, see what the youths and students of Germany, Russia and China are doing, kindle up the fire of wrath and

retaliation in your hearts, enrol yourselves as soldiers under the Indian Republican Army and make an ardent attempt to save the motherland from the abyss of misfortune and misery.

By order,
President-in-Council
Indian Republican Army.

নন্দন কাননের এক কুটিরে নিম্নলিখিত দুটি ঘোষণাপত্র এক রাত্রে মুদ্রণ করা হয়। এগুলি অভ্যুত্থানের রাত্রে শহরময় বিতরণ করার সিদ্ধান্ত হয়।

চট্টগ্রামেব ছাত্র ও যুবকবৃন্দের প্রতি—

প্রিয় ভ্রাতৃবৃন্দ,

বৃটিশ সরকারের নিষ্ঠুর নিপীড়ন ও দাসত্ব বন্ধন হইতে মাতৃভূমিকে মুক্ত করিবার জন্য, স্বাধীন ভারতের জাতীয় পতাকা ঊর্ধ্বে উড্ডীন করিবার জন্য এবং ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য ভারতীয় প্রজাতান্ত্রিক বাহিনী প্রচেষ্টা শুরু করিতেছে।

স্বৈরাচারী শাসক বৃটিশ সরকার বিগত দুই শত বৎসর ধরিয়া যতবারই ভারতবাসী স্বাধীনতা অর্জনের প্রচেষ্টা করিয়াছে ততবারই নির্দয় হস্তে তাঁহাদের দমন করিয়াছে এবং এইবারও শাসক-সম্প্রদায় তাহাদের অন্যায় শাসন ও দস্যুসুলভ শোষণ অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য কোন ত্রুটি করিবে না।

অতএব, ভাইসব, পরাধীনতার বেদনা অন্তরে অনুভব করিয়া ও দেশের দুর্দশা প্রত্যক্ষ করিয়া উদ্বুদ্ধ হউন। জার্মানী, রুশ ও চীনের

ছাত্র-যুবকদের কার্যাবলী সম্বন্ধে অবহিত হউন। হৃদয়ে ক্রোধ ও প্রতিশোধের বহ্নি প্রজ্বলিত করুন। ভারতীয় প্রজাতান্ত্রিক বাহিনীতে যোগদান করুন। দুঃখ দুর্দশার অতল গহ্বর হইতে জন্মভূমিকে উদ্ধার করিবার জন্য প্রাণপণ প্রচেষ্টা করুন।

অনুমত্যানুসারে
সপারিষদ সভাপতি
ভারতীয় প্রজাতান্ত্রিক বাহিনী

To

The Citizens of Chittagong,

The Indian Republican Army hereby directs and commands every man, woman and child of Chittagong to capture and produce dead or alive forthwith at the Head Qrs. of the Army all Englishmen and white-skinned Anglo-Indians who are hostile to our national aspirations. The Indian Republican Army announces that every body who will produce the demanded persons will be amply rewarded.

By order.
President-in-Council,
Indian Republican Army.

চট্টগ্রামের নাগরিকদের প্রতি—

ভারতীয় প্রজাতান্ত্রিক বাহিনী এতদ্দ্বারা চট্টগ্রামের প্রতিটি মানুষকে—স্ত্রীপুরুষ-বালক নির্বিশেষে—আদেশ ও নির্দেশ দিতেছে যে

সকল ইংরাজ ও সাদা চামড়ার এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানদের, যাহারা আমাদের জাতীয় আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিবন্ধক, তাহাদের বন্দী করিতে এবং জীবিত বা মৃত অবস্থায় আমাদের সদর দপ্তরে আনয়ন করিতে।

ভারতীয় প্রজাতান্ত্রিক বাহিনী ঘোষণা করিতেছে যে কেহ উল্লিখিত ব্যক্তিদেব হাজির করিতে পারিলে যথেষ্ট পুরস্কৃত হইবেন।

অনুমত্যানুসারে
সপারিষদ সভাপতি,
ভারতীয় প্রজাতান্ত্রিক বাহিনী

'যে শুনেছে কানে
তাহার আহ্বান গীত, ছুটেছে সে নির্ভীক প্রাণে
সংকট আবর্ত মাঝে, দিয়েছে সে বিশ্ব-বিসর্জন,
* * * মৃত্যুর গর্জন
শুনেছে সে সংগীতের মত।

আইন অমান্য আন্দোলন আরম্ভ হয়। মহাত্মাজীর আহ্বানে নিদ্রিত জনতা জাগে। আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা আন্দোলনে যোগ দেয়। দলে দলে লবণ আইন ভঙ্গ করে। ইংরাজও নিষ্ক্রিয় দর্শক হয়ে বসে থাকে না। নেতাদের কারারুদ্ধ করে, কংগ্রেস বে-আইনী প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়,—শাসনের নামে শুরু হয় সরকারী অত্যাচার···

গণেশ ঘোষের বাড়িতে বিপ্লবীদের গুপ্ত বৈঠক বসে। তিনি বলেন, আর দেরি করা চলে না, মাস্টারদা। এই সময় আমাদের পরিকল্পনা মত কাজ না করলে স্থানীয় কংগ্রেসের সঙ্গে জড়িত বলে আমরা যে কোন দিন বন্দী হতে পারি। তখন এত দিনের আশা-আকাঙ্ক্ষা-স্বপ্ন সব ব্যর্থ হবে।

মাস্টারদা শত বিপত্তিতেও বুদ্ধি হারান না। তিনি মৃদু হেসে বলেন; সেজন্য আমি এক উপায় ভেবেছি। এই সময় চুপচাপ বসে থাকলে পুলিশ স্বভাবতই সন্দেহ করবে আমাদের নিশ্চয় কোন গোপন উদ্দেশ্য আছে। তাদের বিভ্রান্ত করার জন্য বাইরে আমাদের ভান করতে হবে। আমরা আইন অমান্য করবো। এমন কি পুলিশকেও এ কথা খোলাখুলি জানিয়ে দেওয়া দরকার। কংগ্রেসের তরফ থেকে ইস্তাহার বিলি করা যাক যে আমরা একুশে এপ্রিলের পর সত্যাগ্রহ শুরু

করবো। এদিকে কিন্তু তার আগেই চট্টগ্রামকে স্বাধীন করতে হবে।

অনন্ত সিং বলেন, তাহলে আঠারোই এপ্রিল রাত সাড়ে নটায় আমাদের zero hour ঠিক করা যাক্।

মাস্টারদা বলেন, বেশ! ছেলেদের সব group করে দেওয়া হোক। আমাদের আক্রমণের লক্ষ্যস্থল হলো পুলিশ ব্যারাক ও অস্ত্রাগার, অক্সিলিয়ারি ফোর্সের অস্ত্রাগার, টেলিফোন-টেলিগ্রাফ অফিস, ইউরোপীয়ান ক্লাব, রেলওয়ে—

অনন্ত সিং বলেন, পাহাড়তলী ও পোর্টে দুটি ক্ষুদ্র অস্ত্রাগার আছে, কিন্তু অনেক কারণে সে দুটি দখল করার সংকল্প আমাদের ত্যাগ করতে হবে।

গণেশ ও অনন্তের তৈরি mobilisation list দেখে নির্মল সেন বলেন, ছেলে নির্বাচন করা হয়েছে খুব অল্প, এক এক দলে এক ডজনও হবে না।

অনন্ত বলেন, এ ছাড়া আর উপায় নেই। অল্প সময়ে অল্প লোকে আর অল্প অস্ত্রে আমাদের কাজ উদ্ধার করতে হবে।

গণেশ বলেন, এক একটা লক্ষ্য স্থলে জন পাঁচেক করে প্রথমে আক্রমণ করবে এবং জন পাঁচেক রিজার্ভ হিসাবে পিছনে থাকবে।

নির্ভীক অম্বিকা বলেন, সামান্য লোক হলেও অতর্কিত আক্রমণ করার জন্য আমরা সফল হবো।

গণেশ বলেন, এক একটা লক্ষ স্থলে জন পাঁচেক করে প্রথমে আক্রমণ করবে এবং জন পাঁচেক রিজার্ভ হিসাবে পিছনে থাকবে।

নির্ভীক অম্বিকা বলেন, সামান্য লোক হলেও অতর্কিতে আক্রমণ করার জন্য আমরা সফল হবো।

মাস্টারদা একটি লক্ষ্যস্থলের গুরুত্ব সম্বন্ধে সকলকে সচেতন করেন। সবচেয়ে বিপজ্জনক হচ্ছে পুলিশ-ব্যারাক, পাঁচজনে তিনশো জন লোককে হটাতে হবে।

দুঃসাহসী অনন্ত ও গণেশ বলেন, ওটার ভার আমাদের দিন, মাস্টারদা!

মাস্টারদা মৃদু হেসে বলেন, বেশ! তবে আমিও actionয়ে তোমাদের সঙ্গে থাকবো।

অম্বিকা বলেন, আমার দৃঢ় বিশ্বাস পুলিশ-ব্যারাক আমবা দখল করতে পারবো।

নির্মল বলেন, তাহলে ওটাকেই আমাদের হেড কোয়ার্টার্স করা যাক। Raid এর পর ওখানেই আমরা মিলিত হবো।

এ প্রস্তাব সকলেই সমর্থন করেন। তবে Raid-র পর কথাটি সকলেরই কানে বাজে।

Raidএর পর কে বাঁচবে আর কে মরবে কেউ জানে না। আঠারোই এপ্রিলই হয়তো তাদের জীবনের শেষ দিন।

সাধারণতঃ মানুষ তার মৃত্যুর দিন জানে না, তাই সে নিশ্চিন্তে হেসে খেলে কাল কাটায়। কিন্তু এখন হতে বিপ্লবীরা প্রতি মুহূর্তে অনুভব করবে আত্মীয়স্বজন বন্ধু-বান্ধব সকলের সঙ্গে সব সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে গেছে। প্রতি মুহূর্তে অনুভব করবে শেষ লগ্নের সান্নিধ্য··· অনির্বচনীয় অনুভূতি।

মনের কোণে কি বারে বারে ভেসে ওঠে সুন্দর পৃথিবী হতে বিদায়ের বেদনা?

মনকে যুক্তিবাদী অনন্ত সিং বৈরাগীর মত বোঝান যে মানুষের মৃত্যু তো যে কোন দিন যে কোন মুহূর্তে হতে পারে, তার জন্য এতো চিন্তা করার কি আছে? এতো তবু বিপ্লবীর চিরকাম্য মহান মৃত্যুর মুখোমুখী হওয়া। আদর্শের জন্য মৃত্যু বরণের সৌভাগ্য স্বল্পেরই হয়। এত তাড়াতাড়ি মরতে হবে? এর থেকে তাড়াতাড়ি হঠাৎ মারা যাওয়ার কত শত সম্ভাবনা রয়েছে,—বজ্রপাত, সর্পাঘাত।

জাতির মুক্তি সংগ্রামের ইতিহাস নিজ বক্ষ রক্তে রচনা করার জন্য বীর অনন্ত সিং অধীর হন।

কবি গণেশ ঘোষ কি ভাবেন? 'রক্তে আমার লেগেছে আজ সর্ব্বনাশের নেশা!' রক্তের অক্ষরে কবিতা লেখার কাল তাঁর আজ এগিয়ে এলো। জীবন-খাতার পাতা ভরিয়ে তুলবেন স্বরচিত ঘটনা কাহিনীতে। বৈপ্লবিক কাজের মাঝে একটু অবকাশ পেলে হয়তো তিনি খ্যাতনামা কবি হতে পারতেন। কিন্তু মন তার মেঘলোকে নিরালা স্বপ্নে মগ্ন থাকতে চায় না।

পিনাকপাণি প্রলয়ঙ্কর রুদ্রের ডম্বরুধ্বনি তিনি শুনতে পান··· শৃঙ্খলিতা লাঞ্ছিতা মাতার ক্রন্দন কানে বাজে···নিপীড়িত আর্তের আহ্বান নিয়ত ভেসে আসে—

যে শুনেছে কানে
তাহার আহ্বান গীত, ছুটেছে সে নির্ভীক প্রাণে
সংকট আবর্ত মাঝে, দিয়েছে সে বিশ্ব-বিসর্জন,
* * * মৃত্যুর গর্জন
শুনেছে সে সংগীতের মত।

মহাকবির কাব্য কবি গণেশ ঘোষের জীবনে সত্য হয়ে উঠে।

স্নেহ-মায়া-মোহ-বন্ধন বিমুক্ত চির-বিপ্লবী অম্বিকা চক্রবর্তী··· আঠারোই এপ্রিল তাঁর কাছে আনে সব-হারাবার আনন্দভরা মুক্তির বার্তা।

সন্ন্যাসিনী মাতার সন্তান সবত্যাগী নির্মল সেন···মৃত্যু তাঁর কাছে পরিধেয় পরিবর্তনের মতই হয়তো সামান্য ঘটনা। গীতার বাণী 'হতো বা প্রাপ্স্যসি স্বর্গং জিত্বা বা ভোক্ষ্যসে মহীম্' তাঁকে হয়তো প্রেরণা দেয়।

মাস্টারদার মনেও কি আঠারোই এপ্রিল দোলা দেয়? 'জীবন মৃত্যু পায়ের ভৃত্য, চিত্ত ভাবনাহীন'। অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষা নেওয়ার কালে কবে প্রথম যৌবনে পণ করেছিলেন 'জীবন-প্রদীপে বন্দিনী মার আরতি প্রদীপ জ্বালা'র। আজ এতদিন পরে এই জহর-ব্রত উদ্‌যাপনের আনন্দে তিনি কি উৎফুল্ল হয়ে উঠেন?

সূর্য সেন…জানি না কোন পাবক বাণীর পরশ মাণিক তাঁর প্রাণে লুকানো…তাঁর বহ্নিসুধার প্লাবন ধারা সকলকে ভরে তোলে…মরা দেশে তাঁর অগ্নিলীলার সঞ্জীবনী মরণকে ছাই করে…তাঁর দীপক রাগের উদ্দীপ্ত আহ্বানে অভিযাত্রীর দল এগিয়ে আসে গৃহ কোণ ছেড়ে…তাদের মশালের আলো রাত্রির তিমিরের বুকে তীর হানে…

শহরময় বিজ্ঞপ্তি বিতরিত হয়।—

চট্টলবাসীদের প্রতি—

ভারতের চতুর্দিকে মুক্তির ডঙ্কা বাজিয়া উঠিয়াছে, দিকে দিকে আইন অমান্য সংগ্রাম শুরু হইয়াছে। অত্যন্ত ক্ষোভ এবং লজ্জার বিষয় ১৯২১ সালে জাতীয় মুক্তি যুদ্ধে যে চট্টগ্রাম সর্বাপেক্ষা পুরোগামী ছিল সেই চট্টগ্রাম বর্তমান সংগ্রামে আজও পিছাইয়া রহিয়াছে, যদিও প্রায় এক মাস পূর্বে আইন অমান্য করিবার জন্য একটি সত্যাগ্রহ কমিটি গঠিত হইয়াছে।

এই কমিটি কি করে দেখিবার জন্য আমরা আরও কিছু দিন অপেক্ষা করিব।

কলিকাতা এবং অন্যান্য স্থানে লবণ আইন অমান্য ব্যতীত অন্যান্য আইন, যথা রাজদ্রোহকর আইন অমান্য আন্দোলন শুরু হইয়াছে। আমরা অনতিবিলম্বে চট্টগ্রামেও রাজদ্রোহকর আইন অমান্য সংগ্রাম আরম্ভ করিব স্থির করিয়াছি।

ইহার জন্য চট্টগ্রামের সকল শ্রেণীর জনসাধারণের সহানুভূতি আমাদের পক্ষে অপরিহার্য—আমরা সত্যাগ্রহী সৈনিক চাই। আমরা আশা করি জনসাধারণ আমাদিগকে অর্থ ও লোকবল দিয়া সাহায্য করিবেন।

যাঁহারা স্বেচ্ছাসৈনিক হইতে ইচ্ছুক তাঁহারা ২১শে এপ্রিলের পূর্বেই নিম্নস্বাক্ষরকারীদের কাহারও সহিত সাক্ষাৎ করুন।

নিবেদক

শ্রীসূর্যকুমার সেন

সম্পাদক, জেলা কংগ্রেস কমিটি

শ্রীঅম্বিকা চক্রবর্তী

সহ-সভাপতি, জেলা কংগ্রেস কমিটি

শ্রীগণেশ ঘোষ

সদস্য, কার্যকরী সমিতি, জেলা কংগ্রেস কমিটি

Rise like lions after slumber
In unvanquishable number—
Shake your chains to earth like dew
Which in sleep had fallen on you—
You are many—they are few.

—P. B. Shelly

১৮ই এপ্রিল ১৯৩০

বসন্তের শেষ···চৈত্রদিনের সূর্য সন্ধ্যাকাশকে রক্তে রাঙিয়ে অস্ত গেছে।

সামরিক পোশাকে সজ্জিত অনন্ত সিং গৃহত্যাগের পূর্বে কক্ষ কোণে বিলম্বিত বিপ্লবী ভগৎ সিংয়ের চিত্রের সামনে একটু দাঁড়ান···

চিত্রের তলায় দু পংক্তি কবিতা—

A soldier's life is a life for me,
A soldier's death and India is free !

তাঁর দিদি ইন্দুমতী কোন কাজে ঘরে আসেন। ভাইয়ের স্তব্ধ ধ্যান-গম্ভীর মূর্তির দিকে চান। জিজ্ঞাসা করেন, কি ব্যাপার? এই রাত্রে সাজ গোজ করে বেরুচ্ছিস?

মনের আনন্দে দিদিকে তিনি জানান, জানো দিদি, চট্টগ্রাম কাল স্বাধীন হবে।

তার মানে?

সগর্বে তিনি ঘোষণা করেন, কাল সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে সূর্য সেন হবেন স্বাধীন চট্টগ্রাম সাধারণতন্ত্রের সভাপতি, আর আমি হব স্বাধীন দেশের সেনাপতি।

সত্যি ?

মাকে যেন বলো না দিদি—মা ভয় পাবে, ভাববে···

সশস্ত্র অনন্ত সিং যখন বাড়ি থেকে বের হতে যাবেন, এমন সময় মা এসে পিছন থেকে ডাকেন,—অনন্তলাল কোথা যাচ্ছিস ?

অনন্ত সিং ঘুরে দাঁড়ান—একবার মার মুখের দিকে চান আর একবার অলক্ষ্যে কোমরে গোঁজা বিভলভারের উপর হাত দেন। বোঝেন লুকোচুরি চলবে না।

বল! আমার কাছে লুকোস্ নি।

যুদ্ধে যাচ্ছি, মা।

কথাটা নিজের কানেই কি রকম নাটকীয় শোনায়। তাই আর কিছু না বলে ধীরে ধীরে তিনি মার কাছে এগিয়ে আসেন। কিছু বলার জন্য মার ঠোঁট দুটি কাঁপে, স্পষ্ট কথা বের হয় না।

ধীর স্বরে অনন্তলাল বলেন, আশীর্বাদ করো যাতে জয়ী হয়ে ফিরে আসি।

মাকে প্রণাম করেন। মা তাকে বুকে টেনে নেন, তাঁর দু চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ে।

কেঁদো না, মা। তোমার মত শত শত মায়ের কান্না ঘোচাবার জন্যই তো আমাদের এই লড়াই। তুমি কেঁদো না। বাধা দিও না, মা।

কংগ্রেস অফিস, গণেশ ঘোষের বাড়ি ও লোকনাথ বলের বাড়ি হতে তিনটি দল মোটরে রওনা হবে টেলিফোন-টেলিগ্রাফ অফিস, ব্যারাক ও অক্সিলিয়ারি ফোর্সের আর্মারির উদ্দেশ্যে।

নরেশের নেতৃত্বে একদল যাবে ইউরোপীয়ান ক্লাবে। অনন্তর প্রিয় ও বিশেষভাবে শিক্ষিত টেগরা প্রভৃতি দুর্ধর্ষ প্রকৃতির ছেলেদের এই দলে পাঠান হয়।

ধুম লাঙ্গলকোটের নিকট রেলপথ ধ্বংস করার জন্য দুদল আগেই বেরিয়ে গেছে।

সরঞ্জামাদি সমস্ত গোপনে লক্ষ্যস্থলে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা হয়েছে। বড় বড় হাতুড়ি, ছেনি, গাঁইতি, কুড়াল, করাত, কাছি, লোহার রড, পেট্রোল টিন প্রভৃতি প্রয়োজনীয় সব কিছুই সঙ্গে থাকবে। এ ছাড়া প্রত্যেকের সঙ্গে থাকবে ওয়াটার বট্‌ল, টর্চ, বন্দুকের জন্য তেল ও পরিষ্কার করার শিক, ছোট ছেনি, ভোজালি, বোমা, কার্টিজ ও ব্যাণ্ডেজ।

ইতিমধ্যে অভাবিত এক বাধা উপস্থিত হয়েছে।

গণেশ কয়েকদিন হল অসুস্থ, বসন্তে আক্রান্ত। কিন্তু তার সনির্বন্ধ অনুরোধে আক্রমণের দিন স্থগিত রাখা হয় না। দৈহিক অসুস্থতা তিনি সম্পূর্ণ উপেক্ষা করেন।

গণেশের বাড়ি অনন্ত এসেছেন। গণেশ তখন পোশাক পরে কোমরে রিভলভার বাঁধছেন। টেবিলের উপর তাঁর তলোয়ার পড়ে। অনন্তর তলোয়ার বাঁধা হয়ে গেছে, বুকে ঝক্‌ঝকে ব্যাজ লাগাচ্ছেন— জরিমোড়া কালো ভেলভেটের মাঝখানে ত্রিবর্ণ পতাকার চিহ্ন।

ঘড়ির কাঁটা ঘুরে চলে। অনন্ত ব্যস্ত হয়ে উঠেন নির্দিষ্ট সময়ে ট্যাক্সি না আসায়।

বিরক্ত হয়ে বলেন, বড় দেরি করছে তো গাড়ি ডেকে আনতে। Zero hour এক ঘণ্টা পেছিয়ে দিতে হবে দেখছি।

গণেশ বলেন, আজ আবার মুসলিম কনফারেন্স আছে সন্ধ্যায়। সেইজন্য হয়তো গাড়ি পাচ্ছে না।

দরজায় পাহারারত মাখন অনন্তর অস্বস্তি টের পেয়ে একটু এগিয়ে দেখে গাড়ি আসছে কি না।

অনন্ত ঘড়ির দিকে চেয়ে বলেন, This is high time. Are you ready, Ganesh ?

Yes, ready for death, গণেশ হেসে বলেন।

এ কথায় অনন্ত তাঁর দিকে চেয়ে একটু হাসেন।

ইতিমধ্যে ঘরে স্বদেশ প্রবেশ করে। সে মাঝে মাঝে এদের কাছে আসতো, এরা তাকে দূরে সরিয়ে রাখার চেষ্টা করলেও। আজ বিধাতার নিগূঢ় পরিহাসে এই চরম ক্ষণে তার আকস্মিক আবির্ভাব হয়। প্রবেশ পথে কোন বাধা না পাওয়ায় সহজেই সে সটান ঘরের মধ্যে আসে।

এঁরা ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে তার দিকে চান। স্বদেশ ভীত ও বিব্রত হয়।

এ—যে—আমি ঢুকে অন্যায় করেছি—অত্যন্ত অন্যায় করেছি—এ আমি জানতাম না। আমি যাচ্ছি…

স্বদেশ বেরিয়ে যায়। অনন্ত গর্জে উঠেন, বেঁধে রাখা উচিত!

গণেশ লাফিয়ে দরজার কাছে যান। মুহূর্তের মধ্যে অনন্তের মস্তিষ্কে চিন্তার ঝড় বয়ে যায়। তিনি বলেন, যাক্, যেতে দাও।

হ্যাঁ, অনর্থক বেঁধে লাভ নেই। এখন গিয়ে যদি পুলিশে খবর দেয়, তাহলেও তারা আসার আগেই আমাদের কাজ হাঁসিল হবে।

হিমাংশু ট্যাক্সি ডেকে আনে। গাড়ি থেকে নেমে ড্রাইভারকে বলে, ভেতরে এসো।

ড্রাইভার একটু অবাক হয়ে বলে, ভেতরে কেন?

বাবুরা ঘণ্টা হিসাবে ঘুরবে, সেজন্য কথা বলতে চায়।

ড্রাইভার ভেতরে আসে। ঢোকা মাত্রই অনন্ত সিং রিভলবার দেখিয়ে বলেন, চুপচাপ মাথার উপর হাত তুলে দাঁড়াও!

সে ভয়ে বিস্ময়ে কাঠ হয়ে যায়। গণেশ ঘোষ বলেন, শোনো, তোমার গাড়িটা কয়েক ঘণ্টার জন্য আমাদের চাই। ফিরে এসে তোমাকে আমরা অনেক টাকা দেবো। কোন ভয় নেই তোমার।

অনন্ত সিং বলেন, তুমি যাতে কোন গণ্ডগোল না করো তাই তোমায় আমরা বেঁধে রাখবো। ফিরে এসেই বাঁধন খুলে দেবো। কোন চালাকির চেষ্টা করলে একেবারে শেষ করে দেবো। কোন কথা কোন দিনও প্রকাশ করবে না।

ভীত কম্পিত ড্রাইভারের হাত পা মুখ বেঁধে ছেলেরা ঘরে ফেলে রাখে।

পথের মাঝখানে গাড়ি হঠাৎ আটকিয়ে যায়। দুটি ছেলে নেমে গাড়ি ঠেলে। স্বদেশের বাড়ি একটু দূরে. দূর থেকে দেখে সে সেখানে এগিয়ে আসে। কোন কথা না বলে গাড়ি ঠেলা শুরু করে তাদের সংগে। গাড়ি স্টার্ট নেয়। স্বদেশ কেবল দৃষ্টি বিস্ফারিত করে একবার ভেতরের আরোহীদের দেখে। গাড়ি চলে যায়···সেই দিকে চেয়ে সে পথের উপরই দাঁড়িয়ে থাকে। তাকে বর্জন করার বেদনায় বুক ভাঙা এক দীর্ঘশ্বাস বাতাসে মিলিয়ে যায়।

প্রতিটি post মাস্টারদা পরিদর্শন করেন। অন্ধকারে নিঃশব্দে তাঁর গাড়ি এসে থামে। অন্ধকারের মধ্য হতে এক ছায়ামূর্তি এগিয়ে আসে···Group Leader।

সব প্রস্তুত?

হ্যাঁ।

Equipments সব ঠিক মত এসেছে?

সব ঠিক। Zero hour জন্য সবাই উৎকণ্ঠিত হয়ে আছে।

মনে আছে সময় এক ঘণ্টা পেছিয়ে গেছে—ঠিক সাড়ে দশটায়।

অন্ধকারে টর্চ জ্বেলে বিপ্লবী নেতারা ঘড়ি দেখেন। ঘড়ির সেকেণ্ডের কাঁটা টিক্ টিক্ করে ঘোরে। কান পাতলে বুকের ঢিপ-ঢিপানি কি শোনা যাবে? নিশ্বাস তো রুদ্ধ হয়ে গেছে। একটানা ঝিল্লীর ঝঙ্কার যেন রাত্রের সব স্তব্ধতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে। জোনাকির জ্বালা ম্লান আলোর মালার দিকে চেয়ে বিপ্লবীরা ভাবেন অন্ধকারকে বিদূরিত করবার এদের এই প্রয়াসের মতই কি তাদের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হবে। নির্বাক নক্ষত্ররাও নিরুত্তর থাকে।

ঘড়ির কাঁটা দশটা উনত্রিশের দাগ পেরিয়ে কাঁপতে কাঁপতে ত্রিশের দাগে আসে। অন্ধকারে আদেশ শ্রুত হয়—Get ready!

ছেলেদের পরণের ধুতি ও গায়ের চাদর খসে পড়ে—নিমেষের মধ্যে রূপান্তর হয় খাকি শর্টস্ ও শার্ট পরা সৈনিক—আক্রমণের আদেশ আসে…

নির্দিষ্ট সময় রেল-লাইনের উপর ঝুঁকে পড়ে কয়েকজন ফিস্-প্লেট সরায়। হাতুড়ির আওয়াজ হয় ঘটাং ঘটাং—রেল লাইন ফাক হয়ে যায়—রেল লাইনের ধাবের টেলিগ্রাফের তারও কর্তিত হয়।

বিপ্লবীরা কপালের ঘাম মুছে যন্ত্রপাতি নিয়ে পাশের জঙ্গলে অদৃশ্য হয়ে যান।

একটু পবে একটা মাল গাড়ি ঘড় ঘড় করে আসতে আসতে ভাঙা লাইনের ওখানে উল্টে যায়। ভালই হয়। ভাঙা লাইনের জন্য আর প্রাণহানিব ভয় নেই—রেলপথ বন্ধ।

অক্সিলিয়ারি ফোর্সের আর্মারি।

পাহাড়ী পথ বেয়ে হেড লাইট জ্বেলে তীব্র বেগে মোটর আসে।

দরজায় প্রহরী হাঁকে—হুকুমদার?

গাড়ি হতে জবাব আসে—ফ্রেণ্ড!

গাড়ি ভিতরে ঢুকে যায়।

অস্ত্রাগার ও মেজর ফেরলের বাংলোর মাঝ পথে গাড়ি থামে।

অস্ত্রাগারের বারান্দায় পদচারণাবত প্রহরীটি দাঁড়িয়ে পড়ে। দূরে খাটিয়ায় উপবিষ্ট চারিটি প্রহরীও একটু সজাগ হয়ে গাড়ির দিকে চায়।

গাড়ির সামনের আসন হতে ইউনিফর্ম পরা একটি ছেলে নামে।

পিছনের আসনের দরজা খুলে আর্দালির মত সেলাম করে সে দাঁড়ায়।

গাড়ি হতে অফিসারের বেশে লোকনাথ বল নামেন।

পাহারাদার সান্ত্রী তাকে বড় অফিসার মনে করে সেলাম করে।

তার অসাবধানতার সুযোগে লোকনাথের রিভলভার গর্জে উঠে তীব্র আর্তনাদ করে সান্ত্রী পড়ে যায়।

উপবিষ্ট পাহারাদারদের দিকে বিপ্লবীরা গুলি বর্ষণ করে। তারা প্রাণভয়ে দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে চীৎকার করে পলায়ন করে। পড়ে থাকে তাদের রাইফেল, পাগড়ি, জুতো ইত্যাদি। ছেলেরা দৌড়ে গিয়ে তাদের রাইফেল হস্তগত করে।

লোকনাথ বল হুকুম করেন, Take your positions.

চারদিকে চারজন ছেলে পাহারায় দাঁড়িয়ে যায়।

গণ্ডগোল ও গুলির শব্দে বাংলো হতে ডিনার ফেলে কাঁটা-ছুরি হাতেই বেরিয়ে আসেন মেজর ফেরল। চিৎকার করে প্রশ্ন করেন, What's the row ? হল্লা কেঁও ?

Fire !

বন্দুকের শব্দ হয়। মেজর ফেরল মুখ থুবড়ে পড়ে চীৎকার করেন, Darling ! Darling !

মেম সাহেব ভেতর থেকে ছুটে আসেন।

Ring up the police.

Charge !

আদেশ করার সাথে সাথে একটি ছেলে ছুটে এসে সাহেবের বুকে বেয়নেট বসিয়ে দেয়।

সেই বীভৎস দৃশ্যে মেম সাহেব পাথর হয়ে যান।

Madam ! Get inside ?

এক খানসামা ছুটে এসে মুহ্যমান মেমসাহেবকে ভেতরে টেনে নিয়ে যায়।

টেলিফোনের অফিসে কর্মনিরত অপারেটর কী-বোর্ডে নম্বর খুঁজছে। হঠাৎ পিছন হতে কে তার মাথার কাছে রিভলভারের নল এনে বজ্রগম্ভীর কণ্ঠে বলে, Hands up !

ঘাড় ঘুরিয়ে দেখে ঘন শ্মশ্রু শোভিত অম্বিকা চক্রবর্তীকে। ভয়ে তার মুখ দিয়ে কথা সরে না, মা—মা—মা মারবেন না…

অম্বিকা চক্রবর্তী তার চুল ধরে টেনে তুলে এক ধাক্কায় সরিয়ে দেয়—Get away!

চেয়ার উল্টে ফেলে টেবিল টপকে ডিগবাজি খেয়ে অপারেটর পালায়।

অম্বিকা চক্রবর্তীর ইঙ্গিতে একজন বড় হাতুড়ির এক ঘায়ে কী-বোর্ড চূর্ণ-বিচূর্ণ করে।

একজন তাতে পেট্রোল ছিটায়। অন্যজন আগুন দেয়।

দাউ দাউ করে আগুন জ্বলে উঠে।

পুলিশ ব্যারাক।

সান্ত্রীকে গুলি করার পর অনন্ত সিং, গণেশ ঘোষ, মাস্টারদা এবং তিনটি ছেলে রিভলভার হাতে সিঁড়ি ভেঙে উপরে উঠে ব্যারাকের দিকে দৌড়ান।

গুলি বর্ষণের সাথে তারা চীৎকার করেন, বন্দে মাতরম্! ইনক্লাব জিন্দাবাদ!

ব্যারাকে ভীষণ চাঞ্চল্য জাগে।

ভাগ যাও! ভাগ যাও! গান্ধীরাজ হো গিয়া।

সে চীৎকার শুনে সিপাইরা প্রাণভরে পালায়। সিঁড়ি দিয়ে হুড়মুড় করে তারা নামে…বারান্দা থেকে লাফ মারে…পড়ে যায়…লুটোপুটি খায়…জামাকাপড় ছেঁড়ে…জুতো পড়ে থাকে…নালায় পড়ে কেউ…ধাক্কাধাক্কি করে…কোন দিকে না চেয়ে মিনিট দুয়েকের মধ্যে ব্যারাক শূন্য করে দেয়।

বিপ্লবীরা তাদের কাণ্ড দেখে প্রাণ খুলে হাসেন।

বন্দে মাতরম্! ইনক্লাব জিন্দাবাদ! স্বাধীন ভারত কি জয়।

গগনভেদী উল্লাস ধ্বনি শোনা যায়। ছেলেরা ছুটে আসে গুপ্ত স্থান হতে।

গণেশ ঘোষ হাঁকেন, Fall in !

সার বেঁধে সবাই দাঁড়ায়।

অনন্ত সিং মাস্টারদাকে বলেন, অক্সিলিয়ারী ফোর্সের আর্মারির খবর আনা দরকার।

মাস্টারদার সম্মতি নিয়ে অনন্ত সিং বেরিয়ে পড়েন মোটরে।

অস্ত্রাগার।

লোহার দরজার সঙ্গে বিরাট কাছি দিয়ে মোটর বাঁধা হয়েছে।

লোকানাথ বল বলেন, তাড়াতাড়ি স্টার্ট দাও। এতে না হলে বারুদ দিয়ে দরজা ভাঙতে হবে। তাতেও না হলে ছাতে উঠে গাঁইতি দিয়ে গর্ত করে ভেতরে নামতে হবে।

ছেলেরা গাঁইতি, শাবল, ছেনি, হাতুড়ি ইত্যাদি নিয়ে প্রস্তুত হয়ে আছে।

গাড়ি গর্জন করে—ঝন্‌ঝন্ করে লোহার দরজা ভেঙে পড়ে।

ছেলেরা আনন্দে চীৎকার করে উঠে, বন্দে মাতরম্। স্বাধীন ভারত কি জয়!

ভেতরের গরাদ দেওয়া দরজার উপর বড় বড় স্লেজ হ্যামার নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েন নির্মল প্রভৃতিরা। সে দরজাও ভেঙে যায়। ছেলেরা ছুটে গিয়ে বন্দুক রিভলভার তুলে নেয়, গুলি-বারুদে হ্যাভারস্যাক ভরে।

ইনক্লাব জিন্দাবাদ!

এদিকে ম্যাজিস্ট্রেটের বাংলোয় এক পাহাবওয়ালা হন্তদন্ত হয়ে ছুটে আসে চেচাঁতে চেঁচাতে—সাহাব! সাহাব!

স্লিপিং স্যুট পরে ম্যাজিস্ট্রেট বের হয় বারান্দায়

স্বদেশী লোক তোপখানা দখল কর লিয়া।

What!

বহুৎ গুলি চল রহা। সিপাহী লোক সব ভাগ গিয়া।

ম্যাজিস্ট্রেট দৌড়ে ঘরে ঢুকে টেলিফোন রিসিভার তুলে নেয়। কোন সাড়া না পেয়ে উপর্য্যুপরি কল টেপে। শেষে অধৈর্য হয়ে ঘুষি মারে রিসিভার স্ট্যাণ্ডে। টেলিফোন ছুঁড়ে ফেলে দৌড়ে ঘর থেকে বের হয়।

গ্যারাজ হতে সোফার ম্যাজিস্ট্রেটের গাড়ি বের করে—পিছনের সীটে ম্যাজিস্ট্রেট।

অস্ত্রাগারের পথে তীব্র বেগে মোটর আসে। বিপ্লবীদের সান্ত্রী হাঁকে, Who comes there?

সাড়া পায় না। আবার হাঁকে, Halt!

গাড়ী থামে না। বন্দুক গর্জ্জায়। এবার গাড়ী থেমে যায়। বিপ্লবী সৈনিকেরা রাইফেল কভার করে এগোয়। টর্চ ফেলে দেখে ড্রাইভার নিহত হয়েছে। গাড়ীটা চিনতে পারে।

ম্যাজিস্ট্রেটের গাড়ী!

ম্যাজিস্ট্রেট কোথা?

পালিয়েছে।

খোঁজো! খোঁজো!

ছেলেরা চারিদিকে টর্চ ফেলে। হঠাৎ দূরে আবার একটা গাড়ির হেড লাইট দেখা যায়।

হুঁসিয়ার, আর একটা গাড়ী আসছে!

অস্ত্রাগারের বারান্দায় এরা রাইফেল তুলে টিপ করে দাঁড়ায়।

সান্ত্রী চীৎকার করে জিজ্ঞাসা করে, Who comes there?

গাড়ীর গতি কমে আসে। জবাব আসে, General Singh.

Pass-word?

Independence!

Pass !

অনন্ত সিংয়ের গাড়ী ভেতরে প্রবেশ করে। সান্ত্রী পা ঠুকে স্যালুট করে।

অনন্ত সিং গাড়ী হতে নামেন। লোকনাথ বল এগিয়ে আসেন।

দখল করেছি অস্ত্রাগার।

অনন্ত সিং করমর্দন করে বলেন, We have captured everything with no casualty.

স্বাধীন ভারত কি জয় !

ছেলেরা মোটর গাড়িগুলি রাইফেল, বন্দুক, লুইস গানে বোঝাই করে।

অবশিষ্ট অস্ত্রশস্ত্র গাদা করে অস্ত্রাগারের প্রাঙ্গণে।

বড় বড় হাতুড়ির ঘায়ে সেগুলি ভাঙ্গা হয়। পেট্রোল ছিটিয়ে আগুন দেওয়া হয়। দাউ দাউ করে আগুন জ্বলে।

বন্দে মাতরম্ ! ইনক্লাব জিন্দাবাদ !

চট্টগ্রাম শহর।

দূর হতে ভেসে আসে কোলাহল—বন্দুকের শব্দ। আগুনের আভা দেখা যায়।

নিদ্রিত নাগরিকরা কি শয্যা ছেড়ে উঠে বসে ? দুঃস্বপ্নে কারও সুপ্তির পর্যঙ্ক কি কাঁপে ? মহোল্লাসে মহাশঙ্খ কি নিশার বক্ষ বিদীর্ণ করে উদ্বোধনে গগন ভরে ? বিপ্লবের বন্দনা গান—প্রলয় ভেরীর আহ্বান কি শোনা যায় ?

স্বদেশের চোখ হতে তন্দ্রা ছুটে যায়—মনপ্রাণ ছুটে যায় এদের পাশে…

খোলা জানালার পাশে দৃষ্টি বিস্ফারিত করে কারা দাঁড়িয়ে ? বীর জননীরা ? ভগ্নীরা ?

গৃহ দেবতার মূর্তির সামনে করজোড়ে কে কি প্রার্থনা করছে? চোখের জল বাধা মানে না কেন?

ভয় নেই। সব বাধা চূর্ণ করে ওরা সব দখল করেছে। জয়ধ্বনি ভেসে আসছে…

ধূলো কাদা মাখা ম্যাজিস্ট্রেট এসে কোন এক সাহেবের বাড়ির দরজায় দুম্ দুম্ করে ঘুষি মারে। দরজা খুলে যায়। রাত্রিবাস পরিহিত এক সাহেব বেরিয়ে আসে।

ঘুমে ভারী গলায় প্রশ্ন করে—What's wrong?

ম্যাজিস্ট্রেট হাঁপাতে হাঁপাতে উচ্চারণ করে, Revolution! They have captured everything.

সদ্য ঘুম ভাঙা সাহেবটির মাথায় ব্যাপারটা ঠিক ঢোকে না। ভাঙা ভাঙা ভাবে সে আবৃত্তি করে, Re-vo-lu-tion!

অন্ধকারে ছায়ার মত মেম-সাহেবরা ঘর বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে আসে। কারও পরণে স্লিপিং স্যুট, কারও ড্রেসিং গাউন। অনেক মেমেরই পায়ে মোজা নেই, বহু সাহেবের পায়ে স্লিপার। কারও কোলে ঘুমন্ত শিশু, কেউ মেয়ের হাত ধরে।

হঠাৎ একজনের কোলের ছেলে কেঁদে উঠে। মেমটি তাড়াতাড়ি ছেলেকে বুকের মধ্যে চেপে ধরে। চাপা গলায় ধমক দেয়, Hush! Swadeshies come!

স্বদেশীদের নামে শিশুর বয়স্ক পিতা-মাতাও কি ভয় পেয়ে শীঘ্র শান্ত হবে? সেদিন কি সুদূর?

পুলিশ ব্যারাক—বর্তমানে বিপ্লবীদের হেড কোয়াটার্স।

আক্রমণকারী দলগুলি ফিরে এসে রিপোর্ট করেছে। ইউরোপীয়ান ক্লাবে সেদিন গুড্‌ফ্রাইডে বলে কারুকে পাওয়া যায়নি।

পুলিশ আর্মারির অস্ত্রশস্ত্র বোঝাই বড় বড় প্যাকিং বাক্সগুলি

খোলা হয়েছে। গণেশ ঘোষের তত্ত্বাবধানে সকলকেই অস্ত্র বিতরণ করা হচ্ছে।

সকলকে সার বেঁধে দাঁড় করিয়ে পুলিশের রাইফেল কী রকম ভাবে ছুঁড়তে হয় গণেশ দেখিয়ে দেন।

হঠাৎ বিপ্লবীদের সান্ত্রী দেখে অন্ধকারে কে যেন দৌড়ে আসছে পুলিশ ব্যারাকের দিকে।

সান্ত্রী হাঁকে—Halt!

না, না, আমি থামবো না। আমায় আসতে দাও।—সকাতর অনুরোধ।

কে তুমি?

আমি স্বদেশ—স্বদেশ রায়।

একটি ছেলে চীৎকার করে গণেশকে জানায়, গণেশদা, স্বদেশ এসেছে!

গণেশ ঘোষ একটু অবাক হন তার এই আবির্ভাবে।

ভেতরে আসতে চায়। আমাদের সঙ্গে থাকতে চায়।

আসতে দাও! আসতে দাও! গণেশ এগিয়ে যান। স্বদেশ ছুটে আসে। গণেশ তাকে বুকে টেনে নেন।

ঈষৎ অভিমানভরে সে বলে, আমাকে তোমরা নাওনি, কিন্তু আমি তোমাদের সঙ্গে থেকে লড়বো।

গণেশ ছেলেদের বলেন, একে অস্ত্র দাও!

ছেলেরা হুড়োহুড়ি করে স্বদেশর হাতে রাইফেল তুলে দেয়, পিস্তল গুঁজে দেয়, কার্টিজের মালা পরায়।

বিপ্লবীদের হাতে এক গোয়েন্দা ধরা পড়েছে। তাকে বন্দী করে রাখা হয় পরে বিচারের জন্য।

ক্যাপ্টেন টেট্ ইতিমধ্যে মোটর নিয়ে একবার পুলিশ ব্যারাকের কাছে এসেছিল।--বিপ্লবীদের সান্ত্রী তাকে চ্যালেঞ্জ করায় মোটর

থামিয়ে রাস্তার উপর নামে। সান্ত্রীকে বিদ্রূপ করে হল্ট। বাঙালী কুত্তা—হল্ট।

সান্ত্রী তাকে গুলি করে। কোন রকমে বেঁচে গিয়ে পথের পাশের নালার মধ্যে সে অদৃশ্য হয়।

পতাকা উত্তোলন দণ্ডের নিকট ছেলেরা সারিবদ্ধভাবে দাঁড়ায়।

খোলা তলোয়ার হাতে বিপ্লবী সেনাপতিরা সূর্য সেনকে অভ্যর্থনা করে আনেন। তিনি ত্রিবর্ণরঞ্জিত জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন। সকলে সামরিক কায়দায় পতাকাকে অভিবাদন জানায়।

মাস্টারদা নাতিদীর্ঘ এক বক্তৃতা দেন—কংগ্রেসের পূর্ণ স্বাধীনতার সংকল্পকে আমরা কার্যে পরিণত করেছি। এই শহরে বিদেশী শাসনের অবসান আজ আমরা করেছি। চট্টগ্রামে বিপ্লবী প্রাথমিক জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠিত হলো। বহুজনের বহুদিনের স্বপ্ন আজ সার্থক। স্বাধীন ভারতের প্রথম জাতীয় পতাকা তোলার গৌরব আজ আমাদের। এই পতাকার সম্মান রক্ষার জন্য আমরা প্রাণ পণ করলাম। বন্দে মাতরম্!

বন্দে মাতরম্! স্বাধীন ভারত কি জয়!

ওদিকে ম্যাজিস্ট্রেট, সুপারিনটেণ্ডেণ্ট, ডি আই. জি. টেট্. প্রভৃতি পরামর্শ করে।

Women and children must de saved.

They should be taken away from the town by steamer.

By the by, there are two machine guns in the port.

Wireless messages must be sent.

I think continually
The names of those who in their lives foughr fot life
Who wore at their hearts the fire centre
Born of the sun, ahey travellled a short while
towords the sun
And left the vivid air singed well their honour.

—**Spender.**

বিপ্লবীদের হেড কোয়ার্টার্সে বৈঠক বসেছে।

সভাপতি মাস্টারদা বলেন, কাল সকালেই আমরা শহরে যাবো। সেখানে যথারীতি স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র পড়া হবে।

সেনাপতি অনন্ত সিং বলেন, Indian Republican Army আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করবে।

নির্মল স্মরণ করিয়ে দেন, ইংরেজের সঙ্গে লড়াইয়ের জন্য আমাদের প্রস্তুত হতে হবে।

অনন্ত বলেন, লড়াইয়ে কিছুতেই আমাদের পরাজিত হওয়া চলবে না। আমরা মরবো তবু সরবো না।

নিশ্চয়! We must die fighting. বন্ধুকে সর্ব্বান্তঃকরণে সমর্থন করেন গণেশ ঘোষ।

কথার মাঝখানে কড় কড় করে মেসিন গানের গর্জন শোনা যায়। বাইরে ছেলেরা চীৎকার করে উঠে, মেসিনগান! মেসিনগান!

বিপ্লবী নেতারা বিদ্যুৎ বেগে ঘর হতে বেরিয়ে আসেন। গণেশ ঘোষ অর্ডার দেন, Lie down! Lie down!

ছেলেরা মাটিতে শুয়ে পড়ে। ধুলাবালির রাশি ওড়ে। অনন্ত চকিতে চারিদিক চেয়ে নিয়ে চীৎকার করেন, জল কলের উপর হতে আক্রমণ করছে।

একটু দূরে জল কলের উঁচু টিলার উপর মেসিনগান এনে বসিয়েছে সাহেবরা।

মেসিনগানের আওয়াজ ছাপিয়ে গণেশের গর্জন শোনা যায়—fire! Open fire!

গুলি চলে। এতক্ষণ বাদে বন্দুক ব্যবহারের সুযোগে ছেলেরা আনন্দিত হয়। যুদ্ধের উন্মাদনায় তারা মেতে উঠে। অন্ধকারের মধ্যেই দুপক্ষ গুলি বর্ষণ করে।

গুড়ুম গুড়ুম শব্দ—কড় কড় আওয়াজ, আগুনের ঝিলিক, বারুদের গন্ধ, ধোঁয়া ও ধুলোবালির ঝড়···বেশ খানিকক্ষণ চলে।

কিছুক্ষণ পরে অপর পক্ষের গুলি বন্ধ হয়।

ওদের গুলি বন্ধ হয়েছে!

মাস্টারদা বলেন, আমাদের গুলি নষ্ট করা উচিত নয়।

গণেশ ঘোষ হুকুম দেন, Cease fire!

গুলির শব্দে তাঁর আদেশ সকলে শুনতে পায় না।

গণেশ ঘোষের আদেশ শায়িত ছেলেদের কাছে একজন বহন করে নিয়ে যায়। এক একজনের কাছ গিয়ে সে বলে, থামো!

একটি একটি করে বন্দুকগুলি স্তব্ধ হয়। ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর প্রতিধ্বনি ধীরে ধীরে গভীর রাত্রের অন্ধকারে হারিয়ে যায়।

বিপ্লবীরা পরামর্শ করেন।

এ জায়গা নিরাপদ নয়। আমাদের চেয়ে উঁচু জায়গায় ওরা আছে।

একটু বাদেই চাঁদ উঠবে। তখন আমাদের পরিষ্কার দেখতে পাবে।

ওপর থেকে বোমা ফেলে আমাদের নিশ্চিহ্ন করতে পারে।

এখানে থাকা মানেই risk নেওয়া। লড়তে হলে ভাল cover দরকার। সকলেই সিদ্ধান্ত করেন স্থান ত্যাগের।

পুলিশ ব্যারাকের সামনে বাড়তি অস্ত্রশস্ত্র গাদা করা হয়। হিমাংশু সেন চারিদিকে পেট্রোল ছিটায়, নিজের রুমাল বের করে পেট্রোলে ভেজায়। তারপর দেশলাই জ্বালে, সঙ্গে সঙ্গে দপ্ করে তার সর্ব্বাঙ্গে আগুন লাগে।

তীব্র আর্তনাদ শুনে সদলে প্রস্থানোদ্যত অনন্ত সিং, গণেশ ঘোষ ফিরে চান। দেখেন বিরাট অগ্নিশিখার সামনে আর একটি সচল অগ্নিশিখা সরবে নৃত্য করছে।

এরা তাড়াতাড়ি ছুটে এসে হিমাংশুকে ল্যাং মেরে মাটিতে ফেলে দেন—চেপে ধরে মাটিতে গড়াগড়ি দেওয়ান।

তুমি কেন আগুন দিতে গেলে? তোমার সারা গা যে পেট্রোলে ভেজা।

পেট্রোল ছিটান, আগুন লাগান প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন ছেলের উপর কাজের ভার ছিল। নেতারা এ সব বিষয়ে খুবই সতর্ক ছিলেন। কিন্তু তাড়াতাড়িতে উৎসাহের অতিশয্যে হিমাংশু দুর্ঘটনাকে ডেকে আনে।

বেচারা নিদারুণ যন্ত্রণায় চীৎকার করে। পিছন থেকে সঙ্গীরা ডাকে পালিয়ে এসো সব। আগুনের আলোয় ওরা দেখতে পেয়ে গুলি করবে।

গণেশ অনন্ত পরস্পরের দিকে চান। মনে পড়ে যায় হয়তো তারকেশ্বর, অর্ধেন্দু, রামকৃষ্ণের দগ্ধ হওয়ার কথা। সেদিন তাদের বাঁচাবার চেষ্টা করা হয়েছিল বলেই আজ ,আক্রমণে তারা অংশ গ্রহণ করতে পেরেছে। ভবিষ্যতের মুখ চেয়ে একে গুলি করে মেরে ফেলা মোটেই উচিত হবে না। ' ভাল চিকিৎসা হলে বেঁচে উঠতে পারে।

ফেলে যাওয়া চলে না, বাড়িতে বাপ-মার কাছে পৌঁছে দিতে কোন বাধা নেই।

তাঁরা দুজনে হিমাংশুকে তুলে নেন।

মাস্টারদা অনুমতি দেন বাড়ি পৌঁছে দেবার। গণেশ, অনন্ত, মাখন ও আনন্দ মোটরে শহরে চলে যায়।

হিমাংশুকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে ওঁরা চারজন পুলিশ ব্যারাকে ফিরে আসেন। কিন্তু সেখানে তখন কারুকে দেখতে পান না।

অস্ত্রাগারের দিকে চলেন। পথে দূর হতে বিপ্লবী দল এঁদের গাড়ির আলো দেখতে পেয়ে ভাবে পুলিশ। তাঁরা তাড়াতাড়ি মাঠে নেমে শুয়ে পড়ে আত্মগোপন করে। গাড়ি বেরিয়ে যায়।

দগ্ধ অস্ত্রাগারেও এঁরা কারুকে পায় না।

চিন্তিত হয়ে অনন্ত বলেন, তাইতো! গেল কোথায় সব?

গণেশ ঘোষ বলেন, আমরা দলছাড়া হয়ে পড়লাম।

শহরের দিকে যাওয়া যাক্। সেখানেই তো আমাদের শেষ সংগ্রাম হবে।

বিপ্লবীরা মার্চ করে।

অম্বিকা মাস্টারদাকে বলেন, আমার মনে হয় পাহাড়ে যাওয়া ভাল। পাহাড়ে লুকোবার সুবিধা হবে।

হুকুম হয়—Double up! To the hills!

পার্বত্যপথের চড়াই ভেঙ্গে উঠেন বিপ্লবীরা—লতা ধরে, পরস্পরের হাত ধরে, কাঁধে পা দিয়ে, হামাগুড়ি দিয়ে। ভারী বন্দুকগুলিও হাতাহাতি করে টেনে তোলা হয়।

দূর পাহাড় চূড়ার আড়াল হতে সূর্য উঁকি দেয়।

ভোরে আবছা আলোয় শহরে রজতের বাড়ির দরজায় এসে অনন্তরা ঘা দেন। রজতের মা দরজা খোলেন।

তোমরা?

হ্যাঁ, আশ্রয় চাই।

ভেতরে এসো।

রজতের বাড়ির রান্নাঘরে এঁরা খেতে বসেন। রজেতের মা নিজে এঁদের পরিবেশন শুরু করেন।

অনন্ত তাঁকে আশ্বাস দেন, রজত মাস্টারদাদের সঙ্গে আছে! তার জন্য ভাববেন না।

গণেশ ঘোষের থালায় হাঁড়ি থেকে হাতায় করে ভাত দিতে গিয়ে মা বলেন, গণেশ, তুমি জ্বরের উপর ভাত খাবে?

গণেশ ঈষৎ হেসে বলেন, ও কিছু নয়, জ্বর গায়েই তো সব চলছে। আপনি দিন।

মাখন বলে, কাল থেকে কারুর খাওয়া হয়নি। ও ভাত এখন অমৃত!

সাগ্রহে এঁরা ভাতের গ্রাস মুখে তুলতে যাবেন, এমন সময় রজতের ছোট ভাই এসে বলে, পুলিশ বাড়ি ঘিরছে!

হাত থেকে ভাতের গ্রাস পড়ে যায়। অনন্ত সিং লাফিয়ে উঠে দাঁড়ান। পাতের ভাতের দিকে একবার সতৃষ্ণ নয়নে চাইবারও বোধ হয় সময় নেই।

ঘরের মাচার উপর বিপ্লবী চারজন আশ্রয় নেন। রজতের বাবার-পিঠের উপর বেয়নেটের ডগা বসিয়ে সশস্ত্র পুলিশ ঘরে আসে।

তিনি বলেন, আমি তো বলছি এখানে কেউ আসে নি। বিশ্বাস না হয় খুঁজে দেখো।

পুলিশ চারিদিক খোঁজে। হঠাৎ দেখা যায় তাড়াতাড়িতে মাচায় উঠার সময় টেবিলের উপর রাখা রুমালে বাঁধা রিভলভারের গুলিগুলো লুকানো হয় নি।

মাচার উপর থেকে বিপ্লবীদের নজরে সেটা আসায় মুখ শুকোয়—উত্তেজনায় শঙ্কায় তাঁদের নিশ্বাস রুদ্ধ হয়ে আসে। অনন্ত সিং অতি সন্তর্পনে সঙ্গের রিভলভার লোড করেন, সহজে তিনি কিছুতেই ধরা দেবেন না।

কিন্তু পুলিশ সেটা লক্ষ্য করে না। তারা মানুষ খুঁজে বেড়ায় এক ঘর থেকে অন্য ঘরে। শেষে ব্যর্থ হয়ে ফিরে যায়।

১৯শে এপ্রিল বিপ্লবীদের নাগারখানা পাহাড়েই কাটে।

পূর্ব সংগ্রামের স্মৃতি বিজড়িত এই পর্বত!...

১৯২২ সালের ২রা ডিসেম্বর। পাহাড়তলীর রেলওয়ে ওয়ার্কশপে পেমেণ্ট ডে। ছুটি বছর ধরে অনন্ত সিং এই টাকা লেনদেনের খবরাখবর সংগ্রহ করেছিলেন। সেই সময় শহর থেকে ছ' মাইল দূরে 'মুলুক-বাহার হাউস' ছিল বিপ্লবীদের গুপ্ত ঘাঁটি। এখানে ছিল তাঁদের অস্ত্রাগার ও রসদখানা। অস্ত্রাগারটিতে অল্প স্বল্প সব জিনিষই মজুত ছিল,—ফিল্ড রাইফেল, বি. এল. গান, মশার পিস্তল, পিস্তল, রিভলভার, গোলাগুলি, বোমা, রাসায়নিক পদার্থ ও আরও অনেক কিছু।

১লা ডিসেম্বর এই গুপ্ত ঘাঁটিতে সূর্য সেন, নগেন সেন, নির্মল সেন, অম্বিকা চক্রবর্তী, অনন্ত সিং, দেবেন দে ও রাজেন দাস এই সাত জন বিপ্লবী মিলিত হয়ে সিদ্ধান্ত করেছিলেন যে ওই সরকারী অর্থ অপহরণ করতে হবে।

এই কর্ম সমাধানের প্ল্যানিং করেছিলেন অনন্ত সিং। তাঁর পরিকল্পনা অনুযায়ী পাঁচজন যাবেন অপারেশনে ও ছুজন—মাস্টারদা ও অম্বিকাদা—থাকবেন হেড কোয়ার্টার্সে। লুণ্ঠিত অর্থ শেষোক্ত ছুজনের হাতে এনে দিলে তারা সেই অর্থ কলকাতায় বিপ্লবীদলের নেতাদের নিকট গোপনে পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা করবেন।

লুণ্ঠনের দায়িত্ব যে পাঁচজন নেবেন, তাঁরা দুটি দলে ভাগ হয়ে যাত্রা করবেন। এই দুটি দলে দুজন করে থাকবেন।

অনন্ত সিং ও দেবেন দে একদলে থাকবেন। নগেন সেন ও রাজেন দাস অন্য দলে। নির্মল সেন একা ঘটনাস্থলে নির্দিষ্ট সময়ে উপস্থিত হবেন। অনন্ত সিং চলন্ত গাড়ির সামনে লাফিয়ে পড়ে রিভলভার উঁচিয়ে গাড়োয়ানকে ভয় দেখিয়ে গাড়ি থামাবেন। দেবেন দে সেই সময় রিভলভার দেখিয়ে গাড়ির আরোহীদের নেমে আসতে বাধ্য করবেন। অর্থাৎ প্রথম দলের একজন গাড়ির ও অন্যজন আরোহীদের দায়িত্ব নেবেন।

দ্বিতীয় দলটি রিজার্ভ ফোর্স হিসাবে কার্স করবে। অর্থাৎ দ্বিতীয় দলটি এক গুরুত্বপূর্ণ স্থানে—পাহাড়ের কোল ঘেঁষে রাস্তা যেখানে মোড় ঘুরেছে সেখানে—আত্মগোপন করে থাকবে। উপযুক্ত মুহূর্তে তাঁরা প্রথম দলের সাহায্যের জন্য ছুটে আসবেন উদ্যত রিভলভার হাতে।

সমস্ত ব্যাপারটার উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখার জন্য নির্মলদা একটা মাঝামাঝি জায়গায় থাকবেন। সরকারী ঘোড়ার গাড়ির গাড়োয়ান ও প্রহরীদের হত্যার ভয় দেখিয়ে গাড়ি হতে নামিয়ে টাকা সমেত ওই গাড়িটা নিয়েই পালাতে হবে। তারপর কোন এক নির্জন স্থানে গাড়িটা পরিত্যাগ করে নিরীহ পথচারী সেজে গোপন আস্তানায় ফিরে যেতে হবে। সাফল্যের সঙ্গে এই কর্ম করার জন্য বিপ্লবীদের একজনকে ঘোড়ার গাড়ি চালাবার কৌশল আয়ত্ত করতে হবে।

এই প্ল্যানের অঙ্গ হিসাবে দেবেন দে মুসলমান গাড়োয়ানের ছদ্ম-বেশে এক ঘোড়ার গাড়ি ভাড়া করে বিকেল তিনটে থেকে রাত দশটা পর্যন্ত শহরের বিভিন্ন নির্জন পথে গাড়ি চালাবার মহড়া দিয়ে নিলেন।

অনন্ত সিংয়ের নিখুঁত পরিকল্পনা অনুযায়ী ২ রা ডিসেম্বর সকাল সাড়ে দশটার সময় প্রকাশ্য দিবালোকে এ. বি. রেলওয়ের জেনারেল

অফিসের খুব কাছেই সরকারী টাকা বোঝাই গাড়িটিকে থামাবার চেষ্টা করা হয়। গাড়ির গাড়োয়ান উদ্যত রিভলভার দেখে ভয়ে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হওয়ার পরিবর্তে যে আচরণ করে তা বিপ্লবীরা আশা করেননি। সে ঘোড়ার পিঠে সজোরে চাবুক মেরে গাড়ি নিয়ে পালিয়ে যাবার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু অসীম সাহসী অনন্ত সিং এত সহজেই তাকে ছেড়ে দেবার পাত্র নন। তিনি চকিতে লাফিয়ে উঠে ঘোড়ার রাশ টেনে ধরেন। এইভাবে গাড়ি থামানোর পরের ব্যাপারটি অবশ্য নির্বিঘ্নেই হয়। নগদ প্রায় সতের হাজার টাকা নিয়ে বিপ্লবীরা তাঁদের হেড-কোয়ার্টার্সে ফিরে এসেছিলেন। অম্বিকাদা সেই টাকা নিয়ে গোপনে কলকাতার বিপ্লবীদের কাছে পৌঁছে দিয়ে দিন দশেক বাদে চট্টগ্রামে ফিরে এসেছিলেন।

তারপর বিপ্লবীরা স্থির করেন এই আস্তানা হতে পাত্তাড়ি গুটিয়ে ফেলা উচিত। কারণ 'মুলুক-বাহার হাউস' খুব নিরাপদ বলে তাঁদের মনে হয় না। চারপাশে মুসলমান বসতির মধ্যে সাতজন হিন্দু যুবকের বাস প্রতিবেশীদের মনে স্বভাবতঃ সন্দেহ উদ্রেক করবে।

স্থানত্যাগের জন্য একদিন সকালে যখন তাঁরা বন্দুক-রাইফেলগুলি খুলে প্যাক করছিলেন এমন সময় বাড়ির সামনে হঠাৎ ঘোড়ার গাড়ির ঘণ্টার আওয়াজ শোনা গেল। বিপ্লবীরা দেখলেন কুখ্যাত পুলিশ সাব-ইনসপেক্টার আব্দুল মজিদ তাঁদের বাড়ির দ্বারে উপস্থিত হয়েছেন। সেই সময় বাড়িতে তাঁরা ছ-জনে ছিলেন, নির্মল সেন ছিলেন অন্যত্র। তাঁদের মধ্যে অনন্ত সিংকে পুলিশ অফিসার ভাল করেই চিনতেন। তাই তিনি লুকিয়ে পড়েন, বাকী কজন নিরীহ ভালমানুষ সেজে দোর গোড়ায় গিয়ে অফিসারের সঙ্গে কথা বলেন। আব্দুল মজিদও অত্যন্ত চালাক লোক, এঁদের প্রতি তাঁর কোন সন্দেহ জাগেনি হাবভাবে সেটাই প্রকাশ করলেন। অনুসন্ধান করে যেন সন্তুষ্ট হয়ে চলে যাচ্ছেন এমনি ভান করেন। কিন্তু গোপনে গ্রাম-বাসীদের পুরস্কারের লোভ দেখিয়ে বাড়িটির উপর নজর রাখতে বলে

সশস্ত্র পুলিশ আনার জন্য তিনি থানায় যান। গ্রামবাসীরা লোকজন জড় করে ধীরে ধীরে বাড়িটাকে ঘিরে ফেলে।

তখন আশ্রয়স্থিত ছ-জন বিপ্লবী—সূর্য সেন, নগেন সেন, অম্বিকা চক্রবর্তী, অনন্ত সিং, দেবেন দে ও রাজেন দাস—অবস্থা গুরুতর বুঝে গ্রামবাসীদের বেষ্টনী ভেদ করে পালাবার সিদ্ধান্ত করেন। ফাঁকা গুলিবর্ষণ করতে করতে তাঁরা আশ্রয় ত্যাগ করেন। গ্রামবাসীরা তাঁদের অনুসরণ করে—ইঁটপাটকেল লাঠি সড়কি নিয়ে আক্রমণ করে। এরা তাদের নিবৃত্ত হবার জন্য অনেক অনুরোধ করেন, অর্থদান করেন, শেষে বাধ্য হয়ে অনন্ত সিং বোমা ফাটিয়ে পথ পরিষ্কার করে নেন।

সারাদিন ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়ে শ্রান্ত ক্লান্ত দেহে তাঁরা এই পাহাড়ের কোলে এসে পৌছান। অনুসরণকারীদের হাত হতে তবু তাঁরা রেহাই পান না। পাহাড়ে উঠার পূর্বে বন্দুকধারী একজনের সঙ্গে অনন্ত সিংয়ের সংঘর্ষ হয়। গুলি করার ঠিক পূর্ব মুহূর্তে অনন্ত সিং তার উপর সিংহের মত ঝাঁপিয়ে পড়েন। বন্দুক কেড়ে নেবার কালে গুলিতে অনন্ত সিংয়ের সঙ্গী দেবেন দে সামান্য আহত হন। হাঁটুতে আঘাত লাগার ফলে তিনি চলৎ শক্তি হীন হন। আহত বন্ধুকে কাঁধে তুলে অবসন্ন অনন্ত কায়ক্লেশে পাহাড়ে উঠেন—ইষ্টদেবতার মত বিপ্লবী জ্যোতিন মুখার্জি ও নেপোলিয়নের নাম স্মরণ করেন—There shall be no Alps হয় তাঁব বীজমন্ত্র…

পাহাড়ের উপর পুলিশের সঙ্গে লড়াই হয়। মাস্টাবদা, অম্বিকা চক্রবর্তী ও রাজেন দাস আহত হয়ে পুলিশের হাতে ধরা পড়া অপেক্ষা বিষ পান শ্রেয় মনে করেন। তাঁরা পটাসিয়াম সায়ানাইড খান। অন্য তিন জন রাত্রের অন্ধকারে পুলিশ ব্যূহ ভেদ করে পালান—সারা রাত্রি দৌড়ে সকালে সমুদ্রের ধারে পৌছান। সেখানে এক বৃদ্ধ সহৃদয় কৃষকের কুটিরে তিন দিন তিন রাত্রি লুকিয়ে থাকেন। তারপর তার সাহায্যে জেলে নৌকায় সমুদ্রে পাড়ি জমান—সন্দ্বীপে পৌছান। সেখান থেকে শেষে লুকিয়ে কলকাতায় আসেন।

বিষপানে অচেতন অম্বিকা ও মাস্টারদাকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে। অন্যজনকে তারা ধরতে পারে না। বন্দী দুজনকে পিছমোড়া করে বেঁধে মারতে মারতে শহরে নিয়ে আসে—মশাল জ্বালিয়ে দণ্ডিতকে মশানে নিয়ে যাবার মতই পৈশাচিক উল্লাসে মত্ত হয়ে পুলিশ এঁদের ধরে আনে—সে এক মধ্যযুগীয় বর্বরতা।

সেই সব পুরানো কথা এই পাহাড়ে এসে মনে পড়ে যায়। সেদিনের মরণোন্মুখ বিপ্লবীরা আজও বেঁচে। মাস্টারদা মনে মনে স্থির করেন বিপ্লবীদের আত্মহত্যা করার রীতি তিনি বন্ধ করবেন। সেদিন ভাগ্যক্রমে বিষ কার্যকরী হয়নি তাইতো তাঁরা বেঁচে গেছেন এবং বেঁচে গেছেন বলেই বর্তমানে এই বিপ্লবের আগুন জ্বালা সম্ভব হলো। তাছাড়া আত্মঘাতী বিপ্লবীরা শত বীরত্ব সত্বেও সম্পূর্ণরূপে শহীদের সম্মান পান না। স্বহস্তে মরার চেয়ে শত্রুর হাতে মরাই শ্রেয়। প্রফুল্ল চাকী প্রথম শহীদ হলেও ক্ষুদিরামের নাম দেশবাসীর মনে অনেক বেশী অনুপ্রেরণা দেয়।

দিনের শেষে বনে বনে ছায়া ঘনায়।

সারা দিন অনাহারের সকলেই অবসন্ন। আগের দিন সেই কোন সকালে সামান্য আহার করেছিল। তারপর দ্বিপ্রহর হতে চলেছিল প্রস্তুতির পালা। রাত্রে আক্রমণের পর সাফল্যের নিশ্চয়তায় আহারের আয়োজন করা হয়েছিল এক হোটেলে। কিন্তু ঘটনার গতি ভিন্ন পথে চলে—আক্রমণের সময় পেছিয়ে যাওয়ায় এবং তারপর বিজয়োৎসব ও প্রতি আক্রমণের জন্য আহারের অবকাশ আর পাওয়া যায় নি। মাস্টারদা সংকল্প করেন ভবিষ্যতে সুযোগ হলে হোটেলওয়ালাকে প্রস্তুত আহার্য অপচয়ের জন্য দামটা দিয়ে দেওয়ার। অনেক গুরুত্বপূর্ণ চিন্তার মাঝে এই সামান্য কথাও মাস্টারদার মনে আসে।

কিশোর টেগরা এসে মাস্টারদার অনুমতি চায়, লুকিয়ে নিচে গিয়ে কিছু খাবার আর জলের খোঁজ করার।

মাস্টারদা কাজের গুরুত্ব সম্বন্ধে তাকে সচেতন করে দেন, খুব সাবধানে যেতে হবে, নইলে ধরা পড়লে সকলে মরবে। বুঝেছিস?

নির্ভীক টেগরা হেসে বলে, বুঝেছি।

আচ্ছা! শোন—টাকা নিয়ে যা। বিস্কুট-পাঁউরুটি যা পাস কিনে আনবি। সঙ্গে আরও কয়েকজনকে নিয়ে যা। বন্দুকগুলো রাখিস, বিপদ বুঝলে ব্যবহার করবি। কেউ সন্দেহ করলে পরিচয় দিবি আর্মড্ পুলিস।

মধ্য রাত্রে নিরাপদে সদলে টেগ্‌রা ফিরে আসে—বিস্কুট ও আর্ম নিয়ে আসে। তাই দিয়েই বিপ্লবীরা অনশন ভঙ্গ করেন।

২০শে তারিখে মাস্টারদা অনন্ত সিংদের খোঁজে অমরেন্দ্র নন্দী ও আর একজনকে শহরে পাঠান।

অনন্তরা শহরেই আত্মগোপন করে থাকেন। শহরে বিপ্লবীদের জন্য পুলিশ চারিদিকে তন্ন তন্ন করে তল্লাস চালায়। তাছাড়া সারা বাংলা জুড়ে স্বদেশীভাবাপন্ন ব্যক্তিদের গ্রেপ্তার করা হয়। Wireless-এ চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের সংবাদ বাইরে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। অভ্যুত্থানের পিছনে বৈদেশিক শক্তির সাহায্য আছে বলে অনেকেই সন্দেহ করে। রেঙ্গুন থেকে যুদ্ধ জাহাজ ছুটে আসছে। সিভিলিয়ান সাহেবেরা ও মেমেরা পুত্রকন্যাসহ রাত্রে শহর ত্যাগ করে স্টীমারে থাকে।

আনন্দ গুপ্তর বাড়িতে এদের লুকিয়ে থাকার সময় কয়েকবার পুলিশ হানা দেয়। গোয়েন্দারা জানত দেবু গুপ্ত ও আনন্দ গুপ্ত দুই ভাই বিপ্লবীদলের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। কিন্তু প্রতিবারই এঁরা পুলিশকে ফাঁকি দেন। পুলিশ আসার আগেই বাড়ির ছোট ছেলেরা দূর থেকে

দেখে সংবাদ দিত এবং এঁরাও বাড়ির নিকটবর্তী জঙ্গলে অন্তর্হিত হতেন।

বালক আনন্দ গুপ্তকে লুকিয়ে রাখার জন্য তাঁর মা স্নেহে অন্ধ হয়ে বালক সুলভ অদ্ভুত ও অসম্ভব উপায় উদ্ভাবন করতেন। বলতেন পুলিশ খুঁজতে এলে ওকে আমার বুকের তলায় বিছানায় লেপ ঢাকা দিয়ে লুকিয়ে রাখবো। পুলিশকে বলা হবে আমি অসুস্থ। কিন্তু অঞ্চলতলে আনন্দ গুপ্তকে ধরে রাখা যায় না। মাকে ছেড়ে ঘর ছেড়ে তাকে যেতে হয়।

বিপ্লবী সন্তানের মাতা—তাঁর বেদনা ব্যথা কে বুঝবে? ছেলে নিশ্চিন্ত মৃত্যুর মুখে ছুটে চলে যায়, আর তাঁদের নিঃশব্দে চোখের জল মুছে আশীর্বাদ জানাতে হয়। লোকনাথ-টেগরার বিধবা মা, অনন্ত সিংয়ের মা, আরও কত বীর জননী—তাঁদের কে সান্ত্বনা দেবে? কোন আশ্বাস কি কোথাও আছে?

বীরের এ রক্ত স্রোত, মাতার এ অশ্রুধারা,
এর যত মূল্য সে কি ধরার ধুলায় হবে হারা?
স্বর্গ কি হবে না কেনা?

এঁদের সন্ধান না পেয়ে অমরেন্দ্র নন্দী ফিরে যান। কিন্তু তাঁর সঙ্গী আর ফেরেন না। তিনি ছিলেন বি. এ. পরীক্ষার্থী, শহরে তাঁর সতীর্থদের সঙ্গে সাক্ষাৎ হওয়ায় তিনি পরীক্ষার জন্য থেকে যান। সঙ্গীদের স্বচ্ছন্দে ত্যাগ করে যথারীতি পরীক্ষা দিয়ে সাধারণ জীবন-যাত্রা শুরু হয় তাঁর।

মানুষের চরিত্র কি দুর্জ্ঞেয়!—জীবনের গতি কি বিচিত্র!…

স্বদেশ—যাকে এঁরা বাদ দিয়েছিলেন, কে জানে কার ডাকে সে সব ছেড়ে ছুটে এল। আর যাকে এঁরা সঙ্গে নিয়েছিলেন, গুরুদায়িত্ব দিয়েছিলেন, কে জানে কোন টানে সে সংসার স্রোতে ভেসে গেল।

২১শে এপ্রিল বিপ্লবীরা আর একটি পাহাড়ে আশ্রয় নেন।

মাস্টারদা অমরেন্দ্রকে আবার শহরে পাঠান যদি কোন সংবাদ সে আনতে পারে। গত কাল অনন্ত সিংয়ের খবর আনতে না পারলেও সে একটি খবরের কাগজ কিনে এনেছিল। তাতে বিনা প্রাণহানিতে নির্বিঘ্নে রেলপথ ধ্বংসের সংবাদ পাওয়ায় বিপ্লবীরা সবাই এত আনন্দিত হন যে সারাদিন অনশনের কষ্ট কিছুটা উপশম হয়।

সকলকে আজ ক্ষুধায় অত্যন্ত কাতর দেখে অম্বিকা চক্রবর্তী আহার্যের অনুসন্ধানে বের হন। এদিককার পাহাড়ী পথঘাট তাঁর পরিচিত।

ধান ক্ষেতের আলের উপর দিয়ে এক পুকুরের পাড় দিয়ে অনন্তরা চলেছেন।

দু'দিন কেটে গেল। তবু এদের খোঁজ পেলাম না।

বোধ হয় কোন পাহাড়ে আছে।

হঠাৎ দূরে রাস্তার উপর দেখা যায় একদল সৈন্য বন্দুক কাঁধে মার্চ করে আসছে। এঁরা তাড়াতাড়ি মাঠে নেমে আলের আড়ালে শুয়ে আত্মগোপন করেন। এঁদের খুব কাছ দিয়ে সৈন্যরা চলে যায়। তাদের পদভরে মাটির কম্পন এঁরা বক্ষতলে অনুভব করেন।

শহর মিলিটারি পুলিশে ভরে উঠেছে ক্রমে ক্রমে। এঁরা বোঝেন এ স্থান আর নিরাপদ নয়। গেঁয়ো চাষী সেজে এঁরা শহর ত্যাগের সংকল্প করেন।

ওদিকে এঁদের সন্ধানে অমরেন্দ্র এসে অর্ধেন্দু গুহের বাড়ি খোঁজ করে। আক্রমণের দিন অর্ধেন্দুর উপর ভার ছিল সারা শহরময় বিজ্ঞপ্তি বিতরণের।

অনন্তদাদের কোন খবর জানো? মাস্টারদা জানতে চেয়েছেন।

না, কিন্তু তুমি পালিয়ে যাও, অমরেন্দ্র। শহর মিলিটারি পুলিশে

ভরে গেছে। যাকে সন্দেহ হচ্ছে তাকেই তারা ধরে নিয়ে যাচ্ছে। অনন্তদার বাবা ও দাদাকে ধরেছে, রজতের বাবাকেও—আরও অনেককে। চারিদিকে অত্যাচার চালিয়েছে।

থানায় এক গোয়েন্দা এসে বলে, শিগগির আসুন! অমরেন্দ্র নন্দী শহরে এসেছে।

থানার ইন্সপেক্টর প্রভৃতি লাফিয়ে বেরিয়ে পড়ে অস্ত্র-শস্ত্র নিয়ে।

এক কালভার্টের তলায় অমরেন্দ্র আশ্রয় নেয়। রিভলভার বের করে গুঁড়ি মেরে বসে। পুলিশেরা রাইফেল নিয়ে এগিয়ে আসে।

ইন্সপেক্টর চেঁচায়—ধরা দাও!

প্রাণ থাকতে নয়, বলে অমরেন্দ্র গুলি করে। একজন পুলিশ আহত হয়।

ইন্সপেক্টর হুকুম দেয়—Fire!

এক সঙ্গে অনেকগুলি রাইফেল গর্জে উঠে। অমরেন্দ্র সাংঘাতিক ভাবে আহত হয়, পড়ে যায়। তবু কোন রকমে এক হাতের উপর ভর দিয়ে অর্ধশায়িত ভাবে কম্পিত হস্তে আর একটি গুলি করে।

ওদিক হতে আর এক ঝাঁক গুলি আসে। অমরেন্দ্র লুটিয়ে পড়ে মাটিতে। নালার মধ্যে পুলিশের দল লাফিয়ে নামে—গুঁড়ি মেরে কাছে এসে দেখে। একজন বলে, মর গিয়া!

ইন্সপেক্টর আক্ষেপ করে, তবু ধরা দিল না।

অমরেন্দ্র নন্দী…চট্টগ্রামে পুলিশের প্রথম বলি।

ওদিকে পাহাড়ে সকলে অমরেন্দ্রর জন্য উৎকণ্ঠিত হয়ে অপেক্ষা করেন। দিন শেষে রাত্রি আসে, কিন্তু সে আর আসে না। সে কি ফেরার পথ খুঁজে পেল না? সকলেই চিন্তিত হন।

অম্বিকা নিকটবর্তী এক গ্রাম থেকে রাত্রের অন্ধকারে এঁদের জন্য খিচুড়ি রাঁধিয়ে আনার ব্যবস্থা করতে সক্ষম হয়েছেন। অম্বিকাকে

এখন আর সহজে কেউ চিনতে পারবে না, দাড়ি গোঁফ কামিয়ে তিনি অন্য লোক হয়ে গেছেন।

ইতিমধ্যে আরও দুটি ছোট ঘটনা ঘটেছে। এক চাষা হঠাৎ এঁদের সমস্ত দলটি দেখতে পায়, তাকে নিরাপত্তার জন্য বন্দী করে রাখা হয়। তাছাড়া দলের ফকির সেন নিরুদ্দেশ।

মাস্টারদা বলেন, আমাদের পূর্বপরিকল্পনা অনুযায়ী শহর আক্রমণ করা যাক। এভাবে সদলে লুকিয়ে থেকে কোন লাভ নেই। এতে একজন দুজন করে অনেককেই হারাবো।

ঠিক হয় রাত্রের অন্ধকারে শহরের দিকে রওনা হওয়া যাবে এবং শহরের কাছাকাছি কোথাও ক্যাম্প করা হবে। তারপর উপযুক্ত সময়ে শহর আক্রমণ।

রাত্রের অন্ধকারে বিপ্লবী সেনাদল তালে তালে পা ফেলে এগিয়ে চলে।

বন্ধুর পথ—বাধা বিঘ্ন ভরা—প্রলয় পথিক দুপায়ে দলে চলে 'দুর্গম গিরি কান্তার'। সবাই যেন শোনে আহ্বান—'কে আছ জোয়ান হও আগুয়ান, হাঁকিছে ভবিষ্যৎ'।

বিদ্রোহী কবির বাণী প্রাণে প্রেরণা আনে।—

"তিমির-রাত্রি, মাতৃমন্ত্রী সান্ত্রীরা সাবধান!
যুগযুগান্ত সঞ্চিত ব্যথা ঘেরিয়াছে অভিযান।"

নেতা সূর্য সেন কি ভাবছেন?—'হুঁসিয়ার! এ তুফান ভারী, দিতে হবে পাড়ি, নিতে হবে তরী পার'। পরাধীন জাতির কাণ্ডারী, 'আজি দেখিব তোমার মাতৃমুক্তি পণ!—

'গিরি সংকট, ভীরু যাত্রীরা, গুরু গরজায় বাজ,
পশ্চাৎ-পথ-যাত্রীর মনে সন্দেহ জাগে আজ।'

অভিযাত্রীর দল এগিয়ে চলো—পথ যে ফুরায় না—শ্রান্ত ক্লান্ত অনাহার-খিন্ন অবসন্ন দেহ আর পারে না। যেতে হবে—তবু যেতে হবে।

'উষার তুয়ারে আঘাত হেনে রাঙা প্রভাত আনতে হবে। 'চল্ রে, চল্ রে, চল্! অরুণ প্রাতের তরুণ দল! উর্ধ্ব গগনে…'

ওকি! পূর্ব গগন রক্ত রাঙা হয়ে উঠছে—সত্যিই—সূর্য উঠছে—রাত ফুরিয়ে গেছে।

সর্বনাশ! শহর এখনো দূরে। ফাঁকা জায়গায় এসে পড়েছে সব। এখনই দিনের আলোয় সকলে স্পষ্ট দেখতে পেয়ে যাবে।

একটু দূরে এক ছোট পাহাড়…জালালাবাদ!

চলো সব! আপাততঃ ওখানেই আশ্রয় নেওয়া যাক্!

পাহাড়ের নীচে ক্ষেতে চাষারা এসে চাষ শুরু করে।

লোকনাথ বল বিপ্লবী সেনাদলকে হুকুম দেন, লুকিয়ে থাকো সব। কেও নড়ো না, নীচের চাষারা দেখতে পাবে।

পাহাড়ের উপর ছেলেরা ইতস্ততঃ ছড়িয়ে পড়ে—কেউ শোয়, কেউ বসে পাথরের আড়ালে। সান্ত্রীরূপে দূরবীণ হাতে একজন দাঁড়িয়ে থাকে ডিউটিতে।

মাস্টারদা বসে একটা কাগজের উপর কিসের নক্সা আঁকেন—শহর আক্রমণের প্ল্যান। অম্বিকা তাই দেখেন। নির্মল রাইফেলগুলি পরিষ্কার শুরু করেন।

বেলা বাড়ে। ক্ষুধা ও পিপাসায় সকলে কাতর হয়ে পড়ে। সারা রাত্রির পথ হাঁটার পরিশ্রমে ক'দিন বাদে কাল রাত্রে পেটে সামান্য যা পড়েছিল তা বহুক্ষণ হজম হয়ে গেছে। সঙ্গের ওয়াটার বটলের জলও নিঃশেষিত।

পাহাড়ের নীচে একটু দূরে জল পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু সেখানে যাওয়া চলে না। চাষারা দেখতে পেয়ে যাবে। ইতিমধ্যেই বিপ্লবীদের সন্দেহ হয়েছে নীচের জন তুয়েক বোধ হয় তাদের দেখেছে—ভ্রূর উপর হাত দিয়ে চেয়ে দেখছিল উপর দিকে—পাহাড়ের দিকে আঙুল দেখিয়ে হাত নেড়ে নিজেদের মধ্যে কি যেন বলছিল…

কড়া হুকুম জারী হয়, কেউ জলের সন্ধানে স্থান ত্যাগ করতে পারবে না—মিলিটারী অর্ডার ভঙ্গ করলেই কোর্ট মার্শাল—প্রাণদণ্ড!

সূর্যদেব অগ্নি রথে আকাশ অতিক্রম শুরু করেন। পৃথিবীর বুকে দিনের চিতা জ্বলে—সন্তাপে তপ্ত হয় পর্বত। রুক্ষ্ম রুদ্রযোগীর অভি-শাপে শ্যামলা মাটি বুঝি দগ্ধ ভস্ম হয়ে উঠবে—ঊর্ধ্বের অগ্নি গোলক তাঁরই তৃতীয় নয়ন—বিকিরণ করছে মারণ-রশ্মি। তৃষিত বাতাসের লেলিহান জিহ্বা কম্পিত হয় দূরে—দিগন্তরে· ·

সুজলা বাংলার সন্তান কি শেষে জলাভাবে মরবে? হায় নদীমাতৃক! মুমূর্ষু গাঙ্গেয়কেও তৃষ্ণায় কাতর হয়ে শেষে শত্রুর শরণাপন্ন হতে হয়েছিল। এ যুগের ভীষ্ম তোমরা কি করবে?

মরুভূমির মরীচিকামুগ্ধের মতই তাঁদের কেউ কেউ ঘাস পাতা চিবোয়। কিন্তু কণ্ঠ ভেজে না পাদপ-রসপানে।

একটু জল! বড় তেষ্টা পেয়েছে। পুলিন কাতরভাবে প্রার্থনা করে।

একজন এগিয়ে এসে নিজের ওয়াটার বটল তার হাতে দেয়। বহু কষ্টে নিজেকে বঞ্চিত করে সঞ্চিত সামান্য জল—অসামান্য হয়ে উঠে শ্রেষ্ঠ দানের গৌরবে।

তৃষ্ণার্ত তাড়াতাড়ি সেটি মুখের কাছে তোলে—সম্পূর্ণ উপুড় করে ধরে। মাত্র দু'তিন ফোঁটা জল পড়ে। নিদারুণ পরিহাস···

তৃষ্ণার্ত দাতার মুখের দিকে চায়। সে লজ্জা পেয়ে বলে, তলানি একটু ছিল। দেখছি অসহ্য গরমে তাও উপে গেছে—বট্‌লটা নিয়ে সে দূরে ছুঁড়ে ফেলে দেয়।

বন্ধুর লজ্জা ঢাকার জন্য তৃষ্ণার্ত বলে, গ্রীষ্মের রৌদ্রে গায়ের রক্তই শুকিয়ে গেল। জল তো যাবেই।

রাইফেলগুলি এতো তেতেছে যে হাত দেওয়া চলে না।

রাইফেল! রাইফেল! পুলিন বিড় বিড় করে আপন মনে! তৃষ্ণায় মাথা খারাপ হয়ে গেল না কি?

হ্যাভারস্যাক হতে রাইফেলের তেলের ক্যান বের করে। দু-চার ফোঁটা রাইফেলে দেয়। বাকীটা সবার অলক্ষ্যে ঢক্ ঢক্ করে খেয়ে ফেলে।

পরমুহূর্তেই দুহাতে পেট চেপে ধরে ওয়াক্ ওয়াক্ করে বমি করা শুরু করে।

বিপ্লবীরা বিব্রত হয়ে পড়ে তাকে নিয়ে।

বালক টেগরা এসে দাদাকে বলে, বড় খিদে পেয়েছে, সোনাদা।

লোকনাথ জবাব দেন, ছিঃ! বিপ্লবীদের অত কাতর হতে নেই।

ছোটভাইয়ের ক্ষুৎপিপাসায় মলিন মুখ বিপ্লবী লোকনাথকে কি বিচলিত করে না? বাংলার বিপ্লবীরা যে বজ্রের মত কঠিন আবার কুসুমের মত কোমল। হয়তো করেছিল। বিপ্লবীদেব মনের কথা মুখে খুব কমই বেরোয়।

অনেক খুঁজে দুটি তরমুজ জোগাড় করা হয়—ওখানে তরমুজ গাছ প্রচুর। ভগবানের করুণার দানে ক্ষুধা ও পিপাসার সামান্য উপশম হয়তো এবার হবে। অম্বিকা ছুরি দিয়ে কাটা শুরু করেন, সমান ভাগ করে সকলকে দেবেন।

ক্ষুধার্ত টেগরা এক সময় এসে গোপনে একখণ্ড তুলে নিয়ে খায়। গণনার সময় অম্বিকা টের পান। তিনি জিজ্ঞাসা করেন, কে না বলে নিয়েছে?

টেগরা অকপটে স্বীকার করে। সে তো আর চোর নয়, জঠব জ্বালায় যে অপরাধ করেছে তা স্বীকার করার মত সৎসাহসও তার আছে।

কেন তুমি না বলে নিলে?

আমারও তো ভাগ আছে।

অম্বিকা গর্জে উঠে টেগরাকে এক চপেটাঘাত করে বলেন, না। যতক্ষণ না ভাগ করে দিচ্ছি, ততক্ষণ কারও ভাগ নেই।

অভিমানভরে বালক বলে, কতক্ষণে ভাগ করবেন তার ঠিক নেই। আমার বুঝি খিদে পায় না।

• নিয়মনিষ্ঠ নেতা বলেন, খিদে সকলকারই পায়। তাবলে তুমি শৃঙ্খলা ভাঙবে ?

স্বাধীন-চেতা টেগরা বলে, রইল আপনার শৃঙ্খলা। অত কড়াকড়ি মানতে পারবো না। আমি চলে যাবো।

অম্বিকা বলেন, দাঁড়াও! তারপর ডাকেন, লোকনাথ!

লোকনাথ আসেন।

কেউ শৃঙ্খলা ভাঙলে তার শাস্তি কি ?

মৃত্যু!

টেগরা শৃঙ্খলা ভঙ্গ করেছে।

লোকনাথ বিনা বাক্যব্যয়ে কোমর হতে রিভলভার বের করেন। একবার গম্ভীর ভাবে ভাইকে প্রশ্ন করেন তোমার কিছু বলার আছে ?

টেগরা নীরবে গোঁ ভরে মাথা নত করে দাঁড়িয়ে থাকে। লোকনাথ বল অকম্পিত হস্তে তার দিকে তাগ করে হাঁকেন—One…two…

Stop! অম্বিকা চক্রবর্ত্তী বলেন, টেগরা, পার্টির নিয়মের উপর তোমার দাদার নিষ্ঠা দেখলে। তোমার শিক্ষার জন্যই এতো কাণ্ড!

অম্বিকা চক্রবর্ত্তী সস্নেহে টেগরার পিঠে চাপড় মারেন।

অম্বিকাদার আদরের মার ঐ হলো অপরাধীর শাস্তি! পরিহাস প্রিয় বিধু বলে।

নির্মল সকলকে তরমুজ বিতরণ করেন। বলেন, এই নাও, ভাই। অনেক কষ্টে জোগাড় করা গেছে।

দূর থেকে মাস্টারদা শুধু একবার ডেকে বলেন, নির্মলবাবু, নিজের ভাগটি রাখবেন।

মাস্টারদা তাঁর স্বভাব জানেন, নিজের কথা বিস্মৃত হয়ে সব বিলিয়ে দিতে পারেন। তাই সূর্য সেনের ঐ সতর্ক বাণী! সঙ্গীদের সকলের চরিত্রের দৃঢ়তা ও দুর্বলতা সম্পূর্ণ জানা আছে তাঁর।

সকলকে বিলানোর পর নিজের খণ্ডটি নিয়ে একধারে বসে মুখে

তুলতে যাবেন, এমন সময় একটি ছেলে এসে জিজ্ঞাসা করে, নির্মলদা, আর আছে ?

এই নে ! নিজের খণ্ডটি তার হাতে দেন। ছেলেটি নিয়ে খেতে খেতে চলে যায়।

দূর থেকে দাঁড়িয়ে নির্মল দেখেন ছেলেরা কত আনন্দ ভরে তরমুজখণ্ডগুলি ভক্ষণ করে। দেখে তাঁর মন তৃপ্তিতে ভরে উঠে—ওদের আনন্দের অদৃশ্য ঢেউ এসে তাঁরও অন্তরকে স্পর্শ করে। নিজের অভুক্ততার কথা ভুলে যান।

খাওরার শেষে ছেলেরা খোসাগুলি এক জায়গায় ফেলে। একটু পরে সকলের অলক্ষ্যে চুপি চুপি নির্মল সেখানে আসেন—পাছে কারও নজরে পড়েন বলে তিনি হামাগুড়ি দিয়ে এগোন—জড় করা খোসার স্তূপ হতে একটি তুলে নিয়ে চিবান শুরু করেন।

এ কি ! আপনি সকলের খাওয়া খোসা চিবোচ্ছেন ? একটি ছেলের কাছে তিনি ধরা পড়ে যান।

অপ্রতিভ নির্মল কোন রকমে একটা জবাব খুঁজে পান, খোসা নয় রে—একটু একটু শাঁস আছে।

দলের জন্য নেতার এই দীনতা দেখে ছেলেটি বলে, অন্যায় ! ভীষণ অন্যায় ! নিজের ভাগ বিলিয়ে দিয়ে—এমন জানলে আমাদের ভাগ হতে—

নির্মল তাকে নীরব করেন, থাম্ ! ছটো তরমুজের যাটটা খণ্ড, তার থেকে আবার ভাগ।

শ্রদ্ধাভরে ছেলেটি বলে, নির্মলদা, আপনি মানুষ নন। আপনি আপনি—

লাজুক নির্মল আত্মপ্রশংসা মোটেই সহ্য করতে পারেন না। সস্নেহে ছেলেটির চুল ধরে টেনে মাথায় এক চড় মেরে বলেন, ডেঁপোমি করিস নি ! যা পালা এখান থেকে—ভাগ !

চিরস্মরণীয় দিবস ২২' শে এপ্রিলের বিকালে বিপ্লবীরা ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে পাহাড়ের বুকে গা এলিয়ে বিশ্রাম করেন।

এক দলে গোল হয়ে বসেছেন সুরেশ দেব, বিনোদ চৌধুরী জিতেন্দ্র দাসগুপ্ত ও শম্ভু দস্তিদার।

অন্যদলে রয়েছেন কৃষ্ণ চৌধুরী, বিনোদ বিহারী দত্ত, কালী দে, মধুসূদন দত্ত. ননী দেব আর ~~মলিন ঘোষ~~। শান্তি নাগ—

একটু দূরে ক্ষীরোদ ব্যানার্জী, হেমেন্দু দস্তিদার, কালী চক্রবর্ত্তী, অর্ধেন্দু দস্তিদার ও রণধীর দাসগুপ্ত।

খানিকটা নিচের দলে আছে সহায়রাম দাস, মতি কানুনগো, বিধু ভট্টাচার্য, নারায়ণ সেন ও পুলিনবিকাশ ঘোষ।

বেশ খানিকটা দূরে আছে মহেন্দ্র চৌধুরী, নির্মল লালা, বীরেন্দ্র দে, বিনয় সেন আর নিতাইপদ ঘোষ। অন্য এক জায়গায় অশ্বিনী চৌধুরী, বনবিহারী দত্ত, শশাঙ্ক দত্ত আর সুবোধ বল।

আর আছে ফনীন্দ্র নন্দী, হরিপদ মহাজন, ভবতোষ ভট্টাচার্য. সুধাংশু বোস ও সুবোধ চৌধুরী। রয়েছে ত্রিপুরা সেন, দেবপ্রসাদ গুপ্ত, রজত সেন, মনোরঞ্জন সেন, স্বদেশ রায় আর টেগরা।

মাস্টারদা, অম্বিকাদা, নির্মলদা ও লোকনাথ বল একত্রে বসে আলোচনা করছেন পরবর্ত্তী প্ল্যানের।

অপরাহ্ন। পশ্চিম আকাশের বিদায়ী সূর্য মেঘগুলির গায়ে রক্তের ছিটা ছড়িয়ে লাল করে তোলে।

পাহাড়ের নীচে দূরে রেল লাইনের উপর একটি ট্রেন এসে দাঁড়ায়।

যে ছেলেটি 'সেন্ট্রি' ডিউটিতে ছিল সে দূরবীন দিয়ে দেখে চিৎকার করে উঠল—মিলিটারি! মিলিটারি আসছে!

সামরিক অধিনায়ক লোকনাথ বল সান্ত্রীর হাত হতে দূরবীন নিয়ে দেখেন…ঐ যে ক্যাপ্টেন টেট, কর্ণেল ডালাস স্মিথ, ডি-আই-

জি ফারমার। তাদের নেতৃত্বে ইষ্টার্ণ ফ্রন্টিয়ার রাইফেলস আর স্যুর্মাভ্যালী লাইট-হর্স-বাহিনীর সৈন্যদল এগিয়ে আসছে।

সংগ্রাম আসন্ন! বৃটিশ মিলিটারীদের সঙ্গে ইণ্ডিয়ান রিপাবলিকান আর্মির! এক চাপা চঞ্চলতা ছড়িয়ে পড়ে সর্বত্র।

ভারতীয় প্রজাতান্ত্রিক বাহিনীর সেনানায়ক লোকনাথ বল হুকুম দেন—গেট রেডি! এভরিওয়ান—টেক পজিশান!

বিপ্লবীরা লাফিয়ে উঠে বন্দুক তুলে নেন! লিখনরত মাস্টারদা হাতের কাগজ গুটিয়ে উঠে দাঁড়ান। ছেলেরা বিভক্ত হয়ে ছড়িয়ে পড়ে পাহাড়ময়।

ট্রেণ থেকে দলে দলে মিলিটারি নামে।

মাঠের উপর দিয়ে মিলিটারিরা এগিয়ে আসে।

বিপ্লবীদের নিশানার মধ্যে আসার সাথে সাথে বন্দুকের শব্দ শোনা যায়। কয়েকজন মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। তারা বেয়নেট লাগিয়ে ছড়িয়ে পড়ে, পাহাড়ের দিকে দৌড়ে আসে। বিপ্লবীদের গুলি চলে। আবার কতক পড়ে। এবার মিলিটারিয়া না দৌড়ে, গুঁড়ি মেরে এগোয়। তারাও গুলি ছোঁড়ে।

পাহাড়ের উপর থাকায় বিপ্লবীদের খুবই সুবিধা হয়। শত্রুর গুলিতে তাঁদের কেউই আহত হন না। কিন্তু তাদের গুলিতে সরকারী সৈন্যের হতাহতের সংখ্যা ক্রমশঃ বেড়ে উঠে।

মাস্টারদা crawl করে বিপ্লবীদের এক একটি দলের কাছে গিয়ে নির্দেশ দেন—খবরদার ঘিরে ফেলতে দিও না, ঠিক তাগ করে মারো—প্রত্যেক গুলিতে যাতে একজন মরে…

মিলিটারিরা ক্ষেতের এক আলের আড়ালে আশ্রয় নেবার চেষ্টা করে। বেশ কিছুক্ষণ দুপক্ষের গুলি চলে।

হঠাৎ চীৎকার শোনা যায়—ওরা পিছু হট্‌ছে!

দূরবীণধারী লোকনাথ বলেন, They are retreating!

পালাচ্ছে—মিলিটারিরা পালাচ্ছে—ছেলেরা আনন্দে কভার

ছেড়ে উঠে দাঁড়ায় বন্দুক কাঁধে—দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পলায়নপর সৈন্যদলের উপর গুলি বর্ষণ করে—চীৎকার করে, 'স্বাধীন ভারত কি জয়! বন্দেমাতরম্!'

সামনা-সামনি লড়াইয়ে প্রথম জয়!

ছেলেদের আনন্দের বাঁধ ভেঙে যায়—তারা নিত্য করে—গান ধরে।

একজন চেঁচিয়ে আবৃত্তি করে নজরুলের কবিতা—'ভাগ্ গিয়া ভাই, ভাগ্ গিয়া, জানোয়ার সব ভাগ্ গিয়া!'

একদল কোরাস ধরে—

হুরে-হো-সাবাস জোয়ান! লেফট্-রাইট
মার দিয়া ভাই, মার দিয়া,
কেল্লা ফতে কর দিয়া,
পরোয়া নেহি যানে দো ভাই যো গিয়া,
হুরে-হো, সাবাস জোয়ান!

মাটিতে পা ঠুকে সব তাল দেয়। ওয়াটার-বট্‌লগুলি তবলার মত বাজায়। রাইফেলগুলি তুলে তারা উদ্দাম আনন্দে নৃত্য করে।

ওদিকে মিলিটারি অফিসাররা পরামর্শ করে।

We have suffered great loss.

They are on the hill. We must sweep them with machine guns from another hill-top.

জালালাবাদের সামনের উঁচু পাহাড়টার উপর মিলিটারিরা মেসিনগান টেনে তোলে।

ছেলেরা একটা বিজয় উৎসব করতে চায়।

টেগরা এসে মাস্টারদার অনুমতি চায়, আমাদের পতাকা ঐ আমলকী গাছের উপর ওড়াবো।

সকলে সমবেত হয় আমলকী গাছের কাছে। টেগরা একটি ত্রিবর্ণ পতাকা—যেটি নিয়ে এরা মার্চ করতো—নিয়ে গাছে উঠার উপক্রম করে। এমন সময় এক ঝাঁক গুলি আসে সামনের পাহাড় হতে।

Take cover ! Take cover !

বিপ্লবীরা শুয়ে পড়ে। চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ার চেষ্টা করে। তারাও গুলি ছোঁড়ে। নির্মল বন্দুকগুলি ভরে ভরে তাদের হাতের কাছে এগিয়ে দেন।

হঠাৎ একটা গুলি এসে টেগরার বুকে লাগে।

সে ডাকে, সোনা ভাই ! সোনা ভাই !

একজন চীৎকার করে উঠে, লোকাদা, টেগরার গুলি লেগেছে।

লোকনাথ ও অন্যান্য নেতারা সেদিকে ছুটে আসেন।

টেগরা ! টেগরা !

আমি চল্লাম, সোনা ভাই! তোমরা লড়াই চালিয়ে যাও। থেমো না।

তারপর উত্তেজিত হয়ে উঠে বসার চেষ্টা করে। বলে, নির্মলদা—আমার বন্দুকটা তাড়াতাড়ি ভরে দিন···মরার আগে আর একবার fire করি।

নির্মল তাড়াতাড়ি তার হাতের কাছে বন্দুক এগিয়ে দেন। টেগরা সেটা ছোঁড়ার চেষ্টা করে। কম্পিত হস্তে ধৃত বন্দুকের নল উর্ধ্বে আকাশের দিকে উঠে—fire হয়, gun recoil করে এবং সেই ধাক্কার সাথে সাথে টেগরা শুয়ে পড়ে—তার শায়িত দেহের উপর দুহাতে ধরা বন্দুকটিও শুয়ে থাকে।

নির্মল ব্যাকুল কণ্ঠে তার গায়ে হাত দিয়ে ডাকেন, টেগরা! টেগরা !

কিন্তু কোন সাড়া পান না। সকলে স্তব্ধ হয়ে থাকে।

গম্ভীর বিষণ্ণ কণ্ঠে মাস্টারদা কেবল বলেন, Tegra opens the gates of martyrdom !

মেসিন গানের জবাব দেওয়া হয়।

Start volley fire! volley fire!

লোকনাথ বল গুলিবর্ষণের হুকুম দেন, One…two…three!

একসঙ্গে সাত আটটি বন্দুক গর্জে ওঠে।

One…two…three!

One…two…three!

গুলি চলে। নির্মল গুঁড়ি মেরে ঘুরে ঘুরে প্রত্যেকের বন্দুক পরিষ্কার করে বেড়ান। অবিশ্রাম গুলিবর্ষণের ফলে নলগুলি নোংরা হয়ে উঠছে—গরম হয়ে উঠছে। বিপ্লবীদের অবিরাম গুলি বর্ষণ সম্ভব করে তুলছেন নির্মল সেন।

মিলিটারি অফিসাররা অবাক হন এদের যুদ্ধকৌশল দেখে—শিক্ষিত সৈন্যের মতই বিপ্লবীরা সবিক্রমে সংগ্রাম চালায়…

বিনোদ দত্তর ডান হাতে গুলি লাগে। দর দর ধারে রক্ত পড়ে, বাহু অবশ হয়ে যায়। নিজের হাতের দিকে সে একবার দেখে। তারপর পায়ে করে বন্দুক ভাঙে, বাঁ হাতে কার্টিজ ভরে, এক হাতেই সে বন্দুক ছুঁড়ে চলে।

একজনের পেটে গুলি লাগে।

Farewell—Motherland!—মাটিতে লুটিয়ে পড়ার আগে সে বলে।

বিধুর গুলি লাগে। সে সহাস্যে চেঁচিয়ে উঠে, হানাইছে রে—

শত্রু যে আঘাত হেনেছে তাতে তার ভ্রূক্ষেপ নেই, শত্রুর লক্ষ্য ভেদ করার আনন্দে সে হাসে—হোক না কেন সে লক্ষ্যস্থল সে নিজেই। চির পরিহাস প্রিয় সে। মৃত্যুটাও তামাসা বলে মনে করে হাসি মুখেই পৃথিবী হতে বিদায় নেয় সে।

অম্বিকা চক্রবর্ত্তী আহত হন। কোন রকমে গড়াতে গড়াতে মাস্টারদার কাছে আসেন।

সূর্যবাবু!

একি! আপনার গুলি লেগেছে?

অম্বিকার কপাল বেয়ে রক্তের ধারা নামে চোখের উপর···চারিদিক ঝাপসা হয়ে আসে।

বাঁচার আশা কম। মরার আগে পার্টির এ সম্পত্তি আপনার হাতে তুলে দিতে চাই।

পকেট হতে এক তাড়া নোট ও কাগজপত্র বের করে মাস্টারদার হাতে দেন। মাস্টারদা মনে মনে ভাবেন তিনিও তো হঠাৎ আহত হয়ে মারা যেতে পারেন। দলের এই সম্পত্তি সকলকার কাছে ছড়িয়ে রাখা উচিত।

যন্ত্রণাকাতর অম্বিকা আক্ষেপ করেন, অনেক কাজ বাকী রইল!··· উঃ, বড় যন্ত্রণা!

মুমূর্ষু সহকর্মীর পাশে অসহায় মাস্টারদা বসেন···আবাল্যের বন্ধুর মৃত্যুযন্ত্রণা প্রত্যক্ষ করেন—কত পুরানো কথা মনে পড়ে যায়—বন্ধুকে বলেন, বাঁচতে আপনাকে হবেই। কত বার মরেত মরতে বেঁচে উঠেছেন। আপনি তো মৃত্যুঞ্জয়ী!

অম্বিকা চক্রবর্ত্তী ম্লান হাসি হাসেন—করুণ বেদনা মাখান হাসি···

মাস্টারদারও চোখ ঝাপসা হয়ে উঠে।

ইতিমধ্যে বিপ্লবীদের সাত-আটজন মারা যায়। কয়েকজন আহত হয়ে ছটফট করে। দুপক্ষেরই গুলি সমান চলে।

আহত একজন প্রার্থানা করে, একটু জল···

পার্শ্বের সহযোদ্ধা দুঃখ ভরে বলে, জল তো নেই, ভাই।

মরার আগে গলাটা একটু ভিজিয়ে নিতাম।

সহযোদ্ধার দুচোখে জলের ধারা নামে···নোনা জল···বন্ধুর শেষ অনুরোধ রক্ষা করার কোন উপায়ই নেই।

ত্রিপুরার গুলি লাগে। সে চীৎকার করে, Good bye friends! তারপর ঘুরে পড়ে যায়।

তার কাছ হইতে কিছু দূরে এক পাথরের আড়ালে বসে দেবু গুপ্ত

স্থির লক্ষ্যে গুলি ছুড়ে চলেছিল। মুমূর্ষু সাথীর আর্তনাদ তার কানে আছে। বন্দুক কাঁধ হতে নামিয়ে চারিদিকে চায়। বন্ধুকে দেখতে পায়। তাড়াতাড়ি বন্দুক নামিয়ে রেখে আড়াল হতে উঠে সামনে চলে।

Take cover ! Take cover !

দেবু, কোথা যাচ্ছো ?

ওদিকে যেও না। অবিরাম গুলি আসছে ওখানে।

দেবু কোন কথায় কান না দিয়ে ধীর গম্ভীর ভাবে এগিয়ে চলে।

যেও না ! দেবু, যেও না ! Don't go !

এবার একবার পিছন ফিরে শুধু বলে, ত্রিপুরা পরে গেছে, মাস্টারদা।

বন্ধুর কাছে গিয়ে দেখে, সে ইতিমধ্যে মারা গেছে। সন্তর্পণে তার পাশে হাঁটু গেড়ে বসে। অনর্থক জেনেও নিজের পকেট হতে রুমাল বের করে তার ললাটের রক্তের ধারা মুছে নেয়। নীচু হয়ে বুকের কাছে হাত দিয়ে বোঝে হৃৎস্পন্দন নীরব।

বর্ষার ধারার মত মেসিনগানের গুলি বর্ষণের ফলে গাছ হতে পাতা খসে এদের দুজনের উপর পড়ে। জীবিত বন্ধু ধীরে ধীরে মৃত বন্ধুর ললাট চুম্বন করে—তাদের আবাল্যের বন্ধুত্বের শেষ নিদর্শন। তারপর উঠে দাঁড়ায়। আবার কি মনে হওয়ায় হাঁটু গেড়ে বসে। মৃত বন্ধুর হ্যাভারস্যাক হতে গুলি বের করে নিজের পকেটে পোরে। হ্যাভারস্যাকটা সযতনে বন্ধুর মাথার তলায় বালিসের মত গুঁজে দেয় —মরার পর তার স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি লক্ষ্য রাখা বাতুলতা বলে মনে হলেও।

তারপর বন্ধুর বন্দুকটা তুলে নিয়ে কোন দিকে না চেয়ে নিজের স্থানে ফিরে আসে। বন্ধুর বন্দুকটাই ভরে নিয়ে তাড়াতাড়ি গুলিবর্ষণ করে চলে—মৃত্যুর প্রতিশোধ বাসনা মনে আগুন জ্বেলে দিয়েছে।—তারা যে দুজনে ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিল।

গুঁড়ি মেরে মাস্টারদা সকলকার কাছে গিয়ে বলেন, Don't expose yourself! Take cover! Take cover under your dead comrades!

মৃত সঙ্গীদের দেহের আড়াল হতে বিপ্লবীরা শত্রুর প্রতি গুলি বর্ষণ করে।

আহত মতি কানুনগো যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্‌ করে, আর তারই দেহের আড়ালে শুয়ে গলার উপর দিয়ে বন্দুকের নল চালিয়ে কালি দে মিলিটারির উপর গুলি বর্ষণ করে চলে···

ত্বপক্ষেই হতাহত হয়। বিপ্লবীদের জন এগারো মারা যায়, মিলিটারিদের শ ত্বয়েক।

রাত্রি নটায় ও-পক্ষের গুলি বন্ধ হয়। প্রায় চারটায় যুদ্ধ শুরু হয়েছিল।

মিলিটারি অফিসাররা সিদ্ধান্ত করেন ঃ

Let us wait for the morning.

We may be encircled in the darkness. Let us leave the position.

ট্রেনে করে সৈন্যেরা চলে যায়। কাল সকালে আবার সংগ্রাম শুরু হবে।

মৃত সহযোদ্ধাদের বিপ্লবীরা পাশাপাশি শুইয়ে দেয়। নির্ভীক টেগরার পাশে তার খুড়তুতো ভাই প্রভাস বল—সবল দেহের মাংসপেশীগুলি কঠিন হয়ে গেছে···চির প্রফুল্ল বিধুর অধরে এখনো যেন হাসি মাখান রয়েছে···চিরবিপ্লবী অম্বিকা চক্রবর্তী রণক্লান্ত হয়ে যেন ঘুমিয়ে পড়েছেন···ললাটে তাঁর রক্তটীকা···নির্মল লালা, চতুর্দশ বর্ষীয় বালক, নিজের প্রিয় জিনিস সব সহপাঠীদের বিলিয়ে দিয়ে অনেক বায়না করে সে এসেছিল আক্রমণে। মাস্টারদাকে বলেছিল

যে সব বিলিয়ে দিয়ে এবার আমি এসেছি, আমাকে ফিরিয়ে দেবেন না···আর কেউ তাকে ফিরিয়ে দিতে পারবে না, সব শেষে নিজেকেও সে বিলিয়ে দিল !···তৃষিত পুলিন···মরবার আগে তার মুখে এক বিন্দু জল কেউ দিতে পারেনি···এখন সকলের চোখের জলে কি তৃপ্ত হবে তুমি? শপথ করছি বন্ধু বুকের রক্ত দিয়ে তোমার তর্পণ করবো।···বীর ত্রিপুরা জালালাবাদে তোমায় হারাবার জ্বালা চিরদিন আমাদের বুকে জ্বলবে। জিতেন দাসগুপ্ত, মতি কানুনগো, অর্ধেন্দু দস্তিদার, নরেশ রায়···জালালাবাদের শহীদ তোমরা···তোমরা চিরস্মরণীয়! তোমাদের ভুলবো না।

শোকার্ত বিপ্লবীরা সারিবদ্ধভাবে মাথা নুইয়ে নীরবে দাঁড়িয়ে থাকে। মাস্টারদার বিষণ্ণ কণ্ঠস্বর ধীরে ধীরে সে নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে।

অনেককে আজ আমরা হারালাম। এদের সাহস বীরত্ব ও আত্ম-ত্যাগের কথা দেশের মুক্তি সংগ্রামের ইতিহাসে রক্তাক্ষরে লেখা থাকবে—চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। এদের আজ আমরা পেছনে ফেলে রেখে চল্লাম। কিন্তু কোনদিনই ফেলে রাখতে পারবো না এদের আরব্ধ কাজকে। যে আদর্শের জন্য এরা প্রাণ দিল, তাকে জয়যুক্ত করার দায়িত্ব আজ আমাদের। লড়াই আমাদের এখনো শেষ হয়নি। সামনাসামনি লড়াই আজ শেষ হলো—এবার শুরু হবে খণ্ড যুদ্ধের পালা।

মৃত বন্ধুদের সামরিক সম্মান দেখিয়ে এরা জালালাবাদ ত্যাগ করে রাত্রির অন্ধকারে। পাহাড়ী পথ বেয়ে মার্চ করে নামে—পিছনে পড়ে থাকে কিছু সঙ্গী আর স্মৃতি···কেউ কি হোঁচট খায়? চোখের জলে কি দৃষ্টি শক্তি ঝাপসা হয়ে আসে? মনের চোখে কি কোন প্রিয়জনের মুখ ভেসে ওঠে?

কানে যেন ভেসে আসে প্রথম শহীদের শেষ বাণী—অন্তিম অনুরোধ—তোমরা লড়াই চালিয়ে যাও···থেমো না···

Goodbye, friends!

জালিনাবাগের জালালাবাদের এসেছে আদেশ—
চলো চলো বীর, পরো পরো বীর সৈনিকের বেশ !

—সলিল চৌধুরী।

বাইশে এপ্রিলের স্মরণীয় রাত্রিতেই ফেণী স্টেশনে ছদ্মবেশী অনন্ত সিং, গণেশ ঘোষ, জীবন ঘোষাল (মাখন) ও আনন্দ গুপ্তকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে। ট্রেন থেকে তাঁদের টেনে নামান হয়। পুলিশ তাঁদের ঘিরে দাঁড়ায়। তাঁরা লক্ষ্য করেন অন্য প্লাটফর্মে এক মিলিটারি স্পেশ্যাল দাঁড়িয়ে—খুব সম্ভব চট্টগ্রামেই সামরিক সাহায্য প্রেরিত হচ্ছে।

স্টেশন মাস্টার বলেন, এই টিকিটের নম্বরই তো আমাদের টেলিগ্রাফ করে জানিয়েছে।

শহরের বাইরের এক ছোট স্টেশন থেকে এঁরা ট্রেনে চেপে-ছিলেন। সেখানে এঁরা তিনজন দূরে অপেক্ষা করছিলেন, আনন্দ গুপ্ত গিয়ে টিকিট কাটে। ছদ্মবেশ সত্ত্বেও সুন্দর ভদ্রবংশসম্ভূত চেহারা স্টেশন-মাস্টারের মনে সন্দেহ জাগায়। তিনি বিনা বাক্যব্যয়ে টিকিট বিক্রি করেন এবং সেই সঙ্গে এঁদের গন্তব্যস্থল ও টিকিট নম্বর টেলিগ্রাফ করে উপরে জানিয়ে দেন।

জি. আর. পি. পুলিশ অফিসার একবার এঁদের আপাদমস্তক দেখেন। স্টেশন মাস্টারকে বলেন, এদের তো একেবারে গেঁয়ো চাষা বলে মনে হচ্ছে। যাহোক, তবু দেখা যাক্—

অফিসারের ইঙ্গিতে পুলিশেরা তাঁদের নিয়ে স্টেশন মাস্টারের ঘরে ঢোকে। ইন্সপেক্টর ও স্টেশন মাস্টার দুজনে দুটি চেয়ারে বসে।

ঘরে ঢোকার সাথে সাথেই অনন্ত ও গণেশের চোখে চোখে কথা হয়। গণেশ দরজার কাছে দাঁড়ান। মাখন ও আনন্দকে মাঝখানে রেখে অনন্ত এক কোণ নেন, যাতে মারামারির সময় পশ্চাৎ হতে আক্রান্ত না হন।

পুলিশেরা দু-তিন জন ধৃত ব্যক্তিদের টেবিলের সামনে দাঁড় করিয়ে পিছনে থাকে এবং একজন দরজার কাছে দাঁড়ায় পাহারায়।

জিজ্ঞাসাবাদ শুরু হয়।—

কোথায় যাচ্ছিলে তোমরা ?

গণেশ জবাব দেন, আহজ্ঞা—আয়ঁরা আত্মীয় বারি যাইব।

ছোট ছেলের পেট থেকে যদি কিছু কথা বের করা যায় এই উদ্দেশ্যে ইন্সপেক্টর মাখনকে প্রশ্নকরা শুরু করে। অনন্ত সিংয়ের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে জিজ্ঞাসা করে—এ কে ?

মাখনও গ্রাম্য ভাষায় উত্তর দেয়, তাঁই আয়ার খুরা লাগে।

বাড়ি কোথায় ?

পাঁচালাইশ !—চট্টগ্রাম জেলার এক গ্রামের নাম।

হাতে ও পুঁটলি কিসের ?

কত্তর আছে, কুর্তা আছে, বাউ—

দেখি পুঁটলিটা।

এইবার বাধা দেওয়া উচিত। পুঁটলিতে বাড়তি রিভলভার ও কার্টিজ লুকান আছে।

গণেশ অফিসারকে জানান তিনি প্রস্রাব করতে চান। অফিসারের ইঙ্গিতে এক পুলিশ তাঁকে বাইরে নিয়ে যায়। বাইরে গিয়েই গণেশ চারিদিক চকিতে দেখে নেন। ইতিমধ্যে মিলিটারি স্পেশ্যাল স্টেশন ছেড়ে চলে গেছে। গণেশের বুক হতে একটা স্বস্তির নিশ্বাস বের হয়।

এদিকে ঘরের মধ্যে অনন্তর একটি হাত সন্তর্পণে কোমর হতে রিভলভার বের করে সবার অলক্ষ্যে—সকলের দৃষ্টি তখন মাখনের

দিকে নিবদ্ধ। একটি পুলিশ মাখনের হাত হতে পুঁটলিটা টেনে নেয়।

অনন্ত সিং সিংহের মত এক লাফে টেবিলের উপর উঠে দাঁড়িয়ে পুলিশ অফিসারকে গুলি করে—তাঁর এক হাতে রিভলভার, অন্য হাতে পিস্তল। অফিসার চেয়ারশুদ্ধ উল্টে পড়ে যায়। মাখন, আনন্দও রিভলভার বের করে গুলি করে—ঘরের মধ্যে তীব্র আর্তনাদ উঠে হুড়োহুড়ি শুরু হয়।

বাইরে প্ল্যাটফর্মেও গণেশ ঘুরে দাঁড়িয়ে পাহারওয়ালার উপর গুলি বর্ষণ করেন—তারপর ঘরের দিকে ছুটে আসেন চেঁচাতে চেঁচাতে—প্ল্যাটফর্ম পরিষ্কার! শিগ্‌গির—

অনন্ত চেঁচান—পালাও! পালাও!

আনন্দ ছুটে বেরিয়ে যায়। মাখন তার অনুসরণ করে—দ্বারের নিকট দণ্ডায়মান প্রহরী মাখনের মাথার সজোরে রুলের আঘাত করে।

অনন্ত টেবিলের উপর থেকে এক লাফে দরজার কাছে পড়েন, বিদ্যুতের মত প্রহরীর হাতের তলা গলে যান। তারপর ঘুরে দাঁড়িয়েই প্রহরীকে গুলি করেন। সে আর্তনাদ করে পড়ে যায়।

ছোটো! ছোটো।

চারজনে চার দিকে ছোটে। অনন্ত রেল লাইন পেরিয়ে তারের বেড়ার উপর পড়েন। সবলে তার ছিঁড়ে তিনি সোজা হয়ে দাঁড়ান।

গণেশ একা খানিকটা দৌড়ে কারুকে না পেয়ে স্টেশন মাস্টারের ঘরের দিকে ফিরে আসেন। অন্ধকার ঘরে উঁকি মেরে শোনেন আর্তনাদ। চারি দিকে চেয়ে সঙ্গীদের খোঁজেন। মৃদুস্বরে ডাকেন, অনন্ত! অনন্তলাল!

কাউকে না পেয়ে আবার অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে যান।

একটু পরে অনন্তও ফিরে আসেন। তিনিও চারিদিক খোঁজেন। ডাকেন, গণেশ! মাখন! আনন্দ!—

সাড়া না পেয়ে তিনিও অন্ধকারে মিলিয়ে যান।

রেল-লাইনের দুধারের নীচু জমি দিয়ে মাখন আনন্দ দৌড়ায়। পরস্পরের পদশব্দ তাদের কানে আসে।

কে?

তুমি কে?

মাখন।

আনন্দ।

অনন্তদা গণেশদা কোথায়?

জানি না।

দাঁড়াবার সময় নেই। পুলিশ পিছু নিতে পারে।

তারা এবার একত্রে দৌড়তে শুরু করে।

এদের সন্ধানে গণেশ ফেণীর কলেজ হোস্টেলে আসেন। সে সময় ছাত্রদের মধ্যে বিপ্লবীদলের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট গণেশের পরিচিত কজন ওখানে ছিল। নিশীথ রাত্রে সকলেই নিদ্রিত! গণেশ বোঝেন সঙ্গীরা এখানে আসেনি। কারুকে না ডেকেই তিনি স্থানত্যাগ করেন। এ সময় ডাকাডাকি সমীচীন নয়।

অভয় আশ্রমে যান। বন্ধ ঘরের দরজায় কান পাতেন, যদি কেউ এসে থাকে বা যদি কেউ জেগে থাকে। চারিদিক নিস্তব্ধ। গভীর রাত্রি

গণেশ আবার পথে নামেন। দৌড়ান শুরু করেন—খানিকটা দৌড়ে হাঁপিয়ে পড়েন—জোরে জোরে নিশ্বাস পড়ে—অসুস্থ শরীর শ্রান্তিতে ভেঙে পড়তে চায়। তাড়াতাড়ি হাঁটেন। আবার দৌড়ান। কিন্তু ক্লান্তিতে গতি কমে আসে। পা আর চলতে চায় না। হাত দিয়ে কপালের ঘাম ঝেড়ে ফেলেন। টল্‌তে টল্‌তে পথের ধারেই বসে পড়েন। গলায় হাত দিয়ে দেহের উত্তাপ অনুভব করেন।

হঠাৎ তীক্ষ্ণ চীৎকার শোনা যায়—Hands up!

গুলির শব্দও বোধহয় হয়!

গণেশ দুহাত মাথার উপর তুলে বলেন, আমি গণেশ—গণেশ ঘোষ।

মাখন আনন্দ ছুট্তে ছুট্তে এসে তাঁর বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ে। বালক কণ্ঠের চীৎকার শুনে তিনি আগেই বুঝেছিলেন। দুহাতে তাদের জড়িয়ে ধরেন।

পুলিশ ভেবে তোমায় গুলি করছিলাম।

গণেশের বুকের উপর দুজনে ক্লান্তিতে, উত্তেজনায়, আনন্দে ও ভয়ে জ্ঞান হারায়।

একা অনন্ত সিং ছুটে চলেছেন—দুর্গম পথের পথিক। ধীরে ধীরে অন্ধকার তরল হয়ে আসে। তাঁর ধুলিকর্দমাক্ত মূর্তি স্পষ্ট হয়। দূর দিগন্তের দিকে চেয়ে তিনি থমকে দাঁড়ান—সূর্য উঠেছে। নতুন দিনের শুরু! অনন্ত সিং স্তব্ধভাবে দাঁড়িয়ে সূর্যোদয় দেখেন।

প্রিয় সঙ্গীদুটির অবস্থা পর্যবেক্ষণ করেন। পিস্তলটা অকেজো হয়ে গেছে, আর রিভলভারে গুলি নেই। পুলিশের মুখোমুখি হলে এরা আর তাঁকে কোন সাহায্যই করতে পারবে না। বরং অপমানের কারণ হবে—পুলিশ সদম্ভে ঘোষণা করবে সশস্ত্র অনন্ত সিংকে তারা গ্রেপ্তার করতে সক্ষম হয়েছে। তাঁর অস্ত্রের অবস্থার কথা গোপন করে রাখবে কৃতিত্ব কুড়ানর মোহে।

তিনি মাটিতে বসে দু হাতে গর্ত খোঁড়েন। তারপর অঙ্গের ছিন্নভিন্ন পোশাক খুলে অস্ত্র দুটি জড়িয়ে মাটিতে পুঁতে ফেলেন। কাপড়ও ছিঁড়ে লেংটি পরেন। তারপর গর্ত বুজিয়ে আরও ধুলা কাদা মেখে চুল উস্কখুস্ক করে পুরোদস্তুর পাগল সাজেন।

জালালাবাদে পরিত্যক্ত মৃত বিপ্লবীদের মধ্যে অম্বিকা চক্রবর্তী নব-জীবন লাভ করেন। ধীরে ধীরে তাঁর জ্ঞান ফিরে আসে। অত্যধিক রক্তক্ষরণে তিনি অজ্ঞান অবস্থায় মৃতপ্রায় ছিলেন। তিনি

পাশ ফেরেন। একটি চোখে বুলেট বিদ্ধ হয়ে ফুলেছে, সারা মুখ রক্তপ্লাবিত। স্পষ্ট কিছু দেখতে পান না এক চোখের ক্ষীণ দৃষ্টিতে। তবু তিনি হাতড়ে হাতড়ে চারিদিক অনুভব করার চেষ্টা করেন—হামাগুড়ি দিয়ে স্থানত্যাগ করার চেষ্টা করেন। দুর্বল কম্পিত কণ্ঠে ডাকেন, কেউ আছো ?

অদূরে আহত অর্ধেন্দু দস্তিদার ও মতি কানুনগো ছিল। মারাত্মক আহত—ওদের সঙ্গে বহন করে নিয়ে যাওয়া ও চিকিৎসার বন্দোবস্ত করা অসম্ভব বলে সঙ্গীরা ফেলে যেতে বাধ্য হয়েছে।

মতি অচেতন। অর্ধেন্দু সাড়া দেয়, কে ? অম্বিকাদা !

কণ্ঠস্বর শুনে চিনতে পেরেছে। অম্বিকা চক্রবর্তী কোন রকমে তার কাছে আসেন। বলেন, মারা গেছি ভেবে ওরা ফেল গেছে। এসো পালাই।

আমার পেটে গুলি লেগে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলাম ! এখন নড়তে গেলেই রক্ত বের হবে। দেখা যায় অর্ধেন্দু গায়ের শার্ট খুলে পেটের ক্ষতস্থানের মুখে হাঁটু দিয়ে চেপে বসে রাইফেল ধরে আছে। সে বলে, রক্তক্ষয় এবং অনাহারে একেবারে দুর্বল করে দিয়েছে। আপনি পালান।

তোমায় ফেলে যাই কি করে ?—নেতার পক্ষে অনুরক্ত অনুগামীকে ত্যাগ করা সহজ নয়।

উপায় নেই ! ভোর হয়ে আসছে, এখুনি ওরা আসবে। আমি যতক্ষণ পাবি লড়বো, আপনি পালান ! যান—অম্বিকাদা যান !

নিজের জীবন অপেক্ষা নেতার জীবনের জন্য অর্ধেন্দু বেশী চিন্তিত হয়।

পাহাড়ের চারিধার মিলিটারিরা বেষ্টন করে। দুটি রেজিমেণ্ট এসেছে। বিনা বাধায় তারা পাহাড়ে উঠার সুযোগ পায় আজ।

ইতিমধ্যে অম্বিকা গড়িয়ে গড়িয়ে নেমে এক ঝোপের মধ্যে আত্ম-গোপন করেন।

হঠাৎ গুলির আওয়াজ হয়। অর্ধেন্দু শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত সংগ্রাম করার সঙ্কল্প করেছে।

মিলিটারিরাও গুলি ছোঁড়ে।

হঠাৎ কার চীৎকার শোনা যায়—Here ! Here, plenty of dead bodies !

সবাই সেদিকে দৌড়য়।

অম্বিকার সামনে রাইফেলধারী এক দেশীয় সৈনিক পড়ে। তিনি রিভলবার উঁচিয়ে বলেন, খবরদার ! খাঁড়া রও !

সে ভয়ে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে।

অম্বিকা ভাঙা ভাঙা হিন্দিতে বলেন, হিঁয়াসে হামকা ছিপায়কর লে যানে হোগা। বহুৎ বকশিস মিলেগা !

এক হাতে তিনি পকেট হতে রুমাল বের করে দলা পাকিয়ে বুদ্ধি করে বলেন, ইসমে পাঁচ হাজার রূপেয়া হ্যায় ! ইয়ে তুমারা। লেকিন চিল্লানেসে জান লে লেগা।

কম্পিত কণ্ঠে সৈন্যটি বলে, ম্যয় নেহি চিল্লায়েগা। মৎ মারিয়ে হামকো !

অন্ধের যষ্টির মত সৈনিকের বন্দুকটি ধরে পার্বত্যপথ বেয়ে নামতে নামতে অম্বিকা বলেন, ম্যয়লোক আজাদী কি লিয়ে লড়তা হুঁ, আউর তুমলোক আভা হ্যয় হামলোককা জান লেনে কো লিয়ে ! কেয়া শরম কি বাত!

এক খালের ধারে সে অম্বিকাকে পৌঁছে দেয়। অম্বিকাদা আকণ্ঠ জল পান করেন এবং জলের মধ্যেই আত্মগোপন করেন।

এক জঙ্গলের মধ্যে বিপ্লবীরা আত্মগোপন করে আছেন। আগের

দিন তাঁদের মাথার উপর দিয়ে এরোপ্লেন ঘুরে গেছে—মাটির সঙ্গে মিশে কোন রকমে তাঁরা পর্যবেক্ষকের দৃষ্টি এড়িয়েছেন।

রাত্রে তাই মাস্টারদা সকলকে ডেকে বলেন, আমি ভেবে দেখলাম এভাবে দল বেঁধে বেশী দিন আমাদের লুকিয়ে থাকা সম্ভব নয়। জালালাবাদে পুলিশ যেমন আমাদের সন্ধান পেয়ে গিয়েছিলো, তেমনি আবার সন্ধান পেলে মুশকিল। তার চেয়ে যাদের উপর পুলিশের সে রকম সন্দেহ নেই বা যাদের বিরুদ্ধে জোরাল প্রমাণ নেই তারা বাড়ি ফিরে যাক। শহরে থেকেও তারা অনেক কাজ করতে পারবে। বাকী সকলে গ্রামে গ্রামে ছড়িয়ে আত্মগোপন করে থাকো, গেরিলা যুদ্ধের জন্য অস্ত্র, অর্থ ও লোক সংগ্রহ করো। আমি লুকিয়ে সব কিছুর তদারক করবো।

স্বদেশ প্রভৃতি কয়েকজন মাস্টারদাকে বলে, আমরা আর ঘরে ফিরবো না, মাস্টারদা।

দেবু গুপ্ত বলে, জালালাবাদ আমাদের ডাকছে। আমাদের দেহটাই শুধু আজও এখানে আছে, মন প্রাণ সেখানে পড়ে।

স্বাধীনতার জন্য মৃত বন্ধুরাই শুধু বলিপ্রদত্ত নয়, আমরাও উৎসর্গীকৃত।

বন্ধু-বিচ্ছেদের বেদনায়—প্রতিশোধ কামনায় তারা অধীর।

মাস্টারদা তাদের অবস্থা বোঝেন। প্রত্যেকের মনের কথা, ব্যথা হৃদয়ঙ্গম করতে পারতেন তিনি। সহানুভূতিপূর্ণ স্বরে বলেন, কি করতে চাও তোমরা?

রক্ত দিয়ে মৃত বন্ধুদের তর্পণ করবো।

তাদের অসমাপ্ত কাজ আমরা শেষ করবো!

টেগরা-নরেশদারা ইউরোপীয়ান ক্লাব আক্রমণ করতে গিয়ে কাউকে না পেয়ে ফিরে এসেছিল। এবার আমরা যাবো।

আমরা ইউরোপীয়ান ক্লাব ও কলোনি আক্রমণ করবো।

স্বর্গ হতে ওরা দেখে শান্তি পাবে।

মাস্টারদা তাদের সাময়িক ভাবে শান্ত করার চেষ্টা করেন। বলেন, উত্তেজনার মুখে হঠাৎ কিছু করা চলে না। সব দিক ভেবে কাজ করা উচিত।

কাজ আমরা একটা করবোই, মাস্টারদা!—সকাতর অনুনয়।

আমরা watch করে সব প্রয়োজনীয় খবর জোগাড় করছি। অনুমতি কিন্তু আপনাকে দিতেই হবে।

মাস্টারদা তাঁর স্বভাবসুলভ স্মিত হাস্য করেন। পরে অনুমতি অবশ্য তিনি দিয়েছিলেন—যার জন্য কালারপোল যুদ্ধ হয়।

সেদিন রাত্রে দল ভেঙে সকলে ছড়িয়ে পড়ে। শুরু হয় অজ্ঞাতবাস ও আত্মগোপন।

৬ই মে। রাত্রের অন্ধকারে নদী পেরিয়ে এসেছিল দুইজন ইউরোপীয়ান ক্লাব ও কলোনি আক্রমণ করতে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ কয়েকজন গ্রাম্য মুসলমান তাদের দেখে ফেলে এবং সকলকে জানিয়ে দেয়।

গ্রামের মাতব্বররা বলে, মনে হয় ওরা স্বদেশী ডাকাত। পুলিশের হুকুম—অচেনা ছেলে দেখলেই থানায় খবর দেবার।

পুলিশ ও গোয়েন্দারা টের পায়। তারা সদলে আসে···

ছেলেরা পালাবার চেষ্টা করে—গ্রামবাসীরা ঘিরে ধরে—অনেক অনুনয় করা হয়, ভয় দেখানো হয়। নিজেদের দেশের লোককে হত্যা না করার নীতি দৃঢ়ভাবে গ্রহণ করার দুর্বলতার জন্য ছেলেরা মুশকিলে পড়ে। শেষে শূন্যে গুলিবর্ষণ করে কোন রকমে পথ করে তারা নদীর ঘাটে এসে পোঁছয়। পুলিশও এসে পৌছয় ইতিমধ্যে।

ছেলেরা একটি সাম্পান দখল করে। পিছনে দুটি সাম্পান নিয়ে পুলিশ তাদের তাড়া করে। তারা প্রাণপণে সাম্পান চালায়।

পুলিশের নৌকা হতে তাদের উপর গুলি বর্ষিত হয়। বিপ্লবীদের তরী তীরে ভেড়ে। তারা লাফিয়ে নেমে অন্ধকারে দৌড়য়।

কালারপোল গ্রাম—বদমাইস গুণ্ডাদের বাসস্থান বলেই গ্রামটি বিখ্যাত। স্বদেশীদের উপর গুণ্ডাদের বরাবরই রাগ ছিল; শক্তিমান স্বদেশীদের জন্য তারা অবাধ দৌরাত্ম্য করার সুযোগ পেত না। আজ তারা সুযোগ পেয়েছে শোধ তোলার।

গ্রামের লোকেরা দুদিক হতে ছেলেদের তাড়া করে। অনন্যোপায় হয়ে ছেলেরা গুলি চালায়। দু'একজন গ্রামবাসী মারাত্মক আহত হয়। ফণী নন্দী ও সুবোধ চৌধুরী ধরা পড়ে।

অন্য চারজন এক বাঁশঝাড়ের আড়ালে আত্মগোপন করে লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত হয়। পুলিশ পার্টি এসে পৌঁছয়। দু পক্ষের গুলি বর্ষণ শুরু হয়।

পুলিশ ইন্সপেক্টর চেঁচায়, Surrender!

ছেলেদের মধ্য হতে মনোরঞ্জন সেন জবাব দেয়, We know no surrender.

বুড়ি বালামের তীরের সংগ্রামী-বীর মনোরঞ্জনকে মনে পড়েযায়··· পুনর্জন্ম নিয়ে সে কি ফিরে এসেছে পুনরায় সংগ্রাম করতে?—আত্মসমর্পণ ওরা করবে না, শেষ নিশ্বাস পর্যন্ত ওরা লড়বে—অন্তরীক্ষে কি মৃত সহযোদ্ধারা এসে দাঁড়ায়, উৎসাহ দেয়? নইলে প্রাণ দেবার এ প্রেরণা ওরা পায় কোথা হতে?

কালারপোলের শহীদদের পুলিশ সহজেই সনাক্ত করতে পারে। তাঁরা হচ্ছেন স্বদেশ রায়, রজত সেন, দেবু গুপ্ত, মনোরঞ্জন সেন।

শুধু নামগুলি জানলেই তো এঁদের সম্বন্ধে সব কথা জানা হয় না—কত কাহিনী, কত ইতিহাস আছে এদের সঙ্গে জড়ানো—অল্প কথায় কেমন করে বলি? আবার না বলেও পারি না···

মনোরঞ্জন···বালেশ্বরে প্রাণ দিয়েছিল বীর জ্যোতীন মুখার্জির সঙ্গে—সূর্য সেনের সহচর রূপে আজ কালার পোলে শহীদ হলে!

আগামী কোন সংগ্রামে আবার কি দেখব তোমার বীরত্ব? আমরা যে জন্মান্তরবাদে বিশ্বাসী।

রজত···ধনীর ঘরের আদরের সন্তান। মা ঘরছাড়া ছেলের ফেরার পথ চেয়ে বসে আছেন। কিন্তু 'সে যে ফেরার পথ পেল না, মা, পেল না।'

দেবু···বন্ধু-বিচ্ছেদের বেদনা আর তোমায় সহ্য করতে হবে না। কিন্তু তোমার বিয়োগ বেদনা কি সহ্য করতে পারবে তোমার বিপ্লবী সহোদর কিশোর আনন্দ? স্নেহাতুরা মা? তেজস্বিনী ঠাকুরমা?

স্বদেশ···দেশের ডাক শুনে ছুটে এসেছিলে—কেউ তোমায় না ডাকলেও। প্রাণ দিয়ে প্রমাণ করলে স্বদেশের জন্য মহান মরণের গৌরব হতে কেউ তোমায় বঞ্চিত করতে পারবে না।

And when I'm with my comrades met,
Beneath the greenwood bough ;
What once we were we all forget,
Nor think what w' are now.
—Sir Walter Scot

চট্টগ্রামের কয়েকটি ছেলেকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে। কালারপোল গ্রামেও দুজন ধরা পড়েছে। তাদের বহু জেরা ও মারধোর করেও পুলিশ কোন কথা বের করতে পারে না। অবশেষে ওদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বয়ঃকনিষ্ঠ ফকির সেনকে এস. ডি. ও. নিজের বাংলোয় আনান স্বীকারোক্তি আদায় করার জন্য।

অফিসারের ড্রইংরুম। থানায় নির্যাতিত ছেলেটিকে একটি সোফায় বসিয়ে সমবেদনা ভরা কণ্ঠে অফিসার বলেন, ছিঃ, ছিঃ ! থানায় ওরা তোমায় এ রকম মেরেছে। ওরা মানুষ নয়।

ছেলেটি ক্ষুব্ধ ভাবে বলে, মায়াকান্নার দরকার নেই। আপনিও তো ঐ দলের।

বিশ্বাস করো আমার অজান্তে এসব ঐ বদমাইস দারোগার কীর্তি। ওকে আমি suspend করবো, দূর করে দেবো।

তিনি উচ্চকণ্ঠে নিজের মেয়েকে ডাকেন। পাশের ঘর হতে মেয়ে আসতেই বলেন, শিগ্‌গির খানিকটা তুলো, আয়ডিন আর ব্যাণ্ডেজ নিয়ে আয় তো।

অফিসারের মেয়ে নিজের হাতে ছেলেটির পিঠের ক্ষত স্থানগুলিতে আয়ডিন লাগিয়ে দেয়। সহানুভূতিসূচক স্বরে সে বলে ইস্‌! কী ভীষণ মেরেছে।

কোমল কণ্ঠস্বরের সমবেদনায় ছেলেটির মন ভিজে উঠে। এতক্ষণ যে অত্যাচার সে নীরবে সহ্য করেছে, এখন সে সম্বন্ধে সে সচেতন হয়ে উঠে বেশী করে। তার চোখের কোণে জল আসে।

অফিসার বলে চলেন, অবশ্য পুলিশের যেমন উচিত হয়নি তোমায় মারা, তেমনি তোমারও উচিত হয়নি এত অল্প বয়সে ঐ বিপ্লবীদের সঙ্গে মেশা। তুমি ভাল ছেলে, লেখাপড়া শিখবে, ভাল চাকরি করবে, ভাল ঘরে বিয়ে কররে। তা নয় কটা বন্দুক-রিভলভার নিয়ে জন পঞ্চাশ ছেলের সঙ্গে ইংরেজের সঙ্গে মারামারি করতে গিয়ে বেঘোরে প্রাণ দেওয়া। পাগলামিরও একটা সীমা থাকা চাই।

অফিসার নির্জনে ছেলেটিকে বলেন, তোমার কোন ভয় নেই। তুমি গোপনে আমার কাছে সব খুলে বলো। ওরা তোমার কেশাগ্র স্পর্শ করতে পারবে না। তোমায় আমি বাঁচাবো। আমি তোমায় বিলেত পাঠাবো, ভাল চাকরি করে দেবো।

Identification paradeএতে পুলিশ বোরখা পরিয়ে একজনকে আনে সনাক্তকরণ করার জন্য। সে ধীরে ধীরে দু একটি ছেলেকে অঙ্গুলি নির্দেশে দেখিয়ে দেয়।

একটি ছেলে গর্জে উঠে, তোকে শেষ কববো।

পুলিশ অফিসার বন্দীদেব ধমকান, Shut up!

বোরখাপরাজন সে স্থান হতে একটু পিছিয়ে এসে এক রেলিংয়ের উপর ভর দিয়ে দাঁড়ায় এক হাতে মাথা গুঁজে। সরকারী কর্মচারী এসে তার পিঠের উপর হাত রাখে, তাকে ইঙ্গিতে ডাকে। সে এবার দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে সনাক্তকরণ করে চলে।

বিপ্লবী ছেলেরা অফিসারের ধমক অগ্রাহ্য করে প্রশ্ন করে, কে তুই?

Who are you?

সনাক্তকারী আর আত্মগোপন করে থাকতে পারে না। এক টানে বোরখা খুলে কম্পিত স্বরে বলে, I am your coward friend !

ফকির অজ্ঞান হয়ে টলে পড়ে, তার স্নায়ুর উপর অত্যধিক চাপ পড়েছিল।

সন্ধ্যার অন্ধকারে অম্বিকা চক্রবর্তী এক গ্রামের মধ্যে প্রবেশ করেন। এক কুটীরের পিছনে এসে দাঁড়ান। আশ্রয় ভিক্ষা করার ইচ্ছা মনে আসে। ভিতরের কথা কানে ভেসে আসে।

লক্ষ্মীবার। গৃহস্থ বাড়িতে পূজা শেষে পুঁথি পাঠ হচ্ছে। অম্বিকা চক্রবর্তী অন্ধকারেই অপেক্ষা করেন।

পাঠশেষে প্রণাম কালে কানে এল তাদের প্রার্থনা—'মা লক্ষ্মী, সূর্য সেন, অনন্ত সিং ওদের বাঁচিয়ে রাখো। মা, ওরা কেউ যেন ধরা না পড়ে।'

দরিদ্র গৃহস্থ ঘরের বধূরা ধন ঐশ্বর্য প্রার্থনা করল না, অভাব-অভিযোগ জানাল না, সাংসারিক সুখশান্তি কিছুই চাইল না। দেবতার নিকট তাঁদের প্রাণভিক্ষা চাইল, যাঁদের কোন দিন চোখে দেখে নি, যাঁদের চেনে না, শুধু যাঁদের নাম আর কথা মাত্র শুনেছে। তাদের এই ব্যাকুলতা, এই মমতা অম্বিকা চক্রবর্তীর চোখে জল আনে।

চোখের জল মুছে তিনি অরণ্যের অন্ধকারে আত্মগোপন করেন। চোখের সামনে ভাসে মৃত্যুর বীভৎস নিষ্ঠুর রূপ আর গৃহ-দেবতার পদতলে লুণ্ঠিতা স্নেহময়ী নারীর বেদনাতুর কাতর প্রার্থনার ছবি। সেখানে আশ্রয় তিনি নিতে পারেন না। শুভানুধ্যায়ীদের সর্বনাশ কেমন করে ডেকে আনেন? পুলিশ টের পেলে শুরু হবে জুলুম, জরিমানা, শাসন ও নির্যাতন।

নদীর ধারে চার-পাঁচটি গুর্খা মিলিটারি বসে বিড়ি ও গাঁজা খাচ্ছে। পলাতক অম্বিকা চক্রবর্তী হঠাৎ তাদের নজরে পড়ে যান। তাদের মধ্যে একজন যে বিড়ি খাচ্ছিল, সে হাঁক মেরে উঠে দাঁড়ায়—এই শালা! কিধার যাতা?

অম্বিকা চক্রবর্তী দাঁড়াতে বাধ্য হন।

শালা, জান্‌তা নেহি কার্ফু হ্যয়?

হাম নেহি জানতা।

তুম বুড়বাক হ্যয়।

জি, হাঁ।

দূর থেকে উপবিষ্ট মিলিটারিদের একজন প্রশ্ন করে, কেয়া হুয়া?

এক শালাকো পাকড়া। উয়ো বোলতা হ্যায় উয়ে শালা বুড়বাক হ্যয়।

মিলিটারিগুলো হো হো করে হেসে উঠে।

দুচার লাথ লাগা দো শালাকো।

মিলিটারিটা একটা লাথি মেরে বলে, বলো শালা, কেয়া নাম তুম্‌রা? কোন হ্যয় তুম?

হাম নাপিত হ্যয়।

রাস্তামে কাঁহে বাহার হুয়া?

মেরা আওরাৎকা লেড়কা হোগা। দাই বোলানে যাতা—

নেহি জানতা কার্ফু হ্যয়।

দূর থেকে একজন বলে, আরে ছোড় দো—শালা দেহাতি বুদ্ধু হ্যয়।

গাঁজার নেশায় মশগুল একজন বুদ্ধি দেয়, শালাকো লাথ লাগা কর দরিয়ামে ফিঁক দেও।

গুর্খাটি লাথি মেরে অম্বিকা চক্রবর্তীকে নদীতে ফেলে দিয়ে বলে, যা শালা! ভাগ্‌!

তিনি জলে পড়ে সাঁতার কাটেন।

গণেশ ঘোষের কিশোর সঙ্গী দুটি আর দৌড়তে পারে না।

মাখন বলে, বড় জল তেষ্টা পেয়েছে, গণেশদা।

আনন্দও জানায় তৃষ্ণায় গলা জিভ সব শুকিয়ে গেছে।

এখানে জল কোথায় পাবো ?

তেষ্টায় ছাতি ফেটে যাচ্ছে।

বিপ্লবীদের অত কাতর হতে নেই। জ্বর গায়ে দুর্বল শরীরে আমি দৌড়াচ্ছি কি করে ?

তুমি পাবো, গণেশদা। কিন্তু আমরা পারি না।

জল না খেলে আর চলতে পারছি না।

মাখন-আনন্দ বসে পড়ে। গণেশ ঘোষ হতাশ ভাবে বলেন, তোদের তেষ্টা পেয়েছে সে কি আমি বুঝি না। আমার নিজেরই দম বন্ধ হয়ে আসছে তেষ্টায়। নিজের শির কেটে তোদের রক্ত দিতে পারি, কিন্তু জল দিই কোথা থেকে।

জল না পেলে আমরা মারা যাবো, গণেশদা।

আচ্ছা, তোরা এখান থেকে কোথাও যাস নি। আমি চারদিক খুঁজে দেখি।

নিঃসঙ্গ পথিক অনন্ত সিং ক্ষুধা তৃষ্ণায় মুহ্যমান হয়ে পড়েন। মনে হয় যেন বহু যুগ কিছু খান নি, অন্নের আস্বাদ ভুলে গেছেন। পেটের মধ্যে এক যন্ত্রণা যেন পাক খেয়ে খেয়ে উঠছে। কার আধখাওয়া, কাকে ঠোকরান, এক আধপাকা আম পথে পড়ে থাকতে দেখেন, তাই অমৃত পানের আগ্রহ নিয়ে ভক্ষণ করেন। ক্ষুধা-তৃষ্ণা তাতে দূর হয়নি, বরং বেড়ে গেছে।

দূরে ক্ষেতের মধ্যে এক চাষাকে লাঙল দিতে দেখেন। পাগলরূপী অনন্ত সিং তার কাছে গিয়ে, এ্যাঁও এ্যাঁও করে মুখে শব্দ করেন এবং আকার-ইঙ্গিতে বোঝান ক্ষুধার্ত ও তৃষ্ণার্ত। চাষা তাঁকে ইঙ্গিতে

বসতে বলে একটা তরমুজ ক্ষেত হতে তুলে আনে। অনন্ত সিং রাক্ষসের মত তরমুজে কামড় মারেন। হাঁ হাঁ করে খান, গাময় মাখেন, কিছুটা নষ্ট করেন। পাগলের অভিনয় তাঁকে পুরাপুরি করতে হয়।

জঙ্গলের মধ্যে হাত দুয়েক চওড়া এক জায়গায় অল্প বৃষ্টির জল জমে আছে। কিন্তু সে জল অত্যন্ত অপরিষ্কার! আশপাশের গাছের পাতা সেই জলে পড়ে পচছে—ঘন কৃষ্ণবর্ণ জল।

তৃষ্ণার্ত গণেশ ঘোষ সেই জলের কাছে এসে ইতস্ততঃ করেন। শেষে স্বাস্থ্যের নীতি তৃষ্ণার কাছে হার মানে। দীর্ঘশ্বাস ফেলে উবু হয়ে বসে আজলা ভরে সেই জল তুলে মুখের কাছে আনেন।

চোখের সামনে ভেসে উঠে মাখন-আনন্দের তৃষ্ণার্ত মুখ। কানে যেন আসে কাতর কণ্ঠ, গণেশদা, একটু জল!

কিশোর সঙ্গীদের ফেলে প্রথমে জল পান করতে তাঁর মন চায় না। হাতের জল আঙুলের ফাঁক দিয়ে টপ টপ করে পড়ে যায়। কিন্তু পরক্ষণেই বিচারবুদ্ধি জেগে উঠে। বোঝেন নিজে প্রথমে পান করে তৃষ্ণা দূর না করলে সঙ্গীদের কাছে ফিরে জলের সন্ধান জানানো সম্ভব না হতেও পারে।

আঁজলা আঁজলা জল তিনি খান। দু হাতে মুখে চোখে ছিটান।

গ্রাম্য পথ দিয়ে পাগল বেশী অনন্ত সিং চলেন। হঠাৎ কোথা হতে একপাল ছেলে এসে তাঁর পিছু নেয়। নানা রকম চীৎকার, ছড়া আর হাততালি দিতে দিতে তারা তাঁকে তাড়া করে

এই পাগলা, তোর বাড়ি কোথা?

এই পাগলা—পয়সা নিবি?

পাগল না ছাগল, মাথায় ঢালো ঘোল!

এক খাবলা মাটি নিয়ে একজন অনন্ত সিংয়ের গায়ে ছুঁড়ে মারে।

এরকম উৎপাতের সম্ভাবনা তিনি কল্পনাও করেন নি। ঘুরে দাঁড়িয়ে গর্জন করেন—এ্যাঁও!

এঃ! পাগলার আবার তেজ দেখো—যেন অনন্ত সিং! একটি কিশোর বলে।

অনন্ত সিংয়ের গল্প সবাই শুনেছে—মনে মনে আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা তাঁকে শ্রদ্ধা করে। কিন্তু সত্যিকারের মানুষটির আজ লাঞ্ছনার অন্ত নেই। ভাগ্যবিধাতা সত্যি রসিকপুরুষ।

বিপন্ন অনন্ত সিংয়ের অবস্থা এক বালিকার মনে দয়ার উদ্রেক করে। সে ধমক দিয়ে ছেলেদের থামিয়ে দেয়। কিছু আহার্য আনে, কিন্তু পাগলের কাছে এসে দিতে সাহস করে না। যাহোক, তার করুণা ক্ষুধার্ত, তৃষ্ণার্ত ও বিব্রত অনন্ত সিংয়ের অন্তর স্পর্শ করে।

আর এক গ্রামে অনন্ত সিং এক বর্ধিষ্ণু চাষীর বাড়ি আহার্য প্রার্থনা করেন। চাষী তাঁকে সাগ্রহে খেতে দেয়। সবল অনন্ত সিংকে তার খুব ভাল লাগে, চাকর হিসাবে রাখার তার ইচ্ছা হয়—দেখে মনে হয় ক্ষেতের কাজে খাটতে ভালই পাবে।

চাকরি করবি? দিব্বি তো জোয়ান চেহারা—

পাগল কথা কানে তোলে না। অনন্ত সিং মনে মনে হয়তো হেসেছিলেন—মুক্তির উপাসক শেষে গোলাম গ্রহণ করবে? মন্দ কি! এখনকার মত নিশ্চিন্ত নির্ভর জীবনযাত্রা—দায়িত্বহীন জীবিকা—অলস স্বপ্নমাখা সময়—শান্ত নিরুদ্বেগ জীবন—শান্তিভরা মরণ……

আরে, ও ব্যাটারা কখনো চাকরি করে? না খেয়ে মরবে তবু চাকরি করবে না। মোড়লের গৃহে উপস্থিত গ্রাম্য এক ব্যক্তি বলে পাগলকে নিরুত্তর দেখে।

চুল ছেঁটেছে দেখো—যেন ইংরিজি পড়া বাবু!

মনোযোগ দিয়ে একজন এতক্ষণ লক্ষ্য করছিল, এবার সে মন্তব্য করে, তোমরা যাই বলো—আমার মনে হচ্ছে ও একটা গোয়েন্দা।

পাগল আপন মনেই হাসে।

এক জায়গায় কীর্তনের আসর বসেছে।

দূর থেকে দেখতে পেয়ে আনন্দ বলে, গণেশদা ওখানে চলুন। যদি কিছু খেতে পাওয়া যায়।

মাখন বলে, অন্তত দুটো বাতাসাও তো পাওয়া যাবে।

তাঁরা এসে আসরের একধারে বসেন, কীর্তন চলে।

কয়েকজন লোকের দৃষ্টি এদের দিকে আকৃষ্ট হয়। তারা বাররার এদের দিকে চায়, আর ফিস ফিস করে নিজেদের মধ্যে কিছু বলাবলি করে। গণেশ ঘোষ তাদের আচরণ লক্ষ্য করে মাখন-আনন্দকে উঠতে ইঙ্গিত করেন। তাঁরা উঠে আসর ত্যাগ করতে যাবেন, এমন সময় একজন এসে প্রশ্ন করে, কর্তার বাড়ি কোথায়?

এই তো কাছেই।

কোন গাঁয়ে?

পাশের গাঁয়ে।

মিথ্যে কথা! তোমাদের কোনদিন দেখিনি।

দেখো নি তো আমি কি কববো। সে তোমার দোষ।

আরও লোক জোটে।

কি হয়েছে বে?

এই লোকটা বলছে পাশেব গাঁয়ে থাকে।

তাই না কি?

মিথ্যে কথার আর জায়গা পায় নি?

পাশের গাঁয়ে থাকে? বলুক তো পূব কোন দিকটা।

সরল গ্রামবাসীর বাঁকা বুদ্ধিব প্যাঁচ! সকলেই সানন্দে সমর্থন করে।

হ্যাঁ, হ্যাঁ, বলুক পূব কোন দিকটা—

দেখি কেমন পাশের গাঁয়ের লোক—

বল না হে!

গণেশ ঘোষ এবার একটু মুশকিলে পড়েন। তিনি চকিতে চারিদিক চেয়ে নেন। অন্ধকার মেঘলা রাত্রে দিক নির্ণয় সহজ নয়। তবু তিনি একদিক দেখিয়ে বলেন—যদি আন্দাজে মিলে যায়—পূব তো ঐ দিকটা।

লোকগুলি হো হো করে হেসে উঠে।

ব্যাটা, মিথ্যেবাদী, জোচ্চোর।

ছেলে দুটোকে কোত্থেকে ভুলিয়ে ধরে এনেছে।

মারো শালাকে—পুলিশে দাও।

মাখন রুখে দাঁড়ায়। খবরদার! আমাদের পিসেমশাইয়ের সঙ্গে লেগো না। ভাল হবে না।

গণেশ ঘোষ বলেন, দাঁড়াও। থানায় যাচ্ছি। আমাদের মারপিট করার ভয় দেখিয়োছো বলে দেবো।

আনন্দ জীবনকে নিয়ে তিনি অগ্রসর হন।

একজন পিছন থেকে চেঁচিয়ে বলে, থানাটা ঐ দিকে নয় কর্তা—পূব দিকে।

গণেশ ঘোষ মাখন আনন্দ এক নির্জন গাছতলায় পোষাক পরিবর্তন করেন। লুঙি ও ফেজ পরে মুসলমান সাজেন। গণেশ ঘোষ বলেন, টিকিধারী বুড়ো ব্রাহ্মণের অভিনয় শেষ হলো—এবার মুসলমান। আমার নাম বছিরুদ্দী, তোর নাম ইব্রাহিম, আর তোর নাম করিম—ঢাকায় বাড়ি।

তারপর তাঁরা স্টেশনে যান। গণেশ ঘোষ টিকিট কিনতে যান। বুকিং অফিসের আলোয় টুপীর নীচে দিয়ে তাঁর টিকি দেখা যায়। মাখন দেখতে পেয়ে তাড়াতাড়ি তাঁর হাত ধরে আড়ালে টেনে আনে।

কি হয়েছে?

তোমার টুপির টিকির পাশে নিজের টিকি দেখা যাচ্ছে।

সর্বনাশ! কাট্, কাট্, শিগগির কাট্।

গণেশ ঘোষ নীচু হয়ে ঘাড় বাঁকান। মাখন তার টিকি টেনে ধরে। আনন্দ পকেট হতে ছুরি বের করে ঘ্যাস ঘ্যাস্ করে কাটে।

ট্রেন থেকে এরা তিনজনে নামেন এক স্টেশনে।

গণেশ ঘোষ বলেন, গেট দিয়ে নয়, ইয়ার্ড পেরিয়ে পালানো যাক্।

তাঁরা ইয়ার্ড দিয়ে চলেন। একটু দূরে একটা সেলুন দাঁড়িয়েছিল এবং এক গোরা মিলিটারি সেখানে পাহারা দিচ্ছিল।

সে হাঁকে—Halt!

ছেলেরা গণেশের মুখের দিকে চায়। তিনি বলেন, সর্বনাশ, এখন পালানো চলে না।

Where are you going?

গণেশ ঘোষ হিন্দী বাংলা ও ইংরেজি মিশিয়ে বোকার মত সাহেবকে বোঝাবার চেষ্টা করেন, We sir—দেহাতী লোক।

What?

We village আদমি sir. This বাচ্ছা tell মামাবাড়ি go. I tell পোস্টাফিস go and this short রাস্তা।

সেলুনের দরজায় সিঁড়ির উপর এক মিলিটারি অফিসার এসে দাঁড়ায়। সে জিজ্ঞাসা করে, What? Are they making short cut through the yard?

Most probably.

গণেশ ঘোষ বলেন, Yes sir! This short রাস্তা, জলদি go.

Keep out.

Thank you, sir. Very good Sir. ' দে, দে—সাহেবকে সেলাম দে! Little boy, sir. Don't know, sir. তাড়াতড়ি চল···চল···

খানিকটা দূর গিয়ে গণেশ সঙ্গীসহ ঘুরে দাঁড়িয়ে আবার সেলাম করেন এবং ছেলেদের নিয়ে পালান।

রাস্তায় হকার হাঁকে—স্টেট্‌সম্যান! স্টেট্‌সম্যান! গণেশ ঘোষ, অনন্ত সিং, সূর্য সেনকে ধরলে টাকা মিলবে। জোর খবর!

ছেলে মানুষ আনন্দ বায়না ধরে, গণেশদা, কিনুন—একটা কিনুন! দেখি কি লিখ্‌ছে।

গণেশ ডাকেন, এই কাগজ!

কাগজওয়ালা ফিরে দেখে। তারপর অবজ্ঞা ভরে বলে, স্টেট্‌সম্যান তুমি কি পড়বে, মিঞা!

গণেশ ঘোষ সামলে নেন,—ওঃ, ইংরিজি? আমি ভেবেছিলাম বাংলা কাগজ।

বিপ্লবীদের এক গুপ্ত আস্তানায় একদিন খবর আসে অম্বিকা চক্রবর্তী বেঁচে আছেন। খবরটা প্রথমে কেউই বিশ্বাস করে না। অম্বিকা এদের সঙ্গে সংযোগ স্থাপনের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করেন—লোক পাঠান—সাঙ্কেতিক লিপি পাঠান। সূর্য সেনের সন্দেহ দূর হয়।

একজন তবু বলে, মরা মানুষ বেঁচে উঠে এও কি সম্ভব?

অম্বিকাদার পক্ষে সম্ভব। পটাসিয়াম সায়ানাইড খেয়েও তিনি বেঁচে ছিলেন। এবারও সত্যি করে মরেন নি—

সে কি! গভর্ণমেণ্ট তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। আত্মীয়-স্বজন পর্যন্ত শ্রাদ্ধ করেছে তাঁর।

গভর্ণমেণ্ট ভুল করেছে। তাড়াতাড়িতে বাসী শবদেহগুলি ভাল করে সনাক্ত করতে পারেনি। তাছাড়া মতি বা অর্ধেন্দু মরার আগে শেষ জবানবন্দীতে অম্বিকাদাকে মৃতের পর্যায়ে ফেলেছে, হয়তো জ্ঞাতসারেই তাকে পুলিশের হাত হতে বাঁচাবার জন্য।

মাস্টারদা বলেন, আমার বিশ্বাস দেশ স্বাধীন হওয়ার আগে

অম্বিকাবাবু কিছুতেই মরতে পারেন না। তিনি জন্মেছেন দেশ স্বাধীন করার জন্য—রাজনীতি তাঁর মজ্জাগত।

মাস্টারদা গিয়ে অম্বিকা চক্রবর্তীর সঙ্গে সাক্ষাতের সঙ্কল্প করেন।

ছেলেরা আপত্তি করে। কিন্তু এ খবরটা পুলিশের চালাকিও হতে পারে। খবর পেয়ে দেখা করতে গেলে ঐ জায়গায় আপনাকে ধরবে।

দূর পাগল! পুলিশ যদি খবর পাঠাতো, তাহলে ওখানে ধরার জন্য অনর্থক ফাঁদ পাতবে কেন? সরাসরি এখানে আসতো।

তাহলে আপনি সত্যি যাবেন, অম্বিকাদাকে দেখতে।

হ্যাঁ।

নির্মল সেন বলেন, পুলিশের সাধ্য হবে না ছদ্মবেশধারী আপনাকে ধরার।

অন্ধকার এক পুকুরের পাড়ে টর্চ ও রিভলবার হাতে অম্বিকা চক্রবর্তী অপেক্ষা করেন। বৈরাগীর বেশে সূর্য সেন আসেন—সঙ্গের সাথী সশস্ত্র দেহরক্ষী। দু পক্ষেই সতর্কতার অভাব নেই। আলোর সঙ্কেতে সন্দেহ দূর হয়—পরস্পরকে চিনতে পারেন। দৌড়ে এসে দুই বন্ধু আলিঙ্গনাবদ্ধ হন। আনন্দে তাঁরা কি বলবেন খুঁজে পান না।

অম্বিকাবাবু—আপনি—আপনি বেঁচে আছেন?

সূর্যবাবু, আপনি এসেছেন—সত্যি এসেছেন!

গণেশ ঘোষ মাখন-আনন্দকে বলেন, আর আমাদের একসঙ্গে থাকা চলে না।

কিন্তু অসুস্থ আপনাকে ছেড়ে আমরা যাবো না, গণেশদা।

অবুঝ হস্‌নি। ধরা পড়লে তিনজনে একসঙ্গে পড়বো। আলাদা আলাদা থাকলে বিপদ অনেক কম। তাছাড়া ধরা পড়লে আমার

ফাঁসি হবে, সেজন্য আমি সহজে ধরা দেবো না। ধরতে এলে লড়াই করে মরবো। তোরা ছোট ছেলে, তোদের সাজা কম হবে। তোরা কেন মিছামিছি আমার সঙ্গে লড়ে মরতে যাবি ?

আপনার পাশে দাঁড়িয়েই আমরা মরবো।

ছেলেমানুষী করিস নি। আমার কথা শোন।

না।

না ? গণেশ ঘোষ রেগে উঠেন। আমার আ [illegible] ামরা চলে যাও।

আপনাকে ছেড়ে যাবো না।

কি ? যাবি না ? গণেশ ঘোষ রিভলবার বের করেন। আদেশ অমান্য করার শাস্তি জানিস ?

ছেলে দুটি মুখে কিছু বলে না, কিন্তু তাদের চোখ ছলছল করে।

As a superior I command—surrender your arms !

ছেলে দুটি রিভলভার বের করে। গণেশ ঘোষ এক ঝট্‌কায় তাদের হাত হতে অস্ত্র কেড়ে নিয়ে পকেটে রাখেন। তারপর আদেশ দেন—Get away !

ছেলে দুটির চোখ দিয়ে দর দর করে জল পড়ে। অশ্রুরুদ্ধ অভিমানভরা কণ্ঠে মাখন বলে, We will obey your order.

তারপর তারা দুজন নীচু হয়ে গণেশকে শেষ প্রণাম করতে আসে।

আসন্ন বিচ্ছেদ গণেশ ঘোষেরও চোখে জল আনে। রিভলভার ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে তিনি তাদের বুকে টেনে নেন। সস্নেহে তাদের মাথায় হাত বুলতে বুলতে বলেন, তোদের ছাড়তে কি আমারও কষ্ট হয় না? হয়। কিন্তু কি করবো বল ? বিপ্লবী জীবনের এই অভিশাপ —স্নেহ-মায়া-মমতার স্থান নেই। যদি ধরা না পড়ি, যদি বেঁচে থাকি, আবার দেখা হবে। তোমরা লুকিয়ে কলকাতায় যাওয়ার চেষ্টা কর। আমিও সেখানে যাবো।

ছেলেদের বিদায় দিয়ে এক স্টেশন প্ল্যাটফর্মে গণেশ ঘোষ অপেক্ষা

করেন ট্রেনের জন্য। মনটা তার ভাল নেই, গভীর চিন্তায় মগ্ন। এমন সময় এক বাচ্ছা পান-বিড়িওয়ালা তাঁর কাছে আসে।

সিগারেট ম্যাচিস ?

গণেশ ঘোষ ঘাড় নাড়েন।

ছেলেটি সকাতরে অনুনয় ক'রে, নিন না, বাবু! স্বদেশী ওয়ালাদের জন্য কিছু বিক্রি হয়নি সারাদিন। খেতে পাবো না।

গণেশ পকেট হতে একটি সিকি বের করে দেন। ছেলেটি এক প্যাকেট সিগারেট ও দেশলাই দেয়। গণেশ ঘোষ অন্যমনস্ক ভাবে একটি সিগারেট ধরান।

হঠাৎ এক যুবক কোথা হতে তার সামনে আসে। মশাই, আপনি কি করছেন ?

গণেশ ঘোষ চমকে উঠে প্রশ্ন করেন, কেন ?

কেন ? জিজ্ঞাসা করতে লজ্জা হচ্ছে না ? আপনাদের জন্যই তো আজ দেশের এই দুর্দশা।

আপনার কথা ঠিক বুঝতে পারছি না।

মাথায় আপনার কিছু নেই। কংগ্রেসের নাম শুনেছেন ?

গণেশ ঘোষ অজ্ঞের মত মাথা নাড়েন। তাকে জ্ঞান দানে বিজ্ঞ করার জন্য যুবকটি রীতিমত বক্তৃতা শুরু করে—

এ দেশ থেকে ইংরেজকে তাড়াবার ব্রত নিয়েছে কংগ্রেস, বিলাতী দ্রব্য বর্জনের নির্দেশ দিয়েছে। এর জন্য কত লোক কারাবরণ করছে, নির্যাতিত হচ্ছে। চট্টগ্রামের কংগ্রেস কর্মীরা—বীর বিপ্লবীরা সশস্ত্র অভ্যুত্থান করেছে বৃটিশের বিরুদ্ধে। আর আপনি তাঁদেরই মুখে চুন-কালি মাখাচ্ছেন—ঐ সিগারেট টেনে।

এতক্ষণে ব্যাপারটা একটু পরিষ্কার হয়। গণেশ ঘোষ মজা দেখার জন্য বোকার মত হেসে প্রশ্ন করেন, তাই না কি ?

অনন্ত সিং, গণেশ ঘোষ এদের নাম শুনেছেন ?

তিনি ঘাড় নাড়েন।

তা শুনবেন কেন? ওদিকে জর্জ দি ফিফ্থের চোদ্দপুরুষের নাম জানা আছে।

কি করেছে তারা?

কি করেছে? দেখে আসুন—ফেণী স্টেশন তারা বোমা মেরে উড়িয়ে দিয়েছে পুলিশ তাদের ওখানে ধরেছিল বলে।

সাংঘাতিক লোক তো!

তারা হচ্ছে খাঁটি দেশপ্রেমিক। আপনার মত নয়।

গণেশ ঘোষের সিগারেট শেষ হয়ে আসায় সেটা ফেলে দেন।

যুবকটি সঙ্গে সঙ্গে লাফিয়ে উঠে বলে, এই তো—এই তো, আপনার মধ্যে দেশাত্মবোধ জাগ্ছে। সিগারেট ফেলে দিয়েছেন। আজ হতে আপনিও আমাদের ভাই, বন্দে মাতরম্—

চেঁচাবেন না, এক্ষুণি পুলিশে ধরবে।

বন্দে মাতরম বলতে আপনি ভয় পান? জানেন মুখে এই slogan আর হাতে loaded gun নিয়ে ওরা চট্টগ্রামে লড়েছে। ভয় কি—, আপনিও আমার সঙ্গে বলুন—বন্দে—

আপনি চেঁচান, আমি চল্লাম। গণেশ ঘোষ একটু দূরে সরে যান, জায়গাটায় মজা দেখার জন্য ক্রমশঃ ভিড় জমে উঠছে।

ভীতু কোথাকার! এ দেশ আবার স্বাধীন হবে।

ট্রেন এলে গণেশ একটি কামরায় উঠে পড়েন। উৎসাহী যুবকটি তাঁর পিছু ছাড়ে না। তাঁর মধ্যে ভাল করে দেশাত্মবোধ না জাগিয়ে সে ছাড়বে না। যুবকটির সঙ্গ বিপজ্জনক, বিরক্তিকর ও হাস্যকর হলেও শেষ পর্যন্ত শাপে বর স্বরূপ হয়ে গণেশ ঘোষকে বাঁচায়।

মধ্যবর্তী এক স্টেশনে এক আবগারী জমাদার গণেশ ঘোষের পুঁটলির উপর নজর দিলে যুবকটি তাকে ধমকে গণেশকে উদ্ধার করেন—মিছিমিছি কেন মানুষকে হায়রানি করো। নিরীহ ভাল লোক এ—একি চোরাই মালের কারবার করে যে ধরতে এসেছো?

গণেশ ঘোষ বেঁচে যান।

ট্রেন নৈহাটিতে এলে তিনি নেমে পড়েন। শেয়ালদায় নিশ্চয় গোয়েন্দাদের শ্যেন দৃষ্টি আছে।

কোন রকমে কলকাতায় পৌঁছে এক ট্যাক্সি নেন। কিন্তু যাবেন কোথায়? আশ্রয় কোথায়? কে আছে?

এ পথে সে পথে ঘুরে বেড়ান,—গাড়ি বদলান। হঠাৎ এক মোড়ে পরিচিত একজন নজরে পড়ে। নেমে কাছে যান। সে ব্যক্তি প্রকাশ্য দিবালোকে জনাকীর্ণ শহরের রাজপথে ভূত দেখলে যতটা চমকে উঠতেন, গণেশকে দেখে তার থেকে কম চমকান না। বলেন, আমার দোকানে যাও, আমি যাচ্ছি।

গণেশ ঘোষ দোকানে এসে দেখেন বন্ধ। রবিবার। রাস্তার উপর অপেক্ষা করা চলে না, যে কোন মুহূর্তে ধরা পড়বেন। তাঁকে ধরার জন্য ইতিমধ্যে পাঁচ হাজার টাকা পুরস্কার ঘোষিত হয়েছে—কাগজে কাগজে ছবি বেরিয়ে গেছে।

মনে পড়ে একজনের কথা। কিন্তু তাঁর উপরও তো পুলিশের কড়া নজর। দিনে দুবার তাঁর বাসস্থল তল্লাস হয়। তবু তাঁর কাছেই চলেন। তিনি বিপ্লবীদের সার্বজনীন স্নেহময় দাদা।

গাড়ি থেকে লাফিয়ে নেমে এক দৌড়ে দোতলায় উঠেন। ঘরের মধ্যে তক্তাপোশে শুয়ে এক ব্যক্তি কাগজ পড়ছিলেন। পদশব্দে কাগজ নামিয়ে আগন্তুকের দিকে চান। তারপর তাড়াতাড়ি উঠে গণেশ ঘোষকে বুকে টেনে নেন।

তিনি বিপ্লবী নেতা কিরণ মুখার্জি।

অবশেষে এক জায়গায় সুবিধা বুঝে অনন্ত সিং মুখ খোলেন। লাঙল কাঁধে বলদ নিয়ে ক্ষেতে চলেছে এক চাষী। দেখে ভাল মানুষ বলেই মনে হয়।

অনন্ত সিং ডাকেন—শোনো, শোনো ভাই!

চাষী মুখ ফিরিয়ে দেখে।

আমি বড় বিপদে পড়েছি। তুমি আমায় সাহায্য করতে পারো?

চাষী কোন কথা বলে না।

অনন্ত আবার বলেন, স্বদেশী করার জন্য পুলিশ আমার পিছু নিয়েছে—আমি আশ্রয় চাই।

চাষীটি পথ চলা শুরু করে। অনন্ত ডেকে বলেন, চলে যেও না। আমার সব কথা এখনো বলা হয় নি।

চাষী রুক্ষ স্বরে, আইয়ো, আইয়ো, আমার গরু যায় গিয়া।

অনন্ত তাকে অনুসরণ করেন। চলতে চলতে সব কথা খুলে বলেন।

সে শুধু একবার জিজ্ঞাসা করে, তা পুলিশকে তুমি মারলে কেন?

অনন্ত তাকে কারণগুলি জানান। সব শুনে অবশেষে সে রাজী হয় অনন্ত সিংয়ের প্রস্তাবে। তাঁকে নিজের বাড়ী নিয়ে যায়।

কুমিল্লার উদ্দেশ্যে অনন্ত সিং রওনা হন চাষীটিকে সাথী করে। তাকে শিখিয়ে দেন পথে কেউ জিজ্ঞাসা করলে জানাবে তিনি বোবা ও কালা, তার আত্মীয় এবং অসুস্থ। চিকিৎসার জন্য কুমিল্লা রওনা হয়েছে তারা।

পথে অন্য এক পরিচিতের প্ররোচনায় চাষীটি অনন্ত সিংয়ের সব টাকা কড়ি—যা তার কাছে গচ্ছিত রাখা হয়েছিল—নিয়ে সরে পড়ে। যাহোক অনন্ত সিং কোন রকমে কুমিল্লায় আসেন এবং সেখান হতে পরিচিত ব্যক্তিদের সাহায্যে সোজা কলকাতায়।

"স্ফুলিঙ্গ তার পাখায় পেল
ক্ষণকালের ছন্দ।
উড়ে গিয়ে ফুরিয়ে গেল,
সেই তারি আনন্দ॥"

প্রেসিডেন্সি কলেজ হোস্টেলে সন্ত্রাসবাসীদলের একটি ছেলে ছিল দ্বিপ্রহরে নির্জন ছাত্রাবাসে ছেলেটির ঘরে গণেশ ঘোষের বিশ্রামের ব্যবস্থা হয়। বাইরে অবশ্য পাহারা থাকে, যদি হঠাৎ পুলিশ কোন ক্রমে সন্ধান পেয়ে আসে তো সতর্ক করে দেবে।

পলাতক জীবনের দারুণ দুশ্চিন্তার মধ্যে একটুখানি এই বিশ্রামের সুযোগ গণেশ ঘোষের মনে স্বাচ্ছন্দ্যোর ভাব আনে। তা বলে অলসভাবে নিক্রিয় হয়ে সময় অপব্যয় করা বিপ্লবীর ধাতে নেই। তিনি রিভলভারটি বের করে তার অংশ বিশেষ খুলে টেবিলের উপর রেখে পরিষ্কার করা শুরু করেন। বিশ্বাসী রক্ষাকর্তা প্রিয় সাথীটি কর্মক্ষম আছে কিনা পরীক্ষা করেন। হাতের কাজের সঙ্গে সঙ্গে মৃদু কণ্ঠে আপন মনে রবীন্দ্রনাথের কবিতা আবৃত্তি করেন।

পাশের ঘরে কে যেন তার বন্ধুকে প্রশ্ন করে,—এই কলেজ যাস্‌নি কেন?

গণেশ আবৃত্তি বন্ধ করে কান পাতেন। তিনি আশা করেন নি পাশের ঘরে কেউ আছে।

পাশের ঘরের ব্যক্তির দ্বিতীয় প্রশ্ন কানে আসে, কি রে জবাব দিচ্ছিস না যে?

কার উদ্দেশ্যে বলছে, তা অনুমান করার আগেই নীচু পার্টিশন

ওয়ালের উপর ভেসে উঠে একটি মুখ। বোঝা যায় পাশের ঘরের ছাত্রটি মনে করেছে তার বন্ধু কলেজ পালিয়ে ঘরে আছে এবং প্রশ্নের পর জবাব না পাওয়ায় স্বাভাবিক কারণে সে টেবিলের উপর উঠে দাঁড়ায়। তাড়াতাড়ি তখন আর গণেশ ঘোষের পক্ষে রিভলভার লুকান সম্ভব নয়। তিনি সংযত কণ্ঠে তাকে কিছু বলতে যান। কিন্তু ছাত্রটি এই অদ্ভুত আগন্তুককে অস্বাভাবিক অবস্থায় দেখে ভয়ে বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে যান। কাঁপতে কাঁপাত পার্টিশন ওয়ালের উপর হতে সরে যায়।

গণেশ ঘোষ তাড়াতাড়ি ঘরের বাইরে আসেন। পাহারা রত ছেলেটিকে ডেকে বলেন, শীঘ্র একটা গাড়ি ডেকে আনো!

দাদাদের আদেশ আপনাকে এখানে লুকিয়ে রাখবার।

এখানে আর লুকিয়ে থাকা চলে না। পাশের ঘরের একটি ছেলে হঠাৎ আমায় দেখে ফেলেছে। আমার আদেশ শিগ্‌গির ট্যাক্সি আনো।

গণেশ ঘোষের নিশ্চিন্তে আর বিশ্রাম করা হলো না। আবার পথে বের হতে হয় অনির্দিষ্ট আশ্রয়ের সন্ধানে।

অনন্ত সিং কলকাতায় এসে বিপ্লবীদের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করেন। তাঁকে ধরিয়ে দেবার জন্য প্রচুর পুরস্কার ঘোষিত থাকা সত্ত্বেও প্রকাশ্য রাজপথে তিনি নির্ভয়ে ঘুরতেন। অনন্ত সিং জানতেন তাঁকে হঠাৎ পথে দেখে কেউ ধরতে সাহস করবে না। এর আগে নাগারখানার লড়াইয়ের পর হাওড়ায় তাঁয় আত্মগোপন কালে যে ইন্সপেক্টর তাঁকে ধরেছিল তাকে বিদায় নিতে হয় পৃথিবী হতে। অবশ্য এর জন্য তাঁর বন্ধু প্রমোদের ফাঁসি হয়।

অবশেষে খিদিরপুরের এক বস্তিতে এক দরিদ্র দম্পতির আশ্রয়ে অনন্ত-গণেশের থাকার ব্যবস্থা হয়। আশ্রয়দাতার তরুণী স্ত্রীর সঙ্গে এঁরা কাকীমা সম্পর্ক পাতান। অনাত্মীয় অপরিচিত গৃহহীন

বিপ্লবীদের দুর্দিনে তিনি নিজগুণে আপন জন করে নেন। মাতৃসমা তাঁর কথা এঁরা কোন দিনই ভুলবেন না।

দরিদ্র ভদ্রঘরের অল্পবয়স্ক স্বল্প শিক্ষিতা বধূ, নারী-সান্নিধ্য-ভীরু বিপ্লবীরা তাঁর কাছে কিন্তু স্বচ্ছন্দে প্রাণ খুলে কথা বলতে পারেন! তাঁর সহজ সরল আচার ব্যবহার এদের লজ্জা ও জড়তা দূর করে। কত দিনের কত কথার মধুর স্মৃতি আজও মনে পড়ে…

আমরা কে জানেন?

না।

পুলিশ আমাদের খুঁজছে।

তা জানি! আপনারা স্বদেশী।

স্বদেশীর ভিতর যে বিভিন্ন শ্রেণীর লোক আছে তা তিনি জানেন না। সন্ত্রাসবাদী, সুবিধাবাদী, অহিংসপন্থী, সত্যাগ্রহী সবই তাঁর কাছে সমান।

গণেশ ঘোষ পরিহাসচ্ছলে হয়তো বলেন, আমরা কিন্তু খুনে স্বদেশী।

ইস্! আপনারা কেন খুনে হবেন। আপনারা তো খুব ভালমানুষ।

তাঁর সরল কথাবার্তা শুনে এঁরা একটু হাসেন। পুলিশ আমাদের ধরলে কি হবে জানেন?

জেল?

না। ফাঁসি!

শুনে তিনি চমকে উঠেন। দেশের এমন ছেলেরা ইংরেজের কাছে এতো ভয়ঙ্কর। এদের না মারলে দেশে শান্তি নেই। মন বিশ্বাস করতে চায় না।…

অনন্ত সিং অত্যন্ত অসুস্থ হয়ে পড়েন। কাকীমা শুশ্রূষার ত্রুটি করেন না। কত বিনিদ্র রজনী অসুস্থ বিপ্লবীর শিয়রে বসে কাটান। মার মত মন প্রাণ দিয়ে সেবা যত্নে তাঁকে সারিয়ে তোলার চেষ্টা

করেন। কিন্তু শুধু সেবা-যত্নে তো অসুখ সারে না, চিকিৎসা ও ওষুধের প্রয়োজন হয়। বস্তির মধ্যে অনন্তকে ওরকম ভাবে রাখলে হয়তো শেষ পর্যন্ত বাঁচানো যাবে না। গণেশ কলকাতায় দলীয় দাদাদের কাছে অনন্তর অবস্থা জানিয়ে সুব্যবস্থার জন্য অনুরোধ করেন।

শেষে বরানগরে এক বাগান বাড়িতে এঁদের বাসের ব্যবস্থা হয় এবং ভগবানের কৃপায় অনন্ত সিংয়ের জ্বরটাও ছাড়ে।

দুর্বল অনন্তকে নিয়ে ট্যাক্সি করে গণেশ বরানগরে আসেন। কিন্তু বাসস্থান দেখে অনন্তর মেজাজ বিগড়ে যায়। এক মান্ধাতার আমলের ভাঙা পড়ো ভূতের বাড়িতে তাঁদের বাসের ব্যবস্থা হয়েছে। অনন্ত এখানে কোন মতে থাকতে রাজী হন না।

গণেশ, কোন পলাতক লোকের এ বাড়িতে থাকা উচিত নয়। পড়ো বাড়ির বাসিন্দাদের উপর পাড়া-প্রতিবেশীদের বিশেষ নজর এবং শেষ পর্যন্ত তার ফল কি হবে জানো ?

সে কথা ঠিক। তাছাড়া গণেশ ঘোষ বোঝেন সদ্য নিউমোনিয়া হতে উঠা অনন্তলালকে স্যাঁৎসেঁতে ঘরের মেঝেয় দিনরাত শুইয়ে রাখা মানে রোগকে আবার ডেকে আনা।

অগত্যা সেই গাড়িতেই আবার তাঁরা কলকাতায় ফিরে চলেন। পথে খাবারের দোকান দেখে অনন্ত সিংয়ের ক্ষুধা পায়।

গণেশ, আমি সন্দেশ খাবো।

না, না, সবে রোগ থেকে উঠেছো, এখন দোকানের বাজে বাসি জিনিস খায় না।

হুঁ, বাজে জিনিস ? কত দিন ভাল জিনিস খাইনি। বড্ড খিদে পেয়েছে।

ও দুষ্টু খিদে। লোভ সংযত করো।

বেশ গুরুমশাইয়ের মত কথা বলছো ! ঐ আর একটা দোকান—

উঁ হুঁ ! দোকানে গেলেই সবাই চিনে ফেলবে। টাকার লোভে পুলিশে ধরিয়ে দেবে।

ইস্!

গাড়ি আবার একটা দোকানের কাছাকাছি এলেই অনন্তলাল ড্রাইভারকে বলেন, রোখো!

গণেশ ঘোষ কিছু বলবার বা বাধা দেবার আগেই তিনি ঝপ করে গাড়ি থেকে নেমে দোকানে ঢোকেন। কয়েক মিনিট পরে এক চাঙারি নিমকি, সিঙাড়া, সন্দেশ, রসগোল্লা, জিলিপি ইত্যাদি কিনে তিনি গাড়িতে ফিরে আসেন।

গাড়ি চলা শুরু করে এবং গণেশ ঘোষ অনন্তলালের খাবার লুঠ করা শুরু করেন।

একি! একি! তুমি খাচ্ছ কেন—দোকানের বাজে বাসি জিনিস।

সেইজন্যই—তোমার ভালর জন্যই—বেশী খেয়ে পাছে তোমার অসুখ করে তাই কমিয়ে দিচ্ছি,—বলে গণেশ ঘোষ হেসে উঠেন।

অনন্তলাল বন্ধুর উপর রাগ করে হেসে ফেলেন।

ইতিমধ্যে মাখন-আনন্দ কলকাতায় আসে। কলকাতার বিপ্লবীরা চট্টগ্রামের এঁদের এক জায়গায় রাখার চেষ্টা করেন।

বিপ্লবী সুহাসিনী গাঙ্গুলির কাছে একদিন একজন এসে এক চিঠি দেয়। চিঠির উপর তিনি একবার চোখ বুলিয়ে শুধু প্রশ্ন করেন, কোথায় যেতে হবে? কতদিনের জন্য?

জানি না। তবে ইংরেজের রাজত্বের বাইরে। পলাতক বিপ্লবীদের আশ্রয় দিতে হবে। দাদারা সব ব্যবস্থা করে দেবেন ছদ্মভাবে থাকার।

চন্দননগরে শশধর আচার্য ও সুহাসিনী গাঙ্গুলি (পুঁটুদি) স্বামী-স্ত্রী রূপে বাস শুরু করেন এক বাড়ি ভাড়া নিয়ে। তাঁদেরই আশ্রয়ে সম্পূর্ণ গোপনে বিপ্লবীদের লুকিয়ে থাকার ব্যবস্থা হয়। দলের দাদারা

নকল দম্পতিকে জানান না এঁরা চট্রগ্রামের বিপ্লবী এবং তাঁদেরও জানান না যে এঁরা সত্যি স্বামী-স্ত্রী নন, বিপ্লবী। সাবধানতা ও দূরদর্শিতা পরস্পরের নিকট পরিচয় গোপন রাখার কারণ।

বলা বাহুল্য এঁরা সকলেই ছদ্মনামে পরিচিত ছিলেন। অবশ্য মাঝে মাঝে সম্পূর্ণ অজান্তে তাঁদের মিথ্যা পরিচয়ের মুখোস খুলে পড়ে। শত সাবধানতা সত্ত্বেও মানুষ সর্বদা আত্মগোপন করে থাকতে পারে না।

একদিন বিপ্লবী নেতা ভূপেন দত্ত এসেছেন এঁদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে। তাঁর কথোপকথন কালে গণেশ ঘোষ হঠাৎ চট্টগ্রাম জেলার প্রচলিত এক শব্দ ব্যবহার করে ফেলেন। তারপর তাড়াতাড়ি সে কথা ঢাকতে গিয়ে তিনি এমন একটি শব্দ ব্যবহার করলেন যাতে পুঁটুদির মনে প্রথমে যে সন্দেহ হয়েছিল তা বিশ্বাসে পরিণত হল যে বক্তার বাড়ি চট্টগ্রামে। পুঁটুদি চট্টগ্রামে বহুদিন ছিলেন, চট্টগ্রামের নেতা নৃপেন বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভগ্নী তিনি।

পুঁটুদির ঘরকন্না বা রান্নাবান্না সম্বন্ধে বিশেষ অভিজ্ঞতা ছিল না। এঁদের জন্য তিনি যে সাজান সংসার পেতেছেন, তা সুন্দর ভাবে চালাবার জন্য তাঁকে রান্না শেখা শুরু করতে হয়। কলকাতায় এসে মাঝে মাঝে এক বন্ধুর কাছে রান্না শেখেন।

একদিন চিংড়ি মাছের মালাইকারি শেখাবার কালে বন্ধু—তিনি আবার অনন্ত সিংয়ের আত্মীয়া—বলেন, অনন্তদা খুব ভালবাসতেন এটি।

অনন্ত সিং, গণেশ ঘোষ তখন বাংলার ঘরে ঘরে রূপকথার নায়ক। তাই তাঁদের সম্বন্ধে জানার জন্য পুঁটুদি প্রশ্ন করেন, তোমার অনন্তদা আর কি ভালবাসতেন?

তিনি কয়েকটি খাদ্যদ্রব্যের নাম করেন।

হঠাৎ পুঁটুদির খেয়াল হয় তাঁর বাড়িতে যে চারজন আছে, তাদের মধ্যে একজন ঠিক ঐ জিনিসগুলিই ভালবাসে।

মজা হয় একদিন। আনন্দর দিদি ছিলেন পুঁটুদির সহপাঠী ও বন্ধু। সেদিন কলকাতা হতে ফিরে পুঁটুদি এদের কাছে গল্প করেন—বহুদিন পরে এক বন্ধুর সঙ্গে দেখা হওয়ার কথা। বন্ধুর পরিচয় দিলে ঘরছাড়া পলাতক কিশোর আনন্দ সাগ্রহে প্রশ্ন করে ফেলে, ছোড়দি আর কি বল্লে?

এদিকে বিপ্লবীদের মনেও সন্দেহ হয়। একদিন উপরে বসে গল্প করছেন, শশধরবাবু এসে বলেন, খাবার দেওয়া হয়েছে। দিদি সকলকে ডাকছেন।

দিদি! আপনারও দিদি?

শশধরবাবু সামলে নেন, না—আপনাদের দিদি mean করেছি।

সব চেয়ে মুশকিল পুঁটুদির। ঘরে বাইরে সকলের বিন্দুমাত্র সন্দেহের কারণ উদ্রেক না করে তাঁকে চলতে হয়। প্রতিবেশীরা সবাই জানে বাড়ির বাসিন্দা মাত্র দুজন—স্বামী-স্ত্রী। লুক্কায়িত বিপ্লবীদের আহার্যের সংস্থান গোপনে করতে হয়। স্থানীয় দোকান হতে চাল-ডাল কিনলে পরিমাণ মুদির সন্দেহ উদ্রেক করবে, আবার সব সামগ্রী বাহিরের থেকেও কিনে আনা চলে না। ছোট খাট বহু অসুবিধা ও বিপদের সম্মুখীন তাঁকে হতে হয়। যেমন—

জেলেনী বাড়িতে মাছ বিক্রি করতে এসে প্রশ্ন করে, হ্যাঁ মা, লোক তো তোমরা দুজন। এত মাছ রাখছো?

সরল জেলেনীর স্বাভাবিক কৌতূহল নিবৃত্ত করতে পুঁটুদি বলেন, আমরা বাঙাল দেশের মানুষ কিনা, তাই একটু মাছ বেশী খাই।

প্রতিদিন রান্নার পর পুঁটুদিকে হেঁসেলের হাঁড়ি কুড়ি দুভাগে ভাগ করে রাখতে হয়। যদি পুলিশ কোন ক্রমে সন্ধান পেয়ে এসে ধরে তখন প্রমাণ করা যাবে যে আশ্রয়দাতারা ও পলাতকরা পরস্পরের পরি..ত বা ঘনিষ্ঠ নয়। স্বামী-স্ত্রী শুধু এদের ঘর ভাড়া দিয়েছে, আশ্রয় দেয় নি।

ঘর-সংসারের কাজও বিপ্লবীরা ভাগ করে নেন। পুঁটুদিকে

সকালেই বেরুতে হয় তাঁর স্কুলের কাজে, শশধরবাবুকেও ডিউটিতে। কাজেই বিপ্লবীদের জানা না থাকলেও গৃহস্থালীর কাজে লাগতে হয়। গণেশ ঘোষ অত্যন্ত ভাল মানুষ। ভাল মানুষদেরই বেশী বিপদ, সেজন্য সর্বাপেক্ষা শক্ত কাজ তাঁর উপর পড়ে—মশলা পেশা। রান্নাঘরের কোণে মহা উৎসাহে গণেশ ঘোষ বাটনা বাটার ব্যায়াম করেন এবং হয়তো মনে মনে ভাবেন এই দুরূহ কাজ মেয়েরা কি করে সহজে করে। মশলা পেশাই কি প্রমাণিত করে মেয়েরা শক্তিরূপিনী?

অনন্ত সিং সবে অসুখ থেকে উঠেছেন। দুর্বল দেহ, তবু কাজ তিনি করবেনই। ভাতের ফেন গালার কাজটাই তাঁকে দেওয়া হয় অনেক ভেবে চিন্তে। দৈহিক অজুহাতে একবারে কিছু করতে না দিলে রেগে যাবেন, অভিমান করে বসবেন ছেলেমানুষের মত। অসুখের জন্য দেহের ন্যায় মনও হয়তো দুর্বল হয়ে গেছে।

ফেন গালার গুরু দায়িত্বই তিনি মহা উৎসাহে গ্রহণ করেন। ভাত চাপানর সাথে সাথেই তিনি উপর থেকে নেমে আসেন ফেন গালার জন্য। দেরি আছে শুনে রান্নাঘরের বাইরে এসে অপেক্ষা কবেন। কিন্তু অত্যন্ত ব্যস্ত মানুষ তিনি। সময়ের এক মিনিট অপব্যয় তিনি সহ্য করতে পারেন না এবং কোন কাজের ভার পেলে তা সুষ্ঠু ভাবে শেষ না হওয়া পর্যন্ত নিশ্চিন্ত হন না। ফলে প্রতি পাঁচ মিনিট অন্তর হাঁড়ির ঢাকা খুলে দেখতে হয় ভাত হতে কত দেরি। কাজ করার জন্য অনন্ত সিংয়ের অতি ব্যস্ততা অন্যের অস্বস্তির কারণ হয়।

অনাত্মীয়দের এই ছোট সংসারে মাখন ছিল পুঁটুদির দক্ষিণ হস্ত স্বরূপ। প্রত্যেকের ছোট খাট প্রয়োজনের দিকে তার দৃষ্টি, অন্যের সম্বন্ধে সচেতনতা ছিল মাখনের মনে খুব বেশী। পুঁটুদির কোনদিন সামান্য একটু শরীর খারাপ হলে মাখনের সতর্ক দৃষ্টিকে ফাঁকি দিয়ে কাজ করতে পারতেন না। পুঁটুদিও মাখনকে অত্যন্ত স্নেহ করেন, মা-ছাড়া ছেলের মায়ের স্থান তিনি পূরণ করেন।

অজ্ঞাতবাসের গণ্ডীবদ্ধ জীবনে আনন্দের অভাব হয় না। কিশোর আনন্দকে নিয়ে এঁরা মাঝে মাঝে মজা করেন। যেমন একদিন বেলা প্রায় তিনটের সময় পুঁটুদি এসে দেখেন গ্রীষ্মের কাঠ-ফাটা রৌদ্রে আনন্দ তেল মেখে বসে আছে। তার গৌরবর্ণ রোদ্রে রক্তিম হয়ে উঠেছে।

পুঁটুদি প্রশ্ন করেন, এ রকম ভাবে রোদে বসে কেন? অসুখ করবে যে।

আনন্দ প্রথমে কিছু বলে না। শেষে পুঁটুদির পীড়াপীড়িতে জবাব দেয়, কালো হবার চেষ্টা করছি।

সে কি! কেন?

ছদ্মবেশ ধরলেও পালাবার সময় আমার গায়ের রংঙের জন্য ধরা-পড়্বো।

এবার ব্যাপারটা পুঁটুদির কাছে বোধগম্য হয়। তিনি এসে এঁদের বকেন, সুন্দর চেহারার জন্য তোমরা কেন ওকে মিছেমিছি ক্ষেপাও!

ক্ষেপাই নি তো। বলেছি ওর ঐ ফুটফুটে চেহারার জন্য ও সঙ্গে থাকায় আমরা কতবার সন্দেহের কারণ হয়েছি। আমাদের কেমন চাষাভুষো যা সাজি মানায়, অথচ ওকে মানায় না।

না মানাক। তা বলে ও কষ্ট করে কুৎসিত হবে? পুঁটুদি আনন্দকে বলেন, তুমি ভাই ওদের কথায় কান দিও না। ওরা তোমায় হিংসা করে।

সকলে হো হো করে হেসে উঠেন।

পুঁটুদি গম্ভীর ভাবে বলেন, ও ধরা পড়্লে সবাই অন্ততঃ জানবে যে ফুলের মত সুন্দর কিশোর পর্যন্ত বিপ্লবের আগুনে ঝাঁপ দিয়েছে স্বাধীনতার জন্য।

ছেলে মানুষ আনন্দ ভীষণ ঘুম-কাতুরে। সন্ধ্যার পর সে আর চোখ না বুজে থাকতে পারে না। রান্না না হওয়া পর্যন্ত চুপচাপ

জেগে বসে থাকা তার পক্ষে সম্ভব নয়। দাদারা সময় কাটাবার জন্য শশধর বাবুর সঙ্গে দাবার ছক নিয়ে বসেন,—সংগ্রামী অনন্ত, গণেশ বৃটিশ রাজাকে পরাজিত করার অদম্য আকাঙ্ক্ষা আপাততঃ দাবার সসৈন্য রাজাকে ধ্বংস করার মধ্যে মিটিয়ে একটু আনন্দ আহরণের চেষ্টা করেন। মাখন নিযুক্ত থাকে রন্ধনরত পুঁটুদির সাহায্য। বেচারা আনন্দ! একা আর কি করবে ঘুমান ছাড়া?

রান্না শেষে পুঁটুদি সকলকে ডাকেন। এরা দাবার ছক তোলার সাথে সাথে আনন্দকেও ডেকে তোলেন। আনন্দ চোখ রগড়াতে রগড়াতে উঠে বসে, টলতে টলতে এঁদের পিছু নেয়। এঁরা হুড়মুড় করে সিঁড়ি দিয়ে নামেন, আর আনন্দ সিঁড়ির উপর বসে ফের ঘুমে ঢুলে পড়ে।

পুঁটুদি এদের বলেন, নিজেরা সব খাবার নাম শুনে হুড়োহুড়ি করে দৌড়ে এলেন, আর ছোট ছেলেটাকে তুলে আনতে পারলে না?

অতুল ওরফে গণেশ ঘোষ বলেন, তাকে তো ডেকে তুলে দিলাম, আমাদের সঙ্গেই তো নামছিল।

অশোক ওরফে মাখন বলে, তাহলে আবার শুয়ে পড়েছে সিঁড়িতেই।

আমি দেখছি, সুরেন ওরফে অনন্ত সিং বলেন এবং তাড়াতাড়ি উপরে উঠে গিয়ে আনন্দকে নিয়ে আসেন।

সমবয়সী অশোক একটু ভারিক্কী চালে আনন্দকে বলে, বাব্বা! কী ঘুম তোর।

আনন্দকে রাগাবার জন্য গণেশ ঘোষ বলেন ব্যঙ্গ স্বরে, উনি আবার বিপ্লবী—স্বাধীনতার সতর্ক সৈনিক! অতন্দ্র প্রহরী! ঘুমিয়েই কাৎ—

সর্বক্ষণ সর্ববিষয়ে সতর্ক অনন্ত সিং উপদেশ দেন, বিপ্লবীদের অতো নিদ্রালু হলে চলে না। মনে করো পুলিশ যদি হঠাৎ বাড়ি ঘেরে, তখন সব চেয়ে মুশকিল হবে তোমার। আমরা বড় জোর তোমায়

চুপিসারে একবার ডাকবো, তারপর পালাবার ব্যাপারে ব্যস্ত হবো।

অতুল বলে, কেন? ওকেও কোলে করে নিয়ে পালাবো। এক হাতে ও, আর এক হাতে রিভলভার।

সকলে হেসে উঠেন। আনন্দ রেগে বলে, আমার জন্য কারুকে ভাবতে হবে না। পুলিশ আমায় ধরে রাখতে পারবে না, যেমন ফেণীতে পারে নি।

ফেণীর নাম হঠাৎ আনন্দর মুখে উচ্চারিত হওয়ায় বিপ্লবীরা পরস্পরের মধ্যে চকিতে একবার দৃষ্টি বিনিময় করেন। তাড়াতাড়ি কথাটা চাপা দেবার জন্য মাখন বলে, ওর আগে কি রকম ঘুম ছিল জানেন? ও জানতো চেঁচিয়ে পাড়াশুদ্ধ লোকের ঘুম ভাঙালেও ওকে জাগানো যাবে না। তাই রাত্রে ওকে যদি আমাদের ডাকার দরকার হতো, সেজন্য নিজের পায়ে দড়ি বেঁধে জান্‌লা দিয়ে ঝুলিয়ে দিতো, আমরা এসে সেই দড়ি টেনে ওকে তুলতাম।

সকলে আবার হেসে উঠেন। গণেশ ঘোষ বলেন, ঐ পায়ের দড়ি না শেষে গলার দড়ি হয়।

সকলের হাসি-ঠাট্টা আনন্দর অসহ্য হয়, রাগ করে ভাত ফেলে উঠে পড়ে। দুম্‌ দুম্‌ করে উপরে গিয়ে আবার ঘুমিয়ে পড়ে। সে না খেয়ে উঠে যাওয়ায় পুঁটুদির মন ব্যথিত হয়ে উঠে। তিনি বলেন কেন তোমরা ওকে রাগিয়ে দিলে? আমার এ বাড়া ভাত আমি নষ্ট হতে দেবো না। যেমন করে পারো—

এবার পুঁটুদিকে রাগাবার জন্য গণেশ ঘোষ নিজের থালা শেষ করে আনন্দব থালা টেনে নিয়ে খেতে আরম্ভ করে।

থাক্‌। তোমায় আর কষ্ট করে খেতে হবে না।

এ ভাত তো আমি নষ্ট হতে দিতে পারি না।

গপ্‌ গপ্‌ করে গণেশ ঘোষ সেই ভাত গেলা শুরু করেন। তাঁর

ওই কষ্ট করে খাওয়া দেখে পুঁটুদি ব্যথিত হন, মনে মনে ভাবেন ভাত নষ্ট হওয়ার কথা বলে অন্যায় করেছি।

দিন কাটে একঘেঁয়ে ভাবেই। এরকম ভাব গৃহকোণে বন্দী হয়ে থাকতে বিপ্লবীদের আর ভাল লাগে না। লড়া আর মরা ছিল তাঁদের উদ্দেশ্য, তার বদলে কিনা এই অলস জড়ের জীবনযাপন। অবশ্য মনকে তাঁরা সান্ত্বনা দেন যে এ সাময়িক, লড়বার সময় হলেই আবার লড়বেন। অর্জুনকেও তো অজ্ঞাতবাস করতে হয়েছিল!

অনন্ত সিংকে প্রায়ই অন্যমনস্ক দেখা যায়। সব সময়ে যেন কি চিন্তা করেন। হঠাৎ একদিন তিনি পুলিশের ইন্সপেক্টর জেনারেল লোম্যান সাহেবকে এক চিঠি লিখেন।

Dear Mr. Lowman,

I shall meet you on the 28th June 1930, It is sure that you will never miss that opportunity to arrest me then and there. Yes, I am also quite ready for it. Never think it, please, that I am going to surrender. When does a person surrender ? When he becomes quite helpless and finds no other means to protect him, then only does he yield.

Am I helpless now ? No, certainly not. I have arms to protect me ; ample money to spend in time of need ; many helpers to help me ; and good many shelters in Bengal, outside Bengal as well as outside India to abscond. Now I am absconding with my friends and we are quite safe. But still I am allowing my arrest and why ? Do you think I am repentant

for any of my action ? No, never, not a bit sorry. Then is it a mandate on me from any authority ? No—it is my personal matter and alsolutely private.

I am,
Revolutionary,
Ananta Lal Singh.

প্রিয় মিঃ লোম্যান,

১৯৩০ সালের ২৮শে জুন আমি তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করব। এটা ঠিক যে আমাকে গ্রেপ্তার করার সে সুযোগ তুমি হারাবে না। আমিও তার জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত। মনে করো না যে আমি আত্মসমর্পণ করছি।

লোকে কখন আত্মসমর্পণ করে? যখন সে একান্ত অসহায় বা আত্মরক্ষার কোন পথ পায় না, তখনই সে নত হয়।

আমি কি এখন অসহায়? না, কখনই না। আমার আত্মরক্ষার অস্ত্র আছে, খরচ করার মতো প্রচুর অর্থ আছে, সহায়তা করার মতো লোকও আছে। বাংলা, বাংলার বাহিরে বা ভারতের বাহিরে থাকবার মতো আশ্রয়ও আছে। বর্তমানে আমি আমার বন্ধুদের সঙ্গে আত্মগোপন করে আছি এবং সম্পূর্ণ নিরাপদেই আছি। তবু যে ধরা দিচ্ছি তার কারণ কি? তুমি ভাবছ আমার কাজের জন্য আমি অনুতপ্ত?

না, কখনই না। আমি একবিন্দু দুঃখিত নই।

তবে কি উপর থেকে আমার উপর কোন আদেশ এসেছে?

না, এটা আমার ব্যক্তিগত ব্যাপার এবং সম্পূর্ণ গোপনীয়।

বিপ্লবী অনন্তলাল সিং

ইলসিয়াম রোতে গোয়েন্দা অফিসের সামনে এসে দাঁড়ান অনন্ত সিং। তাঁর পরনের কাপড় মালকোছা দেওয়া, গায়ে এক ওপ্‌ন্‌ব্রেস্ট কোট, চোখে রঙিন চশমা, মাথার চুল ছোট করে ছাঁটা।

স্লিপ লিখে পাঠান—Ananta Singh wishes to see Deputy Commissioner, Intelligence Branch.

দারোয়ান স্লিপ নিয়ে ভিতরে এক অফিসারের হাতে দেয়। লেখাটা পড়ে তিনি তড়াক করে লাফিয় উঠেন। তাড়াতাড়ি প্রশ্ন করেন, কাঁহা?

বাহারমে হ্যয়।

তিনি বিকট স্বরে চীৎকার করে উঠেন, ফটক বন্ধ্‌ করো! ফটক বন্ধ্‌ করো! জল্‌দি! জল্‌দি!

ঢং ঢং করে পাগলা ঘন্টি বেজে উঠে। বাইরে পাহারারত সান্ত্রীরা তাড়াতাড়ি লোহার ফটক বন্ধ করে দেয়।

রাস্তায় সাধারণ বেশে যে গুপ্তচরেরা পাহারা দিচ্ছিল, দূরে বসেছিল, তারা ছুটে আসে। অনন্ত সিংয়ের আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করে। তিনি তাদের দিকে ভ্রূক্ষেপ করেন না।

আপনি কি চান?

তাতে আপনার দরকার?

আম্‌তা-আম্‌তা করে গোয়েন্দাটি জবাব দেয়, না—এই—এমনি বলছিলাম।

একজন জিজ্ঞাসা করে, আপনি কারও সঙ্গে দেখা করতে চান?

হ্যাঁ।

কার সঙ্গে?

যাকে দরকার তার কাছে স্লিপ পাঠিয়েছি।

ও!

আর একজন বলে, আপনার নাম?

কেন?

এমনি জিজ্ঞাসা করছি।

আমার নাম অনন্ত সিং।

ভূত দেখার মত তারা আঁৎকে উঠে। চোখ বিস্ফারিত হয়, ঠোঁট ঝুলে পড়ে।

ওরে বাবারে—বোমা! বলে একজন প্রাণপণে দৌড় মারে।

অন্যজনেরা তার অনুসরণ করে। রাস্তা ফাঁকা হয়ে যায়।

ভিতরে চীৎকার উঠে—বোমা! বোমা! বিপ্লবীরা আক্রমণ করেছে।

চার-পাঁচজন ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে আসে। কথা কানে আসে—

কোথায়? কোথায়?

শুধু একা অনন্ত সিং এসেছে।

নিশ্চয় বোমা-পিস্তল নিয়ে এসেছে।

পালাও! পালাও!

ফোর্ট উইলিয়ামে ফোন করো।

লালবাজারে খবর দাও।

কেন এসেছে? কি চায়?

Thorough search করার পর ঢুকতে দিও।

নীচের দরজা খুলে একটা মোটর সাঁ করে বেরিয়ে যায়। একটু দূরে গিয়ে থামে। তার ভিতর হতে কয়েকজন নেমে অনন্ত সিংয়ের পিছনে অস্ত্র উদ্যত করে। দরজার ফাঁক হতে ভয়ে ভয়ে একজন বলে, আপনি ভেতরে আসুন!

অনন্তলাল মৃদু হেসে ভিতরে প্রবেশ করেন। দুহাত সামনে বাড়িয়ে দেন—আমি ধরা দিতে এসেছি।

তাঁর হাতে হাতকড়া পরাতে কেউ সাহস করে না। কিন্তু কয়েকজন এগিয়ে আসে ডান হাতে রিভলভার ধরে বাঁ হাতে তাঁকে সার্চ করতে। তারা তাঁর পকেট, বুক, পিঠ, কোমর তন্ন তন্ন করে তল্লাস করে।

অনন্ত সিং হেসে বলেন, ভয়ের কিছু নেই। আমি নিরস্ত্র।

সিঁড়ি দিয়ে উঠার কালে সর্বক্ষণ তারা ওঁকে সার্চ করে চলে।

তাঁকে রায় বাহাদুর নলিনী মজুমদারের সামনে হাজির করা হয়। মজুমদারের বাঁ হাত টেবিলের তলায় রিভালভার ধরে থাকে।

Do you dare come here ?

অনন্ত সিং স্মিত হাস্যে বলেন, Whom shall I be afraid of ?

মজুমদার বোঝেন শত্রু সামান্য নন, তাঁকে যথোপযুক্ত সম্মান দেওয়া কর্তব্য।

Take your seat.

Thank you ! চেয়ারটা সশব্দে টেনে অনন্ত সিং বসেন। তখন গোয়েন্দারা আবার তল্লাস শুরু করেন। অনন্তলাল বিরক্ত হয়ে বলেন, Why do you tease me ? I have come here to surrender and not to shoot any body.

মজুমদার জিজ্ঞাসা করেন, Then you repent for your acts now ?

গম্ভীর কণ্ঠে অনন্ত সিং জবাব দেন, Certainly not. What I did, I did deliberatly.

ইতিমধ্যে লোম্যান আসে। রায় বাহাদুর পরিচয় করিয়ে দেন।

Here is Ananta Singh.

So glad to meet you. সাহেব করমর্দনের জন্য হাত বাড়িয়ে দেয়।

I can't shake hands with oppressors of my countrymen.

Well, youngman ! Are we oppressive ?

Certainly. We haven't forgot Jawallinwallabagh so soon

আই. বি. অফিস হতে সশস্ত্র পাহারায় অনন্ত সিংকে লালবাজারের ইউরোপীয়ান ওয়ার্ডে এনে রাখা হয়।

অনন্ত সিংয়ের আত্মসমর্পণ এক অভাবনীয় ব্যাপার। খবরের কাগজের বিশেষ সংখ্যা বের হয়। রাস্তায় হকার হাঁকে—অনন্ত সিংকা পাত্তা মিলা! জোর খবর!

সারা শহরে চাঞ্চল্য জাগে। সবার মুখে একই প্রসঙ্গ। এমন কি নিষ্কর্মা বেকারদের তাসের আড্ডায় খবর পৌঁছয়।

একটি ছেলে ঢুকে বলে, অনন্ত সিং ধরা পড়েছে।

হাতের তাস ফেলে একজন উঠে দাঁড়িয়ে তার গালে এক চড় মারে—ইডিয়ট্! ধরা পড়েছে নয়, ধরা দিয়েছেন।

ইন্দুমতী সিং সেদিন এসেছিলেন লোম্যানের সঙ্গে দেখা করতে। তিনি তখনও জানেন না অনন্তলাল ধরা দিয়েছেন। বিনা বিচারে পুলিশ তাঁর পিতা গোলাপ সিং ও দাদা নন্দলাল সিংকে আটক করে রেখেছে, তিনি সেই সম্বন্ধেই কথা বলেন···

Why have you detained my old father? He was not connected with the Armoury raid in any way.

I know your brother was the leader. By the by, do you like to see him?

Please, don't try to be funny.

Ananta Singh is our guest now. If you don't believe, come with me and see yourself.

সেলের মধ্যে এক ক্যাম্প খাটে অনন্ত সিং শুয়ে আছেন। হঠাৎ লোম্যানের সঙ্গে তাঁর দিদি আসেন।

অনন্তলাল! অনন্ত—

দিদি। অনন্ত সিং উঠে বসেন।

একি সত্যি তুই, না, আমি স্বপ্ন দেখছি?

কেন, দিদি?

আমরা যে কোন দিনই কল্পনা করিনি তুই ধরা পড়বি। সবাই জানতাম পুলিশ তোকে পেলেও জীবিত পাবে না, বড় জোর পাবে তোর মৃতদেহ।

অনন্তলাল পরিহাস তরল কণ্ঠে বলেন, আমার মৃত্যু তাহলে তোমরা কামনা করতে দিদি?

মৃত্যু কামনা করতাম না। কামনা করতাম আমার ভাই যেন কোন দিন ফাঁসি কাঠে না মরে, বরং সে যেন বীরের মত লড়তে লড়তে মরে।

কিন্তু এ পথই আমায় বেছে নিতে হলো, দিদি।

কেন? কি জন্য?

রহস্যময় হাসি হেসে অনন্ত সিং বলেন, আজ নাই বা শুনলে।

সেলে অনন্ত সিংকে গোয়েন্দাদের প্রশ্নবাণের সম্মুখীন হতে হয়।

বলুন না আপনি কেন ধরা দিলেন? নিশ্চয় আপনার কোন উদ্দেশ্য আছে।

অনন্তলাল নীরব থাকেন।

যারা জবানবন্দী দিয়েছে আপনি তাদের মেরে ফেলার চেষ্টা করবেন?

অনন্ত সিং হেসে উঠেন, বলেন, আমি তো বন্দী।

আপনার অসাধ্য কিছু নেই।

যান! আমায় বিরক্ত করবেন না।

সে চলে যায়। যাবার সময় ফিস্ ফিস্ করে প্রহরীকে কি বলে যায়। এবার প্রবেশ করেন এক পৌঢ় ব্যক্তি।

কি, এবার আপনি বিরক্ত করতে এলেন?

তিনি অন্তরঙ্গ হবার চেষ্টা করেন। বলেন, বিরক্ত নয়, বাবা তুমি আমার ছেলের মত তাই কয়েকটা দামী কথা তোমায় বলতে এলাম।

বলি মাথার উপর একজন আছেন, এ কথা মানো তো? এই যে খুন-খারাপী, লুঠ-তরাজ এ যে কত বড় খারাপ কাজ তা বোঝো তো? পাপপুণ্যের বিচারে—

দেখুন, মাঝ রাতে ধর্মোপদেশ শুনতে চাই না। আপনার দামী কথা অন্যকে শোনান গে।

না, বলছিলাম কি—যারা স্বীকারোক্তি করেছে তাদের মেরে—

কারুকে আমি মারতে চাই না। যার যা ইচ্ছা করুক এবং অদৃষ্টে যা আছে ঘটুক।

বেশ! বেশ! তা তুমি ক্লান্ত দেখছি, আবার শুনলাম অসুস্থ—তা এবার নিশ্চিন্তে বিশ্রাম করো।

অনন্তলাল বিরক্ত হয়ে বলেন, ধন্যবাদ! যাবার সময় পরের জনকে বলে দিবেন আপনি. কতটা কথা বের করলেন, যাতে তার প্রশ্নের সুবিধা হয়।

পরের জন এসে অনন্ত সিংয়ের পাশে বেশ করে জাঁকিয়ে বসে বলে, দেখি আপনার হাতটা?

অনন্ত একটু অবাক হন। হাত?

হ্যাঁ। বলে হাতটা নিজেই সে টেনে নেয়, মনোযোগ দিয়ে দেখে। তারপর বেদবাক্যের মত ঘোষণা করে, আপনার ফাঁসি কিছুতেই হবে না।

শুনে সুখী হলাম, কপট গাম্ভীর্যভরে অনন্তলাল বলেন।

নিশ্চয়ই! এ আপনার হস্তলিপি। তাছাড়া বড় সাহেবরা সব তো আপনার হাতের মুঠোয়। একবার অনুরোধ করলেই ফাঁসি রদ হবে। আচ্ছা দেখি, আপনি কেন ধরা দিলেন বলে দিচ্ছি। হুবহু বলে দেবো। আপনি কিন্তু লুকোতে পারবেন না। বলতেই হবে ঠিক মিলেছে কিনা।

হাতটা ভাল করে দেখে শেষে গম্ভীর ভাবে বলে, খুব গোপনীয় কারণে ধরা দিয়েছেন।

তাই না কি?

হুঁ। গভীর প্রেমের ব্যাপার।

বটে! নিশ্চয়ই আপনি কাকেও ভালবাসেন এবং সেইজন্যই ধরা দিয়েছেন। বলুন—বলুন, ঠিক বলেছি কিনা।

ঠিক। সত্যি ভালবাসি—গভীরভাবে ভালবাসি। কাকে জানেন?

গণৎকারের মুখ আগ্রহে ফাঁক হয়।

আমার জন্মভূমিকে।

গণৎকারের মুখের হাঁ আরও বেড়ে যায়।

থাক্। দয়া করে আপনার পরের জনকে জানিয়ে দেবেন আমায় কেটে ফেল্লেও কোন কথা বের করতে পারবেন না,—ছল-চাতুরীতে তো নয়ই। অতএব বৃথা চেষ্টা ছেড়ে আমায় ঘুমাতে দিন।

অনন্ত সিং খাটের উপর সটান শুয়ে পড়েন। গণৎকার ওরফে গোয়েন্দা দীর্ঘশ্বাস ফেলে হতাশ হয়ে সেল ত্যাগ করে।

অনন্তলালের আত্মসমর্পণের পর চন্দননগরের আশ্রয় ত্যাগ করার সিদ্ধান্ত অন্যেরা করলেন। গৃহহীন পলাতক ভ্রাম্যমান জীবন কয়েক দিনের এই সাজান সংসার মৌচাকের মতই মধুময় ছিল।

চলো মুসাফের—বহুদূর যানা হ্যায়—আবার কোন অজানা আশ্রয়ে। কিন্তু গাঁঠরি বাঁধা চলবে না। গণেশ ঘোষের কড়া হুকুম সঙ্গে কয়েকটি জামা কাপড় আর আর্মস ছাড়া আর কিছু নেওয়া চলবে না। 'হায় রে হৃদয়, তোমার সঞ্চয়, দিনান্তে শুধু পথপ্রান্তে ফেলে যেতে হয়!' তাই পিছনে পড়ে রইল প্রয়োজনীয় সব কিছু নিত্য ব্যবহার্য বস্তু, সাজান সংসার, শান্ত দিনগুলির স্মৃতি আর পুঁটুদি।

প্লাটফর্মে গণেশ ঘোষ লক্ষ্য করেন আনন্দ একটি সুটকেস এনেছে। তাকে ধমক দেন—আমি যে বারণ করলাম সঙ্গে কোন বোঝা নিতে।

আনন্দ কোন কথা বলে না।

খোল্! দেখি কি আছে সুটকেসে!

অনেক দ্বিধার পর লজ্জিত আনন্দ ধীরে ধীরে সুটকেস খোলে। ডালা তুলতেই দেখা গেল কাগজে জড়ান একতাল আমসত্ত্ব—আনন্দর প্রিয় বস্তু। ধমক দিতে গিয়ে গণেশ ঘোষ থেমে যান। ছোট ছেলে—প্রাণের মায়া ছেড়ে বেরিয়ে পড়েছে বিপ্লবের বিপদসঙ্কুল পথে, তবু একটুখানি আমসত্ত্বের মায়া সে ছাড়তে পারে নি। হঠাৎ সংঘর্ষে ও মারা যেতে পারে—ওই আমসত্ত্ব হয়তো ওর মুখে উঠবে না—এ কথা সে ভালভাবেই জানে। জানে বলেই গুলিভরা রিভলভার সঙ্গে রেখেছে। আবার রেখেছে ওই আমসত্ত্বটুকু।

আসে বিদায়ের পালা—বিচ্ছেদ।

অনন্ত সিংয়ের আত্মসমর্পণ এক জটিল রহস্যের সৃষ্টি করেছে শাসকদের কাছে। স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডে শিক্ষাপ্রাপ্ত ঝানু অফিসার পর্যন্ত ভেবে কুলকিনারা করতে পারে না কেন তিনি ধরা দিলেন। যাহোক, পুলিশ অনন্ত সিংয়ের সঙ্গে কোন অভদ্র আচরণ করতে সাহস করে না। তাঁকে ইউরোপীয়ান ওয়ার্ডে রাখা হয়। এক অল্পবয়স্ক সাহেব তো তাঁর বীরত্বপূর্ণ কার্যের প্রশংসা প্রাণখুলে করে—সত্যিই গুণমুগ্ধ সে।

টেগার্ট, লোম্যান প্রভৃতি সাহেবরা পরামর্শ করে:

He should be taken very very carefully to Chittagong.

Then a plane or special train ought to be arranged.
Don't relax military guards for a minute.

স্পেশ্যাল ট্রেনে সশস্ত্র পাহারায় অনন্ত সিংকে চট্টগ্রামে নিয়ে যাওয়া হয়। জলপথেও তার জন্য বিশেষ লঞ্চের ব্যবস্থা হয়। চট্টগ্রামের পুলিশ সুপারিণ্টেন্‌ডেণ্ট সুটার সাহেব স্বয়ং পাহারা দিয়ে বন্দীকে

নিয়ে চলেন। রাত্রে লঞ্চ চালাতে সাহস করেন না। কে জানে নদীতে অন্ধকারে বিপ্লবীদল যদি ছিপ নিয়ে আক্রমণ করে তাদের নেতাকে মুক্ত করে নেয়।

সারেঙ এসে জানায়, সাব! সামনা চরমে স্টীমার রুখ শেকৃতা।

বহুৎ আচ্ছা! রাতকো লিয়ে হুঁয়াই লঞ্চ রাখো।

সারেঙ বেরিয়ে যায়। পুলিশ সাহেব ঘণ্টা বাজায়। এক ইন্সপেক্টর আসে। স্টুটার প্রশ্ন করেন, What is he doing?

He is sleeping.

Really? Still keep close whtch on him.

সাহেব উঠে দাঁড়ায়। টেবিলের উপর হতে টর্চ ও রিভলভার তুলে নেয়।

এক কেবিনে অনন্ত সিং ঘুমাচ্ছেন। স্টুটার সাহেব এসে তাঁর মুখে টর্চের আলো ফেলে দেখেন। অনন্ত সিংয়ের ঘুম ভেঙে যায়, তিনি গর্জে উঠেন, You brute! Put that torch down. Learn manners.

সাহেব রাগে লাল হয়ে বলে, Don't forget you are a prisoner.

অনন্ত সিং জবাব দেন, I am not yet convicted.

নির্জন পাহাড়তলীতে অনন্ত সিংকে স্পেশাল ট্রেন হতে নামান হয়। চট্টগ্রামের ম্যাজিস্ট্রেট, এস. ডি. ও. প্রভৃতি সরকারী কর্মচারীরা ও বহু গুর্খা সৈন্য বেয়নেট লাগান বন্দুক নিয়ে অপেক্ষা করছিল। অনন্ত সিংকে একটি মোটরে চাপান হয়—তার সামনে পিছনে চার লরি মিলিটারি পাহারা। একজন নিরস্ত্র বন্দীর জন্য আয়োজন যা করা হয়েছিল তা রাজকীয়।

জেলের ওয়ার্ডে চট্টগ্রামের বিচারাধীন বন্দী বালকদের জেলার বলে, শুনেছো তোমরা, তোমাদের অনন্ত সিংকে আজ আনা হচ্ছে

এখানে। তোমরা বেশী উত্তেজিত হয়ো না। তাহলে গভর্ণমেণ্ট জেলে মিলিটারি আনবে।

ছেলেরা কলরব করে উঠে—অনন্তদা আসছেন !

সত্যি ?

আর ভয় নেই।

অন্যদিকে জন তিনেক চিন্তিত হয়ে পড়ে।

অনন্তদা আসছেন !

কি হবে ?

আমার স্বীকারোক্তি অস্বীকার করবো।

জেলের বড় ফটক খুলে যায়। দূরে ছেলেরা জোট বেঁধে দাঁড়িয়ে থাকে।

একজন বলে, আজ বড় ফটক খুলে দিয়েছে।

খুলবে না ? আমাদের নেতা আসছেন। ওদের বড় অফিসার থেকে তিনি কম কিসে ?

অনন্ত সিং জেলে প্রবেশ করেন ধীর গম্ভীর ভাবে দৃঢ় পদক্ষেপে। তাঁর সামনে পিছনে পাহারা। সঙ্গে আছে পুলিশ সুপারিণ্টেন্‌ডেণ্ট, ম্যাজিস্ট্রেট, এস. ডি, ও., সিভিল সার্জেন, জেলার প্রভৃতি।

ছেলেরা তাঁকে দেখে চীৎকার করে উঠে—অনন্ত সিং জিন্দাবাদ !

অনন্ত সিং তাদের দিকে চেয়ে মৃদু হেসে গম্ভীর ভাবে বলেন, বন্দে মাতরম্ !

ছেলেরা উত্তেজনায় আনন্দে ফেটে পড়ে—বন্দে মাতরম্ ! বন্দে মাতরম্ !

আপার সারকুলার রোডে এক পরিচিতের বাড়ি গণেশ ঘোষ আশ্রয় পান। গৃহকর্তা ও এক পাচক ব্যতীত বাড়িতে আর কেউ

নেই। বন্ধুটি তাঁকে আশ্বাস দেন সম্পূর্ণ নিরাপদ এ স্থান, ভাবনা বা ভয়ের কিছু নেই।

মধ্যাহ্ন ভোজনের সময় গণেশ ঘোষ টের পান পরিবেশন কালে পাচক তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাঁকে লক্ষ্য করছে। সতর্ক বিপ্লবীর মন স্বভাবতই সন্দিগ্ধ হয়ে উঠে। আহারের পর বন্ধুব কাছে সন্দেহের কথা তুলতেই তিনি হেসে উড়িয়ে দেন।

বন্ধু বলেন, নতুন লোক বলে হয়তো একটু অবাক হয়ে দেখছিলো। চেহাবাখানা যা হয়েছে তা অবাক হয়ে দেখার মতই—এক গাল দাড়ি, এক মাথা রুক্ষ চুল। ছেলেবেলায় তুমি কি সুন্দর আর শৌখিন ছিলে। অবাক হয়ে ভাবি কি করে এতো বদলে গেলে! যাক্, নিশ্চিন্তে খানিক ঘুমোও, শরীর অনেক ঝরঝরে হবে।

বিশ্রামের জন্য গণেশ ঘোষ বিছানায় এলিয়ে পড়েন। 'দেহ ক্লান্ত হলেও মানসিক অস্বস্তির জন্য ঘুমোতে পারেন না।

বাইরের আকাশে বর্ষার ঘন কালো মেঘ ঘনিয়ে আসে। গণেশ ঘোষ উঠে জানালায় এসে দাঁড়ান। তাঁর চোখ যেই মেঘ হতে মাটিতে নামে অমনি তিনি চমকে উঠেন। তাঁর জানলার নীচে তিন-চারজন লোক জটলা করছে। তাদের মধ্যে একজন তাঁর দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে সঙ্গীদের দেখায়। আকাশের মতই গণেশ ঘোষেরও মনে সন্দেহের কালো মেঘ ঘনিয়ে আসে।

তাড়াতাড়ি পাশের ঘরে গিয়ে বন্ধুকে ধাক্কা মেরে জাগান। বলেন, কথার সময় নেই। শিগ্‌গির একটা ট্যাক্সি ডেকে আনো! বাড়ির কাছে এসে দরজা খুলে রেখে তুমি লাফিয়ে নেমে পড়বে। ড্রাইভারকে ইঞ্জিন বন্ধ কবতে বাবণ কোরো!

বন্ধু বেরিয়ে যেতেই তিনি জামা কাপড় পরে তৈরি হয়ে নেন। দুর্দিনের সঙ্গী রিভলভারকে হাতেব মুঠোয় গ্রহণ করেন। তারপর নীচে নেমে দরজার পাল্লার আড়ালে দাঁড়িয়ে উৎকণ্ঠিত চিত্তে উৎকর্ণ হয়ে প্রতীক্ষা করেন।

দূরাগত মোটরের শব্দ কানে আসে—শব্দ উচ্চতর হয়ে ক্রমে বাড়ির কাছে এগিয়ে আসে—ক্যাঁচ করে দরজা খোলার শব্দ শোনা যায়। গণেশ ঘোষ বিদ্যুৎ বেগে বাড়ি হতে গাড়িতে যান এবং বজ্রগম্ভীর কণ্ঠে বলেন, ড্রাইভার জলদি চালাও—বহুৎ বখশিশ মিলেগা।

বাড়ির সামনে যারা জটলা করছিল ঘটনার আকস্মিকতায় তারা প্রথমে হতবুদ্ধি হয়। তাদের চোখের সামনে দিয়ে গর্জন করে যখন গাড়ি বেরিয়ে যায়, তখন সচেতন হয়ে তারা চীৎকার করে—পালালো! পালালো!

অনেকদিন পরে বিচারের সময় টের পাওয়া যায় বাড়ির পাচকটি গণেশ ঘোষকে দাড়ির জন্য অম্বিকা চক্রবর্তী বলে সন্দেহ করে এবং তার জানা এক গোয়েন্দাকে খবর দেয়। তারা থানায় খবর পাঠিয়ে সশস্ত্র সাহায্যের জন্য অপেক্ষা করে এবং বাড়ির উপর কড়া নজর রাখে। ইতিমধ্যে তাদের বোকা বানিয়ে গণেশ ঘোষ পলায়ন করেন।

এ পথে সে পথে বার বার গাড়ি বদলিয়ে ঘোরার পর রাত্রের অন্ধকারে গণেশ ঘোষ আবার অনেকদিন পরে চন্দননগরে ফিরে আসেন।

পুরানো আস্তানার কাছে এসে ভাবেন যদি ইতিমধ্যে পুঁটুদি ও শশধরবাবু এ বাড়ি ছেড়ে চলে গিয়ে থাকেন, যদি পুলিশ এ বাড়ির কথা জানতে পেরে নিজেদের লোক বসিয়ে রেখে থাকে, তাহলে তার কি উচিত হবে এত রাত্রে এভাবে এবেশে বাড়ির দরজায় ধাক্কা দেওয়া। যাহোক, গণেশ ঘোষের মাথায় বুদ্ধির অভাব হয় না।

হঠাৎ পুঁটুদির ঘুম ভেঙে যায়। দরজায় কে যেন ধাক্কা দিচ্ছে। এই অন্ধকার ঝড় বাদলের রাতে কে আসবে? তবে কি তারা? গৃহহারার দল!

পুঁটুদি তাড়াতাড়ি উঠে হ্যারিকেন হাতে নেমে এসে দরজা

খুলে দেন। কিন্তু কারুকে দেখতে পান না। তবে কি ঝোড়ো হাওয়া এসে বদ্ধ দ্বারের শিকল নাড়া দিল? আলোটা উঁচু করে ধরে চারিদিকে দেখেন।

দূর থেকে হ্যারিকেনের আলোয় এবার পুঁটুদির মুখ স্পষ্ট দেখা যায়। গণেশ ঘোষ নিশ্চিন্ত হয়ে এগিয়ে আসেন। দরজায় ধাক্কা দিয়ে দৌড়ে পালিয়ে তিনি এক ঝোপের আড়ালে লুকিয়েছিলেন। অন্য কেউ হলে আত্মপ্রকাশ করতেন না।

চন্দননগরের বাড়িতে আবার বিপ্লবীরা আশ্রয় নেন। অনন্ত সিংয়ের স্থলে এবার আছেন লোকনাথ বল। তিনি গোপনে চট্টগ্রাম থেকে চলে এসেছেন।

সারা বাংলায় সে সময় বৈপ্লবিক ঘূর্ণি ঝড় লেগেছে। অত্যাচারী শাসকদের সন্ত্রাসবাদীরা সায়েস্তা করা শুরু করেছেন। কলকাতার বিপ্লবীরা সংকল্প করেন একদিন গ্র্যাণ্ড হোটেল আক্রমণের। চন্দন-নগরে লুক্কায়িত বিবপ্লীরা এই কার্যের জন্য প্রচুর কার্তুজ নির্মাণ শুরু করেন—করার মত কিছু পেয়ে এতদিন পরে তাঁরা একটু সন্তুষ্ট হন।

সেদিন সুহাসিনী গাঙ্গুলি গিয়েছিলেন কলকাতায় প্রয়োজনীয় সংসার খবচের জন্য টাকা আনতে। কিন্তু দলের দাদাদের গিয়ে দেখেন তাঁরা চিন্তিত ও বিচলিত। সেদিন দুপুরে ডালহাউসি স্কোয়ারে টেগার্টের উপব বিপ্লবীদের বোমা নিক্ষেপ শুধু বিফল হয়নি, বিপদজ্জনকও হয়েছে। পুঁটুদি ব্যস্ত হয়ে চন্দননগরে ফিরে আসেন।

আসন্ন সংঘর্ষের উল্লাসে চন্দননগরে এঁরা উচ্ছ্বসিত হয়ে আছেন। ঘরের মধ্যে এরা বসে বসে স্বনির্মিত কার্তুজে পারকাসন ক্যাপ লাগাচ্ছেন। বাইরে ঝম্ ঝম্ করে বৃষ্টি পড়ছে এবং মধ্যে সোঁ সোঁ করে এক স্টোভ জ্বলছে। শব্দের সেই আবহ সঙ্গীতের সঙ্গে গলা মিশিয়ে বিপ্লবীরা গান ধরেন—

ত্রিংশ কোটি কণ্ঠে কল কল নিনাদ করালে,
দ্বিত্রিংশ কোটি ভুর্জৈধৃত খর করবালে,
অবলা কেন মা এতো বলে—

বাইরে থেকে ব্যস্তসমস্ত হয়ে পুঁটুদি আসেন, ধাক্কা দিয়ে দরজা খোলেন।

চুপ! চুপ! এখুনি কেউ শুনে ফেলবে।

গান থেমে যায়। ড্যালহাউসি স্কোয়ারের দুর্ঘটনার কথা এঁদের জানান। এঁরা শুনে মনে মনে ভাবেন যে এই কাজের দায়িত্বটা যদি দাদারা এঁদের উপর দিতেন, তাহলে এই বিশ্রী জড়তার মাঝ হতে এঁরা উদ্ধার পেতেন।

রাত্রে খেতে বসে মাখন বলে, এই রকম বর্ষার রাতে মাংস খেতে ইচ্ছে করে, দিদি।

আনন্দ তার সঙ্গে একমত হয় না। দূর! মাংসের চেয়ে দুধ আর আমসত্ত্ব আজ ভাল লাগে।

পুঁটুদি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলেন, আচ্ছা, একদিন খাওয়াবো ভাই। হাতে টাকা আসুক।

গণেশ ঘোষ বলেন, বর্ষার রাতেই কিন্তু বিপদের সম্ভাবনা বেশী ভাল করে পাহারা দিতে হবে আজ।

হঠাৎ দপ্ করে হ্যারিকেন নিভে যায়।

কি হলো?

হঠাৎ আলো নিভলো কেন?

পুঁটুদি বলেন, একি অশুভ লক্ষণ!

গণেশ ঘোষ হেসে উঠে বলেন, যত সব বাজে সংস্কার। দাঁড়াও জ্বেলে দিচ্ছি।

নিশীথ রাত্রে ঘুমন্ত গণেশ ঘোষকে আনন্দ ডাকে, গণেশদা, উঠুন! উঠুন!

গণেশ ঘোষ লাফিয়ে বিছানা থেকে উঠেন।

পুলিশ বাড়ি ঘিরছে।

চারিদিক ঘিরেছে ?

পিছনের পুকুরের দিকটা এখনো ঘেরেনি বোধ হয়।

পিছনের খিড়কির দরজা খুলে পুঁটুদি বলেন সাবধানে যেও।

এরা চারজনে অন্ধকারে দৌড়য়।

হঠাৎ গুলির শব্দ হয়। টর্চ জ্বলে উঠে। দেখা যায় বাড়ির পিছনের পাঁচিলের আড়ালেও পুলিশ আছে। তারা একযোগে গুলিবর্ষণ শুরু করে। বিপ্লবীদের কানের পাশ দিয়ে গরম সিসার গুলি শিস দিয়ে যায়। তাঁরাও গুলি চালান।

ইতিমধ্যে বাড়ির সামনের দরজা পুলিশ ভেঙে ফেলেছে।

দৌড়তে দৌড়তে হঠাৎ লোকনাথ বল পুকুরের ভিতর পড়ে যান। জলের শব্দ হয়। পুলিশরা চেঁচায়—ইধার! ইধার একঠো গিবা।

ইংরেজিতে কে চেঁচায়—Who are you ?

I am Lokenath Bal.

Surrender or we will shoot.

পুলিশ গণেশ ঘোষ, লোকনাথ বল, আনন্দ গুপ্তকে পিছমোড়া করে বাঁধে। প্রহার শুরু করে। জেরা চলে।

গণেশ ঘোষ দৃঢ় কণ্ঠে সকল জেরার একটি মাত্র জবাব দেন, I will say nothing.

মারের সঙ্গে সমানে শোনা যায় তাঁর কণ্ঠস্বর···Nothing··· nothing···

শত নির্যাতনেও অন্য বিপ্লবীরাও অচল অটল থাকেন।

শশধর আচার্য ও সুহাসিনী গাঙ্গুলিকেও বেঁধে নিয়ে আসা হয়। শশধরবাবুর উপর অত্যাচার কম হয়নি, নিদারুণ প্রহারে তাঁর সারা মুখ ফুলে গেছে।

কমিসনার টেগার্ট সুহাসিনী গাঙ্গুলির গালে সজোরে চড় মারে।

গণেশ ঘোষ গম্ভীরভাবে বলেন, Shame! you treat laides in this way.

লোকনাথ বল গর্জান, If I were free, I would teach you a lesson.

পুলিশ ভ্যানের মধ্যে পুঁটুদি প্রশ্ন করেন, গণেশ, জীবন কোথায়?

সে মারা গেছে।

পুঁটুদি স্তব্ধভাবে কিছুক্ষণ থাকেন। এত নির্যাতনেও তিনি বিচলিত হন নি, এবার তাঁর চোখে জল আসে। ধরা গলায় তিনি বলেন, বেচারা আমার কাছে মাংস খেতে চেয়েছিল।

জেলের মধ্যে অনন্ত সিং ওয়ার্ডার-মেট প্রভৃতিকে অল্প দিনেই বশ করে ফেলেন। তাঁর ব্যক্তিত্বে সকলে মুগ্ধ হয়। কয়েদীরা এই দেশ-প্রেমিক বিপ্লবী বন্দীকে দেবতার মত ভক্তি করে, জেলার প্রভৃতি সরকারী কর্মচারীরাও তাঁকে সমীহ করে। ফলে অনন্ত সিংয়ের অনেক সুবিধা হয়।

একদিন তিনি বন্দী ছেলেদের বলে পাঠান অনশন করতে। ছেলেরা তাঁর উদ্দেশ্য বুঝতে না পারলেও আদেশ উপেক্ষা করে না।

জেলার এসে অনন্ত সিংকে বলে, ছেলেরা সব আজ বেঁকে বসেছে, খাচ্ছে না। আপনি যদি তাদের একটু বুঝিয়ে বলেন তো হাঙ্গামা হয় না।

ছেলেদের কাছে পেয়ে অনন্ত সিং বলেন, তোমাদের সঙ্গে কথা বলাই ছিল আমার উদ্দেশ্য। আমার মাথায় অনেক মতলব আছে। জেলের আইন-কানুন ধীরে ধীরে ভেঙে নিজেদের সুবিধা করে নিতে হবে। রোজ তোমরা আমার সেলের দিকে পায়চারি করবে, একটু একটু করে ক্রমশঃ অবাধ মেলামেশা করতে হবে। কুশল প্রশ্ন হতে

শুরু করে ধীরে ধীরে কাজের কথাবার্তা চালাতে হবে। যারা স্বীকারোক্তি করেছে, তাদের তোমরা শাসিও না। ভয় দেখালে কাজ হবে না।

তাদের তো আলাদা করে রেখেছে। তা সত্ত্বেও খবর পেলাম লালমোহন statement withdraw করবে। পুলিশের চালাকিতে সে কিছু বলে ফেলেছিল, এখন ভুল বুঝতে পেরেছে।

ভাল। তাকে আমি কাছে টেনে আনতে চাই। এর জন্য তার কোর্টে অভিনয় করা চাই।

কোর্টে অনন্ত সিং, গণেশ ঘোষ ও অন্যান্য সব বন্দীদের এক কাঠ-গড়ায় রাখা হয় এবং রাজসাক্ষী তিনজনকে অন্য কাঠগড়ায়। অনন্ত সিংয়ের শিক্ষামত লালমোহন সেন অন্য দু'জন রাজসাক্ষীকে হাত মুখ নেড়ে কিছু বলে।

সরকারী পক্ষের উকিল জজের কাছে আপত্তি জানায়, My lord ! He is trying to win over other witnesses.

জজের নির্দেশ মত স্বীকারোক্তি প্রত্যাহারকারী লালমোহনকে রাজসাক্ষীদের কাছ হতে সরিয়ে দেওয়া হয়।

বন্দীদের মধ্যে অর্ধেন্দু গুহ জামিনে খালাস আছে। তাকে অনন্ত সিং বলেন, তুমি মাস্টারদার সঙ্গে যোগাযোগ করো। অনেক কাজ করার আছে।

অর্ধেন্দু গোয়েন্দাদের চোখ এড়িয়ে কালি দের সাহায্যে মাস্টারদার গোপন আশ্রয়ে আসে। মাস্টারারদা ও নির্মল সেন একই আশ্রয়ে ছিলেন। অর্ধেন্দু এসে মাস্টারদাকে প্রণাম করে। অনেক দিন বাদে প্রিয় ও শ্রদ্ধেয় নেতাদের দর্শন সে পায়।

মাস্টারদা মৃদু হেসে বলেন, গোয়েন্দাদের চোখে ধুলো দিয়ে এসেছো তো ?

অর্ধেন্দু হেসে ঘাড় নেড়ে নির্মল সেনকে প্রণাম করতে যায়। তিনি বাধা দিয়ে সস্নেহে তার চুল টেনে পিঠে এক কিল মারেন।

মাস্টারদা জিজ্ঞাসা করেন, অনন্তলাল কেমন আছে? অসুখের জন্য খুব রোগা হয়ে গেছে?

আপনাকে একটা সাঙ্কেতিক চিঠি পাঠিয়েছেন।

চিঠি পাঠ করার পূর্বে মাস্টারদা সকলকার কুশল সংবাদ জিজ্ঞাসা করেন। দলের সকলেব উপর বিপ্লবী নেতার ভালবাসা খুব গভীব ছিল।

'চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন' মামলায় ডি. আই. জি. ক্রেগ আসছে সরকাব পক্ষে সাক্ষী দিতে। জেলেব মধ্যে বসেই অনন্ত সিং সব সংবাদ সংগ্রহ করেছেন—সে কবে আসছে, কখন আসছে, কোন ট্রেনে, সঙ্গে কে থাকবে, কবে ফিরবে ইত্যাদি। অনন্ত সিং চান ক্রেগকে চিরতরে নীরব করে দিতে।

রামকৃষ্ণ বিশ্বাস মাস্টারদাকে অনুরোধ করে, এ কাজেব ভার আমায় দিন, মাস্টারদা। আমি যেদিন পুড়ে মরছিলাম, সেদিন অনন্তদা প্রাণপণ চেষ্টায় আমায় বাঁচিয়েছিলেন। তাঁব কাজে আমি নিজেকে উৎসর্গ করতে চাই।

বেশ! তবে তোমার সঙ্গে কালি চক্রবর্তীও থাকবে সাহায্য করার জন্য।

ট্রেনের সেকেণ্ড ক্লাস কামরায় ক্রেগ চলেছে, সঙ্গে আছে ইন্সপেক্টর তারিণী মুখার্জি। সেই গাড়িরই থার্ড ক্লাসে রামকৃষ্ণ ও কালি তাদের অনুসরণ করছে, প্রতি স্টেশনে নেমে তাদের উপর লক্ষ্য রাখছে।

ট্রেন থামে চাঁদপুর স্টেশনে। ওভারকোট গায়ে তারিণী মুখার্জি আগে নামে। রামকৃষ্ণ ও কালি তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে গুলি করে।

শীতের কুয়াশা ঢাকা প্ল্যাটফর্মের স্বল্প আলোয় একই রকমের পোশাকে আপাদ মস্তক ঢাকা থাকায় তারা তারিণীকে ক্রেগ বলে ভুল করে।

তারিণী পড়ে যায়। কালি তার গায়ে রিভলভার ঠেকিয়ে পর পর ছটি গুলি করে!

বিপদ বুঝে ক্রেগ গাড়ি থেকে নামে না। জানলা দিয়ে সে বিপ্লবীদের দিকে গুলি ছোড়ে। গোলমাল শুনে রেল পুলিশ ছুটে আসে। বিপ্লবী দুজন দৌড়ে রাত্রের অন্ধকারে অদৃশ্য হয়।

ক্রেগ চীৎকার করে, Send message! they have green wrappers.

প্রায় সারা রাত্রি দৌড়ে বহু মাইল অতিক্রম করে এক ছোট স্টেশনে বিপ্লবী দুজন ট্রেন ধরার জন্য প্রবেশ করে, অমনি পুলিশ তাদের গ্রেপ্তার করে। শীতের জন্য যে রঙীন চাদরে তাদের দেহ আবৃত ছিল, তা পরিত্যাগ না করার ভুল মারাত্মক হলো।

জেলের মধ্যে সমস্ত ঘটনা অনন্ত সিং শোনেন। গণেশকে বলেন, আমাদের বাইরে বের হতে হবে, নইলে বিশেষ কাজ হবে না।

'ভাঙ, ভাঙ, কারা—আঘাতে আঘাত কর!'

এক বিরাট এবং বিস্ময়কর পরিকল্পনা অনন্ত সিং করেন।

ইতিমধ্যে এক মুশকিল হয়। অর্ধেন্দুর বাবা হচ্ছেন গোঁড়া অহিংসপন্থী কংগ্রেসী। তারিণী মুখার্জির হত্যার পর তিনি পরিষ্কার বোঝেন বন্দী বিপ্লবীদের সঙ্গে লুক্কায়িত বিপ্লবীদের সংযোগ আছে এবং সংযোগকারী হচ্ছে তাঁরই পুত্র। কারণ তাঁর ছেলে প্রায়ই রাত্রে বাড়ি থাকে না। কোর্ট থেকে এসেই লুকিয়ে কোথায় চলে যায় এবং সকালে ঠিক কোর্টে যাবার সময় বাড়ি ফেরে। বিপ্লবীদের হিংসার পথ তিনি একেবারেই পছন্দ করেন না। তাছাড়া ছেলের জন্য আর এক সাংঘাতিক বিপদের তিনি আশঙ্কা করেন। দশ হাজার টাকার জামিনে অর্ধেন্দু খালাস আছে। অঘটন কিছু ঘটলে দশ হাজার টাকার জন্য তাঁকে পথে দাঁড়াতে হবে। তাই তিনি

কোর্টে এক দরখাস্ত দাখিলের মনস্থ করেন, যাতে তাঁর ছেলের জামিন বাতিল হয়।

অর্ধেন্দুর উপর নজর রাখা গোয়েন্দাকেও তিনি বলেন, আমার ছেলে রাত্রে বাড়ি থেকে পালায়। কী তুমি নজর রাখো?

গোয়েন্দাদের পাহারার মাত্রা বেড়ে যায়। চারজন গোয়েন্দা চোদ্দ বছরের এক শিশুর উপর নজর রাখতে হিমসিম খেয়ে যায়।

কথাটা অনন্ত-গণেশের কানে আসে, কারণ অর্ধেন্দুকে লুকিয়ে ঘোরাফেরার বিভিন্ন কৌশল তাঁরাই শিখিয়ে দিচ্ছিলেন। তাঁরা উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করেন। বিপ্লবীদের মামলা পরিচালনা করছিলেন বিখ্যাত নেতা শরৎ বোস। তিনি অর্ধেন্দুর বাবাকে অনেক বোঝান, অর্ধেন্দুর দায়িত্ব নিজে নেন। তাঁর কথা অর্ধেন্দুর বাবা উপেক্ষা করতে পারেন না, দরখাস্ত দাখিল করেন না। এ ছাড়া বিপ্লবী কালি দে অর্ধেন্দুর বন্ধুরূপে তার বাবার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করে তাঁর বিশ্বাস অর্জন করে, আশ্বাস দেয় তাঁর ছেলেকে বুঝিয়ে ঠিক পথে নিয়ে আসার। তিনি অর্ধেন্দুকে কালির সঙ্গে অবাধে মিশতে দেন, বিন্দুমাত্র সন্দেহ করেন না যে কালি জালালাবাদ যুদ্ধে ছিল এবং মাস্টারদার ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আছে।

বিপ্লবীদের কাজের আর অসুবিধা হয় না।

কোর্টে সেদিন রাজসাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণ হবে। বর্তমানে রাজসাক্ষী শুধু ফকির সেন আছে, আর সবাই ইতিমধ্যে স্বীকারোক্তি প্রত্যাহার করেছে।

অনন্ত সিংয়ের ব্যক্তিত্বের আকর্ষণ এবং তীব্র দৃষ্টির সম্মোহন ফকির এতদিন উপেক্ষা করে আছে কি করে কেউ বলতে পারে না। Identification paradeএ অনন্ত সিংকে তো কেউই সনাক্ত করেনি তাঁর অন্তর্ভেদী দৃষ্টির সামনে দাঁড়িয়ে।

পুলিশ সাহেব স্লুটার শেষে রেগে মেগে বলেছিল, ওরকম ভাবে তাকাচ্ছ কেন?

অনন্ত সিং পরিহাস করে বলেছিলেন—তাঁর চাউনি কি অর্ডিনান্স করে গভর্ণমেণ্ট বন্ধ করতে চায়।

সরকারী উকিল বক্তৃতা দেয়, The existence of a criminal conspiracy to commit the offences specified in the charge has been proved not only by the evidence but also by the confession made by one of the accused now before us.

এমন সময় ফকির সেন উঠে দাঁড়িয়ে বলে, I wish to retract my confession. The statement I made before is false and not voluntary.

কোর্টের মধ্যে হৈ হৈ পড়ে যায়। বাধ্য হয়ে জজ ঘোষণা করেন. The court is adjourned today.

কয়েদীদের ডক থেকে নামানোর সময় এক সার্জেণ্ট মন্তব্য করে, Niggers are downright liars!

ফকির ঘুরে দাঁড়িয়ে তার মুখে ঘুসি মারে। রাজসাক্ষী ফকির এত দিনে আবার বিপ্লবী ফকিরে রূপান্তরিত হলো। পুলিশেরা তেড়ে আসে তাকে মারতে।

স্লুটার বলে, Teach him a lesson! Thrash him!

অনন্ত সিং ওধার হতে গর্জে উঠে স্লুটারকে বলেন, You will be a dead man soon.

তাঁর এই শাসানিকে সত্যে পরিণত করার ব্যবস্থাও অনন্ত সিং করেন।

অর্ধেন্দু এসে মাস্টারদাকে বলে, অনন্তদারা শুধু জেল ভেঙে বের হতে চান না, তাঁরা কোর্ট বিল্ডিং প্রভৃতিও ডিনামাইট দিয়ে উড়িয়ে দিতে চান।

নির্মল সেন মাস্টারদাকে শুধু একটি কথা জিজ্ঞাসা করেন, সম্ভব হবে ?

মাস্টারদা বলেন, অনন্ত ইচ্ছা করলে অসম্ভবকে সম্ভব করতে পারে, এ বিশ্বাস আমার আছে।

অর্ধেন্দু জানায়, অনন্তদা সব প্লান ও ফর্মুলা পাঠিয়েছেন। কলকাতা হতে মাল মসলা এবং অ্যাসিড আনাতে হবে।

নির্মল সেন বলেন, পুলিশ ছেলেদের উপর ভীষণ নজর রেখেছে। কলকাতায় যাতায়াত প্রায় অসম্ভব।

মাস্টারদা বলেন, সেইজন্য এবার আমি মেয়েদের দিয়ে কাজ করাবো। অবশ্য অনন্তকে একথা তুমি জানিও না অর্ধেন্দু। মেয়েছেলেকে কাজের ভার দেওয়া হয়েছে শুনলেই সে অনর্থক ক্ষেপে উঠবে।

কোর্টে অনন্ত সিং জিজ্ঞাসা করেন, কলকাতা হতে অ্যাসিড নিয়ে আসছে কে ?

অর্ধেন্দু জড়িত স্বরে বলে, একটি মেডিক্যাল ষ্টুডেন্ট।

ছেলেটি তো বেশ কাজের। যাক্ আজ কোর্ট ভাঙলেই তার সঙ্গে দেখা করে বাকী অ্যাসিডগুলি তাড়াতাড়ি আনার ব্যবস্থা করবে।

অনন্ত সিং সংবাদ পান অর্ধেন্দু একটি মেয়ের সঙ্গে খুব মেলামেশা করছে। কোর্ট ভাঙলেই তার সঙ্গে গিয়ে সাক্ষাৎ করে। খবরটা শুনে তিনি চিন্তিত হন।

অর্ধেন্দুকে তিনি প্রশ্ন করেন, কাল কোর্ট থেকে বেরিয়েই তুমি আমার কথামত কাজ করেছিলে ?

হ্যাঁ।

আমার কাছে মিথ্যে কথা বলতে তোমার ভয় করে না! একটি মেয়ের সঙ্গে তুমি দেখা করেছিলে কেন ? কি চুপ করে রইলে যে ?

অনন্ত সিংয়ের দুচোখ হতে অগ্নি বর্ষিত হয়। অর্ধেন্দু নীরবে ছলছল চোখে ভর্ৎসনা সহ্য করে।

রাত্রে সে এসে মাস্টারদাকে কেঁদে বলে, মাস্টারদা! অনন্তদা আমায় মেরে ফেলবেন। তাঁর কাছে আর গোপন রাখা চলবে না।

বেশ, তুই তাকে এবার জানাস।

অর্ধেন্দু বলে, আমায় ক্ষমা করুন, অনন্তদা। মাস্টারদার বারণ ছিল বলে আপনাকে জানাই নি। মেডিক্যাল ষ্টুডেন্ট নয়—একটি মেয়েই আমাদের সাহায্য করছিল।

বিস্ময়ে অনন্ত সিং বলেন, তাই না কি! কে সে?

কল্পনা দত্ত।

কল্পনা এমন কাজ করছিল? একটু হেসে অনন্ত সিং বলেন, এরা যখন আজ এমনভাবে এগিয়ে এসেছে, তখন স্বাধীনতা সুদূর নয়।

সরকারভক্ত এক ধনী পরিবারের মেয়ে কল্পনা। দেশের জন্য আজ সে সব কাজ কবতেই সর্বদা প্রস্তুত।

এক নক্সা এঁকে মাস্টারদা ছেলেদের বোঝান,—এই হচ্ছে রাস্তা। ট্রাইবুনালের গাড়ি এই পথে আসে। অনন্তর কথা মত পথের তুধারে মাইন পাততে হবে। তাদের alternately connect করতে হবে তার দিয়ে এবং তুটি সুইচ থাকবে। প্রথম সুইচ টিপে গাড়ি উড়িয়ে দিতে হবে। তারপর সদলে যখন পুলিশ ব্যাপারটার অনুসন্ধান করতে আসবে, তখন দ্বিতীয় সুইচ টিপে তাদের দলশুদ্ধ ধ্বংস করতে হবে। একটি খালি বাড়িতেও কিছু মাল-মশলা অস্ত্র-শস্ত্র রেখে দেওয়া দরকার। সেই বাড়িটা আমাদের ঘাঁটি ভেবে পুলিশ সার্চ করতে গেলে ডিনামাইট দিয়ে বাড়ির সঙ্গে তাদেরও নিশ্চিহ্ন করতে হবে। ইতিমধ্যে জেল ভেঙে ওরা বেরিয়ে আসবে।

পরিকল্পনা মত কাজ শুরু হয়। কালির বাড়িতে গুপ্ত অস্ত্র প্রস্তুতের কারখানা করা হয়। তার কাকা ও কাকীমা এ কাজে যথেষ্ট সাহায্য করেনখ

জেলের মধ্যে গোপনে অস্ত্র প্রেরিত হয়—প্রায় আধ মণ গান

পাউডার, রিভলভার, ছোরা, এসিড বাল্ব ইত্যাদি বন্দীদের কাছে পৌঁছয়। তারা সেগুলি সযতনে মাটির মধ্যে পুঁতে রাখেন।

শহরে কড়া মিলিটারি পাহারা। নাগরিকদের স্বচ্ছন্দে ঘোরার কোন সুযোগ নেই। কিন্তু বিপ্লবীদের কাজ শত বাধা সত্ত্বেও বন্ধ হয় না। তাঁদের কৃতিত্ব বিস্ময়কর।

একদিন একটি ছেলে গ্রাম্য জেলের ছদ্মবেশে কাঁধে বাঁক ঝুলিয়ে চলে। রাস্তায় পাহারারত মিলিটারি তাকে ধরে। সঙ্গের হাঁড়ি দেখিয়ে প্রশ্ন করে, কেয়া হ্যয় ?

মছলি !

মিলিটারিরা উপর উপর দেখে ছেড়ে দেয়। হাঁড়ির জল ও মাছের তলায় আছে কাঁচের কয়েকটি শিশিতে এ্যাসিড।

কাছারির সামনে অন্ধকার পথে মিলিটারিরা টহল দিয়ে বেড়ায়।

নিশীথ রাত্রে নগ্ন দেহে কালো প্যাণ্ট পরে কয়েকটি ছেলে, ডিনামাইট বক্স বয়ে আনে। তারা শুয়ে পড়ে মাটিতে গর্ত খোঁড়া শুরু করে। একজন একটু দূরে পাহারায় দাঁড়িয়ে যায়। মিলি-টারিরা যেই ঘুরে এদিকে আসে পাহারাদার ছেলেটি রুমাল নেড়ে সঙ্গীদের সঙ্কেত করে। তারা তাড়াতাড়ি গর্তে মাটি চাপা দিয়ে অন্ধকারে লুকোয়। মিলিটারি চলে গেলে ফিরে এসে আবার কাজ শুরু করে। এরকম ভাবে তারা মাইন পোঁতে, তার লাগিয়ে মাটির তলা দিয়ে দিয়ে চলে, কোর্টের কাছেই এক পানের দোকানে ব্যাটারি এবং সুইচ থাকবে।

হঠাৎ দূর হতে মিলিটারিরা পাহারাদার ছেলেটিকে দেখতে পেয়ে হাঁকে, কোন হ্যয় ?

অন্যেরা অন্ধকারে লুকিয়ে পড়ে। পাহারারত ছেলেটি পাগল সাজে। দু'হাত মাথার উপর তুলে নৃত্য করে, মাটিতে ডিগবাজি খায়, বেসুরা কণ্ঠে গান ধরে, হাম্ হ্যায়, হাম্ হ্যায়, হাম্ হ্যায়।

মিলিটারিরা তার কাছে আসে। তাদের মধ্যে একজন বলে, পাগল হ্যায়।

আর একজন বলে, এতনা রাতমে হিঁয়া কেয়া করতা?

ছেলেটি দুহাতে তালি দিয়ে নাচতে শুরু করে।

মিলিটারিরা এক ধমক দেয়—ভাগো।

একজন তাড়া করে। ছেলেটি দৌড়ে পালায়।

মিলিটারিরা চলে যেতে ছেলেরা ফিরে আসে। তারা কাজ শুরু করে। একজন ফিস্ ফিস্ করে বলে, তাড়াতাড়ি। ভোরের দেরি নেই।

জেলের সেলে অনন্ত সিং হয়তো স্বপ্ন দেখছেন…সমস্ত কোর্ট বিল্ডিং উড়ে গেছে…ট্রাইবুনালের গাড়ি উড়ে গেছে…জেল ভেঙে তাঁরা সব বের হচ্ছেন…চারদিকে তুমুল গণ্ডগোল…

তুমুল গণ্ডগোল! পুলিশের লোক ডিনামাইট ষড়যন্ত্র আবিষ্কার করেছে। জেলখানাতেও মাটি খুঁড়ে তারা অস্ত্রশস্ত্র বের করেছে। কাছারির সামনে ভোররাত্রে ডিনামাইট পোঁতার সময় রবি ও নিবারণ ধরা পড়েছে। কালির বাড়ি খানাতল্লাস হয়েছে, তার কাকা ও কাকীমা পুলিশের হাতে ভীষণ নির্যাতিত হয়েছেন, সেখানে অর্ধেন্দু ও প্রফুল্ল ধরা পড়েছে। সেই বাড়ি হতে কালি ও অপূর্ব (ভোলা) কোন রকমে পুলিশকে ফাঁকি দিয়ে পালিয়েছে।

বিপ্লবীদের বিচার গভর্ণমেণ্ট আর প্রকাশ্য আদালতে করতে সাহস করে না। জেলের মধ্যেই কোর্ট বসে। মামলার রায় দিয়েই জজেরা যাতে নিরাপদে চট্টগ্রাম হতে পালাতে পারেন, তার জন্য বিশেষ এরোপ্লেনের ব্যবস্থা হয়।

মামলার রায় যেদিন বের হয় সেদিন সকলে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে। অস্ত্রাগার লুণ্ঠন মামলায় ফাঁসি হলো না, যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর। অনন্ত সিং, গণেশ ঘোষ ও লোকনাথ বল—এই বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানের

নায়ক, চব্বিশ বৎসর বয়স্ক তিন যুবক আর পনেরো-ষোল বৎসর বয়স্ক তাদের সব সহযোদ্ধারা আন্দামানে নির্বাসিত হলেন।

কালাপানির পারে প্রেরিত হলেন অনন্ত সিং, গণেশ ঘোষ, লোকনাথ বল, আনন্দ গুপ্ত, ফণীন্দ্র নন্দী, সুবোধ চৌধুরী, ফকির সেন, সহায়রাম দাস, লালমোহন সেন, সুখেন্দু দস্তিদার, সুবোধ রায়, রণধীর দাসগুপ্ত ও সরোজকান্তি গুহ।

অনন্তলাল সিংয়ের অগ্রজ নন্দলাল সিংকেও দু বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয়।

বিপ্লবীদের জীবনের এক অধ্যায় এখানে শেষ হলো!

এক চাষার বাড়ি মাস্টারদা ও অম্বিকা চক্রবর্তী লুকিয়ে আছেন। বাড়ির মালিক নিজের ক্ষেতের কাজে বেরিয়ে গেছে। এঁরা আলাপ-আলোচনা করছেন।

পুলিশের এখন বিশ্বাস আমরা জেলার বাইরে যাইনি, চট্টগ্রামেই লুকিয়ে আছি।

পর পর এতো ঘটনা ঘটার পর তাদের বিশ্বাস দৃঢ় হয়েছে। দেখছেন না কি রকম গ্রামের পর গ্রাম ঘিরে ফেলে তারা সার্চ করছে।

হঠাৎ নীচে হতে মেয়েরা চেঁচিয়ে উঠে, পুলিশ আসছে, পুলিশ আসছে।

তাড়াতাড়ি বাইরে বেরিয়ে মাস্টারদা জামাটা খুলে ছুঁড়ে একদিকে ফেলে দেন। কাপড়টা গুটিয়ে হাঁটুর উপর তোলেন, গা ও মাথায় ধুলা-বালি মেখে নেন। দাওয়া হতে কাস্তে হাতে নেন এবং একটি টোকাও মাথায় চাপান। তারপর এগিয়ে গিয়ে মিলিটারির মুখোমুখি দাঁড়ান।

অম্বিকা দেখেন উঠানে বাঁশের আলনায় ধুতি ও শাড়ি শুকোচ্ছে। তাড়াতাড়ি একটা টেনে নিয়ে ঘোমটা দিয়ে পরেন। তারপর মেয়েদের রান্নাঘরের কাছে গিয়ে শিল-নোড়া নিয়ে হলুদ বাটতে বসেন।

মাস্টারদাকে বাইরে মিলিটারিরা প্রশ্ন করে, ইয়ে কোঠি তুমারা ?

লম্বা সেলাম ঠুকে মাস্টারদা মাথা নেড়ে জানান, হ্যাঁ।

আউর কোই হ্যায় ?

হ্যাঁ।

তারা সাগ্রহে প্রশ্ন করে, কৌন ?

জানানা লোক।

ধেৎ! এক থমক দেয়। চলো ম্যয়লোক দেখেঙ্গা!

চলিয়ে! চলিয়ে! মাস্টারদা তাদের সসম্মানে ভিতরে আনেন। চীৎকার করে বলেন, জানানা লোক এক তরফ হো যাও!

অম্বিকা চক্রবর্তী ঘোমটা ও শাড়ি সামলে উঠার চেষ্টা করেন। কিন্তু সুবিধা হবে না বুঝে সেখানে জড়সড় হয়ে বসে থাকেন।

মিলিটারিরা চারদিক দেখে চলে যায়।

অম্বিকা চক্রবর্তী একা এক আশ্রয়ে আছেন। আশ্রয়দাত্রী বুড়ী তাঁকে বলে, তুমি নির্ভয়ে ঘরের মধ্যে থাকো, বাবা। আমি কাজে চল্লাম। বাইরে তালা দিয়ে যাচ্ছি। হঠাৎ কেউ আসবে না।

ক্লান্ত অম্বিকা শুয়ে পড়েন। অনেকক্ষণ বাদে হঠাৎ মস্ মস্ জুতার শব্দে তাঁর ঘুম ভাঙে। জানলা দিয়ে দেখেন মিলিটারিরা আসছে। কলে ইঁদুরের মত তিনি ধরা দিতে চান না। তাড়াতাড়ি উঠে দরজা ভেঙে ঘর থেকে বের হন।

মিলিটারিরা আসে। খোলা ঘর পেয়ে ভিতরে ঢোকে, দেখে বিছানার উপর টর্চ ও ঘড়ি পড়ে। তন্ন তন্ন করে তারা চারদিক খোঁজে।

অম্বিকা চক্রবর্তী পুকুরে নেমে হাঁড়ি মাথায় দিয়ে ডুবে থাকেন।

বহুক্ষণ জলে থাকার জন্য অম্বিকা চক্রবর্তী নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হন। তারকেশ্বব দস্তিদার অক্লান্তভাবে তাঁর সেবা করে। মাস্টারদারা মাঝে মাঝে রাত্রে লুকিয়ে এসে তাঁকে দেখে যান। একদিন

এক আশ্রয়ে তারকেশ্বর জানায় যে আশ্রয়দাতার ব্যবহার সন্দেহজনক।

শুনেই মাস্টারদা বলেন, তাহলে আজ রাত্রেই ওঁকে এখান থেকে সরানো দরকার।

সেই ব্যবস্থা করার জন্য সকলে জ্বরে প্রায় অচৈতন্য অম্বিকা চক্রবর্তীকে রেখে বেরিয়ে পড়ে। কোন রকমে এক খাটিয়া জোগাড় করে শবযাত্রী সেজে অম্বিকাকে নিয়ে গ্রামান্তরে যাবার পরিকল্পনা এঁরা করেন।

এদিকে আশ্রয়দাতা গিয়ে থানায় খবর দেয়। পথে আসতে আসতে বলে, অসুখ খুব। সহজে পালাতে পারবে না। দলের আরও অনেকজন ওকে দেখতে এসেছে। মনে হয় রাত্রিতে সকলকেই ধরা যাবে। আমি ওদের খাবার জলে ঘুমের ওষুধ মিশিয়ে দিয়েছি।

ইন্সপেক্টর বলে, রিভলভার চুরি করে লুকিয়ে রেখেছো তো? হাতে অস্ত্র থাকলে ওরা অজেয়।

কুকুরের ডাকে রাত্রের মৌনতা ভঙ্গ হয়। অসুস্থ অম্বিকা চক্রবর্তী জাগরিত হন। তিনি কান পেতে শোনেন পুলিশের পায়ের আওয়াজ। বালিসের তলা হাতড়ে রিভলভার খোঁজেন। লাফিয়ে শয্যাতাগ করতে যান কিন্তু দুর্বলতার জন্য মাথা ঘুরে পড়েন।

পুলিশ ঘরে ঢোকে। তারা পৈশাচিক উল্লাসে চীৎকার করে, মারো শালাকে। ভাগনে নেহি শেখা।

অম্বিকার উপব সিপাইরা ঝাঁপিয়ে পড়ে। একজন তাঁর চুল ধরে টেনে তোলে, সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ ইন্সপেক্টর তাঁর মুখে সজোরে এক ঘুষি মারে। অম্বিকা পড়ে যান। ক্ষীণ স্বরে বলেন, আমি চোর ডাকাত নই, ভদ্র ব্যবহার আশা করি।

শালার সঙ্গে ভদ্র ব্যবহার। ল্যাংটো কবে চাবকান হবে। মারো শালাকে।

সিপাইরা আবার তাঁর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে।

অম্বিকার চোখ দুটি ক্রোধে জ্বলে উঠে। তিনি বলেন, আমি অসুস্থ। সুস্থ থাকলে সাধ্য ছিল না তোমাদের ধরার।

ব্যাটা ঘুঘু! চাঁদ চেয়েছিলে এবার ফাঁদ দেখো।

ধুলায় লুণ্ঠিত বিপ্লবী নেতার বুকের উপর উঠে বুট পায়ে পুলিশ ইন্সপেক্টর নৃত্য করে। নির্মমভাবে মুখে লাথি মারে।

আহত অম্বিকা চক্রবর্তী যন্ত্রণায় কাতর হয়ে প্রার্থনা করেন, জল··· একটু জল···

দে, প্রস্রাব করে শালাকে খাইয়ে দে।

অমানুষিক নির্যাতন চলে···

বিপ্লবীদের গুপ্তকেন্দ্রে উত্তেজনাপূর্ণ আলোচনা চলে।

এর শোধ আমরা নেবো!

অম্বিকাদার মত লোককে পুলিশ উলঙ্গ করে শহরে টেনে এনেছে, অসুস্থ মানুষের উপর অমানুষিক অত্যাচার করেছে, বুকের উপর দিয়ে সবাই মার্চ করেছে, ব্যাটারি চার্জ করে তাঁর এক ফুসফুস ফাটিয়ে দিয়েছে, তৃষ্ণার কাতর হয়ে জল চেয়েছেন—মুখে প্রস্রাব ঢেলে দিয়েছে।

মাস্টারদা বিষণ্ণ কণ্ঠে বলেন, দুঃখ হয় যে এ অত্যাচার দেশীয় মানুষবাই করেছে। যে দেশের মুক্তির জন্য আমরা মরছি, সে দেশ যেন তাদের নয়!

বালক হরিপদ বলে, বিদেশীর গোলাম এদেশীদেরও আমরা বুঝিয়ে দেবো—অত্যাচারীর ক্ষমা নেই। আপনি অনুমতি দিন মাস্টারদা!

ফুটবল খেলার মাঠ। খেলার শেষে ট্রফি দেওয়া হচ্ছে। অত্যাচারী ইন্সপেক্টর আসানুল্লাও উপস্থিত আছে। নিরীহ গোবেচারা ধরনের ছোট্ট ছেলে হরিপদ, তাকে দেখলে মনে হয় যেন খেলা দেখতেই এসেছে গ্রাম থেকে। পরনে আধ ময়লা ধুতি, গায়ে উড়নি

ও হাতে ছাতি। ভিড় ঠেলে ট্রফি দেখতে এগিয়ে এসে হঠাৎ ছাতির ভিতর হতে এক রিভলভার বের করে আসানুল্লাকে মারে। আসানুল্লা পড়ে যায়। হরিপদ দৌড়ে পালাবার চেষ্টা করে, কিন্তু ধরা পড়ে যায়।

ম্যাজিস্ট্রেট, পুলিশ সুপারিণ্টনডেন্ট প্রভৃতি পরামর্শ করে।

Little boys are becoming terrorists.

We will also terrorise them.

Foment communalism to check nationalism. create communal riots.

শহরে দাঙ্গা বাধে। পুলিশ দাঙ্গাকারীদের সাহায্য করে। চারদিকে লুঠ তরাজ অগ্নিকাণ্ড হয়।

স্কুলে ঢুকে পুলিশ নিরীহ ছোট ছোট ছেলেদের নির্মম প্রহার করে। শিক্ষকরা আপত্তি জানাতে এলে তাঁদেরও প্রহার করে স্বেচ্ছাচারী শাসকদের অত্যাচার সীমা ছাড়ায়।

হরিপদর বাড়িতে পুলিশ সদলে হানা দেয়। হরিপদ এবং তার বাবা-মাকে পুলিশ সুপারি গাছে বেঁধে চাবুক মারে।

পুলিশ সাহেব স্টাব ভাঙা হিন্দিতে প্রশ্ন করে, বোল্, শালা, সুরজ সান কাঁহা হয়।

এঁরা জবাব দেন না। নীরবে নির্যাতন সহ্য করেন।

পুলিশ এঁদের বাড়িতে পেট্রোল ছিটিয়ে আগুন দিয়ে দেয়। আগুন দেখে প্রতিবেশীরা ছুটে নিভাতে আসে। পুলিশ তাদের দিকে বন্দুক ছোঁড়ে।

পুলিশ সুপারিণ্টেন্‌ডেণ্ট পৈশাচিক উল্লাসে বিকট অট্টহাস্য করে। সানন্দে এই বীভৎস ধ্বংস-লীলার চিত্র গ্রহণ করে।

পুলিশের নৃশংস লীলাক্ষেত্র হয়ে উঠে চট্টগ্রাম জেলা।

সূর্য সেনকে ধরার জন্য তারা প্রাণপণ চেষ্টা করে। কিন্তু তাদের সকল প্রচেষ্টাই ব্যর্থ হয়। বহু বার পুলিশ বেষ্টনার ভিতর পড়া সত্ত্বেও মাস্টারদা নানা কৌশলে তাদের ফাঁকি দিয়ে পালান। জনসাধারণ ভাবে সূর্য সেন অদৃশ্য হওয়ার মন্ত্র জানেন।

অনন্ত-গণেশ প্রভৃতি তুর্দান্ত বিপ্লবারা পরিহাস করে প্রাযই বলতেন, মাস্টারদা, আপনি কিন্তু এই সব তুঃসাহাসক কাজের উপযুক্ত নন। তুর্বল শরীর, ধরা পড়লে মারামারি করে পালাতে পারবেন না, মাইলের পর মাইল দৌড়তে পারবেন না, সাঁতরে বড় বড় নদা পেরোতে পারবেন না, ঘোড়ায় চাপতে জানেন না, মোটর চালাতে জানেন না, সাইকেল চালাতে পারেন না। আপনি সহজেই ধরা পড়ে যাবেন।

এ কথার জবাবে মাস্টারদা মৃতু হাসতেন। বাহুবলের বদলে বুদ্ধিবলই তাঁকে বিপ্লবী নেতার শ্রেষ্ঠ আসন দিয়েছিল। তাই শক্তিশালী বীর সহকর্মীরা যখন একে একে ধরা পড়ে, তিনি ধরা পড়েন না। তাঁরা বন্দী হওয়ার বহুকাল পর পর্যন্ত তিনি একা বিপ্লবী আন্দোলন চালিয়ে যান।

চট্টগ্রাম জেলার বাইরে লুকোবার জন্য তাঁর কাছে বহু অনুরোধ আসে বিপ্লবীদের তরফ হতে। কিন্তু তিনি নিজের মাতৃভূমি ছেড়ে বাইরে যেতে রাজী হন না। বন্দীত্ব বা মৃত্যুর ভয়ে নিজের কাজ বন্ধ করে লুকিয়ে থাকার মানুষ তিনি নন।

অবশেষে পুলিশ যখন চট্টগ্রাম জেলার উপর বড় বেশা নজর দেয়, তখন তাদের দৃষ্টি অন্যত্র নেওয়ার জন্য তিনি চট্টগ্রামের বাইরে কয়েকটি কাজের পরিকল্পনা করেন। কুমিল্লার ম্যাজিস্ট্রেট ড্রুনো ও ঢাকার পুলিশ সাহেব এলিসনকে তিনি চিরতরে সরিয়ে দিতে চান।

১৯৩১ সালের ২৮ শে অক্টোবর। সেদিন জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ

ভদ্রলোকে প্রকাশ্য রাজপথে ধূলিশয্যা নিতে হল চট্টগ্রামের দুই তরুণ বিপ্লবী সরোজ গুহ ও রমেন ভৌমিকের অব্যর্থ গুলিতে।

এলিসনকে প্রকাশ্য রাজপথে দিবা দ্বিপ্রহরে সশস্ত্র পাহারা সত্ত্বেও হত্যা করে সরে পড়ে মাস্টারদার প্রেরিত বালক। পুলিশ বহু চেষ্টা করে। বহু পুরস্কার ঘোষণা করেও হত্যাকারীকে ধরতে পারে না। আজ পর্যন্ত হত্যাকারীর নাম পুলিশের অজানা। আজ আর সেই নাম প্রকাশে কোন বাধা নেই। দুঃসাহসী তরুণ শৈলেশ রায় এই কৃতিত্বের অধিকারী।

ঘটনাস্থল হতে বহু দূরে ভিন্ন জেলার এক গণ্ডগ্রামের গুপ্ত আশ্রয়ে বসে মাস্টারদা যে প্ল্যান করেছিলেন তা কত বিস্ময়কর এতেই প্রমাণিত হয়।

বিপ্লবী সূর্য সেনের কর্মক্ষমতা এত বিস্ময়কর যে তাঁকে যারা জানে না তাদের অবিশ্বাস্য বলে মনে হবে।

আমরা ধরি মৃত্যু-রাজার যজ্ঞ-ঘোড়ার রাশ,
মোদের মৃত্যু লেখে মোদের জীবন-ইতিহাস।
দারুণ উপপ্লবের দিনে আমরা দানি শির,
মোদের মাঝে মুক্তি কাঁদে বিংশ-শতাব্দীর।

—নজরুল

তারিণী মুখার্জি হত্যার মামলায় রামকৃষ্ণের প্রাণদণ্ড হয়। কালির বয়স খুব অল্প বলে ফাঁসির বদলে দ্বীপান্তর হয়।

রামকৃষ্ণ ফাঁসির দড়ি গলায় পরতে এগিয়ে চলেছে দেখে প্রীতিলতা স্থির থাকতে পারে না। সে সব কিছু তুচ্ছ করে ঝাঁপিয়ে পড়ে বিপ্লবের ঘূর্ণিস্রোতে।

রামকৃষ্ণের ফাঁসির পর প্রীতিলতা চট্টগ্রামে চলে আসে।

এক রাত্রের অন্ধকারে লুকিয়ে লুকিয়ে মাস্টারদা প্রীতিলতার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আসেন।

আমি শুনেছি প্রীতিলতা, তুমি অমিতা দাস সেজে রামকৃষ্ণের সঙ্গে বহুবার সাক্ষাৎ করেছো।

রামকৃষ্ণদাকে মুক্ত করার ইচ্ছে ছিল, গোপনে সেলের নকল চাবি দেবার চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু আমি পারলাম না, মাস্টারদা।

আমার ধলঘাটের গুপ্ত আশ্রয়ে এসে সব কথা তুমি শুনিও। পরশু রাত্রে তুমি প্রস্তুত থেকো, আমি ছেলে পাঠাবো।

বিপ্লবীদের ধলঘাটের গুপ্ত আশ্রয়কেন্দ্র খুব নিরাপদ স্থান। আশ্রয়দাত্রী সাবিত্রী দেবী বিপ্লবীদের পুত্রের ন্যায় স্নেহ করতেন। বিপন্ন বিপ্লবীদের নিশ্চিন্ত বিশ্রামের প্রয়োজন হলে এখানে তাঁরা

আসতেন। তাঁরা এই কেন্দ্রের নামকরণ করেছিলেন 'স্যানা-টোরিয়ম'।

মাস্টারদা সম্প্রতি চট্টগ্রামের বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানের এক ইতিহাস লেখা শুরু করেছেন, তাঁর সহকর্মীদের কাজের সব কথা তিনি সংগ্রহ করে লিপিবদ্ধ করছেন ভবিষ্যৎ ঐতিহাসিকদের জন্য। রামকৃষ্ণের শেষ দিনগুলির কথা তিনি প্রীতিলতার কাছ থেকে শুনতে চান।

নির্মল সেন মাস্টারদাকে বলেন, কদিন ধরে আমি মাকে স্বপ্নে দেখছি। মা যেন এসে আমায় ডাকছেন।

সন্ন্যাসিনী মৃতা মাতা প্রত্যহ স্বপ্নে সন্তানকে দেখা দেন। ছেলেকে কি নিজের কাছে এবার তিনি টেনে নিতে চান? মাস্টারদা চিন্তিত হন।

প্রীতি এখনো এলো না কেন, নির্মলবাবু?

ভাববেন না। অপূর্ব তাকে নিরাপদেই নিয়ে আসবে।

রামকৃষ্ণ তো বিশেষ করে অনুরোধ করে গেছে প্রীতিকে কোন কাজের দায়িত্ব দেবার জন্য। অবশ্য প্রীতির আগ্রহেই সে ওই অনুরোধ জানিয়েছে।

বেশ তো! প্রীতিকে পাঠানো যাবে কোন কাজে।

সেই কথাই আমি গভীর ভাবে ভাবছি। ভাবছি ভারতের বিপ্লবের ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায় লেখার চেষ্টা করবো কিনা কোন নারীকে নেতৃত্বের দায়িত্ব দিয়ে।

তাহলে প্রীতিই হোক সেই প্রথম নারী। কোমলতা ও কঠোরতা ওর মধ্যে অদ্ভুত ভাবে মেশান আছে।

এমন সময় বাইরের দরজায় তিন বার মৃদু টোকা পড়ে। প্রীতি ও অপূর্ব আসে। প্রীতি মাস্টারদাকে প্রণাম করে।

আশীর্বাদ করে মাস্টারদা জিজ্ঞাসা ক'রেন, আসতে কোন কষ্ট হয় নি তো?

না। প্রীতি নির্মলকে প্রণাম করতে যায়।

থাক্! থাক্! এ সব আমি sentimentএর প্রশ্রয় দেওয়া বলে মনে করি।

মাস্টারদা মৃদু হেসে বলেন, আদত কথা নির্মলবাবু কখনো নিজেকে prominenceয়ে আনতে চান না। আর তাই এগুলো উনি scene create করা মনে করে এড়াতে চান।

তাই বলুন। নইলে নির্মলদার মুখে sentimentএর নিন্দা ঠিক মানায় না।

নির্মল প্রশ্ন করেন, কি রকম?

Sentiment তো আপনার মধ্যে ভীষণ প্রশ্রয় পেয়েছে। শত বিপদে দুঃখে কষ্টে মাস্টাবদার সঙ্গ ছাড়ছেন না, ছায়ার মত একত্রে আছেন। দরদ, ভালবাসা, শ্রদ্ধা এসব sentimentতো আপনি উড়িয়ে দিতে পারেন নি।

মাস্টারদা হেসে উঠেন।

ওদিকে আশ্রয়দাত্রী সাবিত্রী দেবীকে তাঁব মেয়ে বলে, নিশ্চয়ই খুব লেখাপড়া জানা মেয়ে। দেখছো না কি রকম ভাবে কথা বলছে, আবার ইংরিজিও বলছে। হ্যাঁ, মা, খুব বড়লোকের মেয়ে নয়?

কি করে জানবো বল। শুধু জানি আজ রাত্রে ও এখানে খাবে।

ওমা! কিন্তু ওকে কি আমাদের রান্না এসব ছাই পাশ দেওয়া চলে? আর দেবেই বা কিসে? বাসন-কোসন তো কিছু নেই।

সে যা হয় হবে'খন। পাতাতেই খাবে।

কি যে বলো! দেখি, আমি পাশের বাড়ি থেকে থালা বাটি চেয়ে আনি।

নির্মল প্রীতিলতাকে বলেন, নিজের দুঃখ-কষ্ট আমি বিশেষ বোধ করি না। দুঃখ হয় যে মাস্টারদার মত লোক কত কষ্টই না ভোগ করছেন। চোরের মত ভয়ে ভয়ে ফিরতে হয়, খুনী আসামীর মত লোকালয়ের বাইরে থাকতে হয়, কুকুর বেড়ালের মত এক মুঠো

আহারের জন্য দ্বারে দ্বারে ঘুরতে হয়। অনাহার, অর্ধাহার আর অনিদ্রায় দিন কাটান—

প্রীতি ব্যাকুল ভাবে বেদনার্ত কণ্ঠে বলে, আর বলবেন না—আর বলবেন না।

মাস্টারদা ধীরভাবে বলেন, বিপ্লবীদের জীবন এমনই হয়। এর জন্য আক্ষেপ করে কোন লাভ নেই।

নির্মল বলেন, আক্ষেপ করি না। আমাদের এক মাত্র সান্ত্বনা যে ভাবী কাল আমাদের এ আত্মত্যাগের মূল্য দেবে।

হ্যাঁ। স্বাধীনতার জন্যই এই দুঃখ বরণ। স্বাধীন হওয়ার সাথে সাথে সব দুঃখ-কষ্ট আমাদের ঘুচবে।

•

সাবিত্রী দেবীর কন্যা থালা বাটি আনতে গিয়ে পাশের বাড়ির বধূকে বলে, আমরা দুঃখ-কষ্টে কোন রকমে দিন কাটাতে পারি। কিন্তু অতিথির কষ্ট সহ্য করি কেমন করে?

তা এতো রাত্রে অতিথিই বা এলো কে?

বধূটির স্বামী কান খাড়া করে পাশের ঘর হতে জবাব শোনার চেষ্টা করে।

অতিথির কি আর সময় বিচার আছে? বাড়িতে এসে দু'মুঠো খেতে চাইলে তাকে ফেরাই কেমন করে?

মেয়েটি চলে যেতেই বধূটির স্বামীও তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়ে।

মাস্টারদার কাছে প্রীতি আবদার করে, মাস্টারদা, আজ রাত্রে কিন্তু আমি আপনাদের রেঁধে খাওয়াবো।

মাস্টারদা মৃদু হাসেন।

না, না—আপনার আপত্তি আমি শুনবো না। কত দিন ভাল করে খেতে পান নি। আর আমারও অনেক দিনের ইচ্ছে একদিন আপনাদের ভাল করে খাওয়াবো।

প্রীতি রান্নার কাজে মেতে উঠে। অপূর্ব তাকে সাহায্য করে। হ্যারিকেনের আলোর কাছে বসে মাস্টারদা এক মনে লিখে চলেন। নির্মল সেন অভ্যাস মত অস্ত্রগুলি পরিষ্কার করা শুরু করেছেন।

এমন সময় হঠাৎ দরজায় আঘাত হয়। আশ্রয়দাত্রীর মেয়ে উঠে দৌড়ে দরজা খুলতে যায়। মাস্টারদা তাকে বারণ করেন। সে শুনতে পায় না, দরজা খুলেই ভয়ে চেঁচিয়ে উঠে, পুলিশ !

সঙ্গে সঙ্গে এক ঝলক টর্চের আলো এসে ঘরের মধ্যে পড়ে। মাস্টারদা তাড়াতাড়ি আলো নিবিয়ে দিয়ে চাপা গলায় বলেন, সিঁড়ি দিয়ে উপরে চলো।

অন্ধকার হতে নির্মল সেনের রিভলভার গর্জন করে গুলি বর্ষণ করে প্রবেশোন্মুখ ক্যাপ্টেন ক্যামেরনের উপর। সাহেব পড়ে যায়। তার সঙ্গীরা ভয়ে দরজার কাছে সরে যায়।

ইতিমধ্যে অপূর্ব, প্রীতি, নির্মল ও মাস্টারদা সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠেন। জানলা খুলে দেখেন সারা বাড়ি পুলিশে ঘিরে ফেলেছে।

বিপ্লবীরা গুলি ছোঁড়েন। ওপক্ষ হতেও জবাব আসে। গুলি চলে, দু'চার জন মিলিটারি পড়ে যায়।

একদিকের জানলা খুলে মাস্টারদা দেখেন।—এ দিকে কারুকে দেখা যাচ্ছে না। এসো—এপথে পালানো যাক্ !

জানলা দিয়ে তিনি টিনের চালে নামতে উদ্যত হন।

দাঁড়ান ! আপনার জীবনের দাম অনেক। আমি প্রথমে যাবো, দেখি কেউ—বলতে বলতে নির্মল মাস্টারদাকে সরিয়ে জানলা দিয়ে নামতে যান। কিন্তু তাঁর মুখের কথা শেষ হবার আগেই বুকে গুলি লাগে। তিনি বুকে হাত দিয়ে ঘরের মধ্যেই ঘুরে পড়েন।

হঠাৎ অন্যদিক হতে অপূর্ব চেঁচায়, এ দিকটা ফাঁকা আছে, শীগ্গির আসুন-সব।

যান, যান সূর্যবাবু! একজন মুমূর্ষুর জন্য কি সকলে মারা পড়বে? নির্মল সেন বলেন।

এ অবস্থায় কেমন করে ফেলে যাই?

চিরদিনের লাজুক নেতা নির্মল—যিনি কোনদিন কাকেও কোন আদেশ করেননি, শুধু অনুরোধই করেছেন—আজ অন্তিম মুহূর্তে যন্ত্রণা কাতর কণ্ঠে বলেন, অপূর্ব, my last command—take away Masterda.

Save Masterda···run away···my dying request.

মাস্টারদা উঠে দাঁড়াবার পূর্বে নির্মলের একটি হাত একবার মুঠোর মধ্যে টেনে নিয়ে শুধু বলেন, Good-bye!

Good-bye!

নির্মল চেষ্টা করেন উঠে সঙ্গীদের নির্বিঘ্নে অন্তর্ধান দেখবার, কিন্তু না পেরে আবার সশব্দে মাটিতে লুটিয়ে পড়েন।

মাস্টারদা প্রীতিকে টেনে নিয়ে কক্ষ ত্যাগ করেন।

নালা ও ঝোপ জঙ্গলের মাঝখান দিয়ে গুলি ছুঁড়তে ছুড়তে পুলিশব্যূহ ভেদ করে এঁরা দৌড়ন।

অপূর্ব সেন গুলি বিদ্ধ হয়ে পড়ে যায়। ধলঘাট যুদ্ধের দ্বিতীয় শহীদ সে।

মাস্টারদা প্রীতির হাত ধরে অন্ধকারে অদৃশ্য হন।

১৯৩২ সালের তেরোই জুন ঐতিহাসিক ধলঘাট সংঘর্ষের বিশদ বর্ণনা প্রীতিলতার ডায়েরীতে ইতিহাসের মর্যাদা নিয়ে অক্ষয় হয়ে আছে। নির্মল সেন ও অপূর্ব সেনের বীরত্বব্যঞ্জক মৃত্যুর বিবরণ তিনি নিজের হাতে লিখে রেখে গেছেন—

"এইদিন নির্মলদা যে সমস্ত কথা বলে যাচ্ছিলেন তাতে মনে হয়, নির্মলদা বুঝতে পেরেছিলেন যে তাঁর যা কিছু বলার আছে সেইদিনই বলে ফেলতে হবে, না হলে হয়তো আর বলা হবে না।···

…আশ্চর্য ! মাস্টারদার সঙ্গে এই দুই দিন ধরে বেশী কথা বলিনি, সারাদিন প্রায় নির্মলদার সঙ্গেই বসেছিলুম। ইহজীবনের সব কথা যেন একদিনেই শেষ করেছিলাম।

সেদিন সকালবেলা ভোলার (অপূর্ব সেন) জ্বর। এই জ্বর গায়েই সারাদিন কমিক করেছে। এই আনন্দের জীবন্ত নির্ঝরটাকে যতই দেখছিলাম, ততই যেন মুগ্ধ হয়ে যাচ্ছিলাম !

নির্মলদা বলছিলেন,—এই ভোলা হল মাস্টারদার এ্যাসিস্ট্যাণ্ট। ও বেশ ইংরেজী জানে, ওকে দিয়ে তিনি কত কিছু লেখান।

তারপর বলে যেতে লাগলেন,…এর মধ্যে ভোলা একদিন বাড়ি গিয়েছিল। বাড়িতে তার সাতজন বৌদি। বাড়ি গিয়ে বৌদিদের বলেছিল, তোমরা ফল-ইন করো, আমি কম্যাণ্ড করছি।

বৌদিরা লাইন বেঁধে দাড়ালে ওর প্রণাম করার সুবিধা হবে।

কথাটা শুনে আমার ভারী চমৎকার লাগল। আজ ভাবছি, ওই রকম করে বিদায় নেয়াটা ওকেই সাজে।

…নির্মলদা বললেন, মাস্টারদার শেষ কাজটি এখনও বাকি। সেটি হলো ফিমেল এ্যাকসন ! মেয়েদের দিয়ে শক্তির খেলা দেখানো।

আমি চললাম,—আমার বড্ড মরতে ইচ্ছা করছে।

নির্মলদা বললেন,—তুই কিসের জন্য মরবি ?

কে জানতো যে কয়েক ঘণ্টা পরেই মৃত্যু এসে হাজির হবে, নির্মলদাকে বেঁধে নিয়ে যাবে, আমাকে স্পর্শও করবে না।

ভোলার জন্য সাবু জ্বাল দিতে আমাকে এবার নিচে পাঠিয়ে দিল।

আমি যখন সাবু রান্না করছি, ভোলা তখনও গুণগুণ আবৃত্তি করে চলেছে—

"হৃদয় আমার নাচেরে আজিকে ময়ূরের মত নাচে রে"…

সাবুটা ঠাণ্ডা করে লেবু আর চিনি মিশিয়ে ভোলাকে খাওয়ালাম। আমার হাতে এ জীবনের শেষ খাওয়া সে খেয়ে নিল।

স্মৃতির বোঝা আর ভারী না করলে ভগবানের উপর খুশি হব, এবং করলেও অনুযোগ করব না।

তারপর ভাত খাওয়ার ডাক পড়ল। নির্মলদা খাবেন না আগেই বলে দিয়েছেন।

আমি সাধারণতঃ নির্মলদার পাতেই বসে খেতাম।

এবার মাস্টারদার সঙ্গে এক সঙ্গে খেতে দিয়েছে দেখে এক দৌড়ে উপরে ছুটে গেলুম,—উদ্দেশ্য নির্মলদাকে সেধে নিয়ে আসা।

বিছানায় শুয়ে শুয়ে না জানি তিনি তখন কোন অমর লোকের ধ্যানে মগ্ন ছিলেন।

আমি গিয়ে বললাম,—মাস্টারদার সঙ্গে খেতে লজ্জা করছে।

কথা শুনে নির্মলদা হেসে আকুল, বললেন,—কেমন জব্দ এবার!

ঠিক এই সময় মাস্টারদা নিচ থেকে বিদ্যুৎবেগে ছুটে এসে বললেন,—পুলিশ এসেছে!

বুঝলাম,—এই মুহূর্তেই সব শেষ হয়ে যাবে।

ওঁদের বললাম,—আমি আপনাদের সঙ্গেই থাকব।

মাস্টারদা চোখ বড় বড় করে আদেশের স্বরে বললেন—নিচে মেয়েদের মধ্যে চলে যাও! তাঁদেরই আত্মীয় বলে পরিচয় দিও!

থতমত খেয়ে নিচে নেমে গেলাম মই বেয়ে।

এই সময় উপরে ভোলা, নির্মলদা ও মাস্টারদা।

ততক্ষণ ক্যাপ্টেন ক্যামেরণ রিভলভার হস্তে মই বেয়ে উপরে উঠতে আরম্ভ করেছে।

নির্মলদা দাঁড়িয়ে গুলি করলেন।

সাহেব ক্যাপ্টেন ক্যামেরণ গুলিবিদ্ধ হয়ে মাটিতে পড়ে গেল। দুদিক থেকেই গুলি চলতে লাগল।

মাস্টারদারা উপর থেকে—পুলিশবাহিনী নিচে থেকে।

গুড়ুম গুড়ুম আওয়াজের প্রনিধ্বনি হতে থাকল রাত্রির আকাশে, দু একটা জয়ধ্বনিও আমার কানে গেল।

গুলি চলল অবিরাম, অন্ধকার ঘর, অন্ধকার বাহির।

হঠাৎ নির্মলদার আর্তনাদ শুনতে পেলুম।

আর স্থির হয়ে থাকতে পারলুম না। উপরে উঠতে গেলাম, নিচের মেয়েরা তিনজনেই চেপে ধরল আমাকে।

ওদিকে নির্মলদার ব্যথা-করুণ কণ্ঠ—'রাণী, রাণী।'

প্রাণপণ চেষ্টা করলাম একবার উপরে যেতে। ওঁদের কত ভয় দেখালাম, কত চোখ রাঙালাম, ছোট মেয়েটিকে একটি ঘুসিও দিলাম। কিন্তু কিছুতেই ওরা ছাড়ল না।

কাতর কণ্ঠে মিনতি করে বললাম, ওগো, আমাকে একটিবার ছেড়ে দাও—তবুও ছাড়ল না।

প্রাণপণ করে একবার ওদের হাত ছাড়িয়ে মইটার অর্ধেকটা যেতে পেরেছিলাম, ওরা ছুটে গিয়ে আমাকে ফেলে দিল।

তখন উপর থেকে নির্মলদার আর্তস্বর,—রাণী, রাণী, রাণী—প্রাণ কেড়ে নেওয়া এই ডাক আমাব আর সহ্য হচ্ছিল না।

এই অন্তিম সময়েও যদি একটিবার নির্মলদার কাছে যেতে পারতুম, জানি না আমায় কী বলতেন।

ভগবান আমাকে একটিবার নির্মলদাকে দেখে আসতে দিলেন না। এই ব্যর্থতা প্রতিনিয়ত আমার বুকে বিঁধে বিঁধে ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে দিতে চাচ্ছে। এক একবার মনে হচ্ছিল—আর কি চাই! যাবার পথে বারে বারে কত ডেকে গেলেন।

এমন সময় মাস্টারদা ও ভোলা (অপূর্ব সেন) নিচে নেমে এলেন দেখে ভারী আনন্দ হল। এতক্ষণ মনে হচ্ছিল—ওঁরা কেউ আর বেঁচে নেই।

মাস্টারদা আমাকে পরম স্নেহভরে বললেন,—তোকে এখন কোথায় নিয়ে যাব? তোর জীবনটাই মাটি করলাম।

আমি মাস্টারদার পায়ের উপর উপুড় হয়ে বললাম,—মাস্টারদা আমাকে ফেলে যাবেন না। আমি আপনাদের সঙ্গেই যাব।

এই সময় আমি দৃঢ় প্রতিজ্ঞ যে মাস্টারদার সঙ্গ ছাড়ব না।

মাস্টারদার পাশেই তখন ভোলা দাঁড়িয়েছিল। চোখের একটি পলকে তাকে আর একবার দেখে নিলাম।

কি চমৎকার লেগেছিল ভোলাকে! এতবড় বিপর্যয়ে তার এতটুকু চাঞ্চল্য নেই। রিভলভারের ট্রিগারে আঙ্গুলটি রেখে মাস্টারদার আদেশের অপেক্ষায় আছে।

মাস্টারদা বললেন,—চলো!

তিনজনেই রওনা হলুম। ভোলা চলল পথ দেখিয়ে আগে আগে।

শুকনো পাতার উপর পায়ের খস্ খস্ শব্দ হতেই অন্ধকারের বুক চিরে শব্দভেদী গুলি এসে ভোলার বক্ষ ভেদ করল।…

…রামকৃষ্ণদা বলেছিলেন,—ভোলার সাথে আলাপ করতে। আলাপের চূড়ান্ত হয়ে গেল।

দুদিন ধরে কেবল ওর হাসি শুনছিলাম, অবশেষে আমারই দু-চোখের সামনে সে মরণের কোলে ঝাঁপিয়ে পড়ল।…”

ধলঘাটের খণ্ডযুদ্ধের পর বিপ্লবীরা সব বিভিন্ন গুপ্ত কেন্দ্র হতে এসে একত্রে মিলিত হন পরবর্তী সংগ্রাম সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত করার জন্য। কল্পনা ও প্রীতিলতাও আসে।

দলের নেতাদের মধ্যে নির্মল সেন প্রথম মারা গেলেন। তাঁর মৃত্যুতে সকলেই মর্মান্তিক আঘাত পায়। তিনি ছিলেন সবার প্রিয় পাত্র। নেতা হয়েও কোনদিন নিজেকে নেতা বলে জাহির করেন নি। ছেলেদের সঙ্গে এত ঘনিষ্ঠ ভাবে মিশতেন যে তারা প্রাণ খুলে অবাধে তাঁর কাছে সব কথা বলতো। অন্যান্য বিপ্লবী নেতাদের ছেলেরা যতটা শ্রদ্ধা বা সমীহ করতো, নির্মলকে ঠিক ততটা ভালবাসতো।

নির্মল সেনের মৃত্যুর প্রতিশোধ নিতে সবাই বদ্ধপরিকর।

ছেলেরা বলে, রক্তের বদলে আমরাও আজ রক্ত চাই, মাস্টারদা। মৃত্যুর বদলে মৃত্যু!

কল্পনা বলে, এবার আমাদের কাজ দিন মাস্টারদা।

দেবো, বোন। তোমাদের উপর এক গুরু দায়িত্ব দেবো।

প্রীতি বলে, তাই যদি দেবেন, তবে আর দেরি করবেন না, দ্বিধা করবেন না।

মাস্টারদা একটু হেসে বলেন, দ্বিধা করছি না, চিন্তা করছি।

কিন্তু আমি যে আর স্থির থাকতে পারছি না। সব সময় যেন চোখের সামনে ভাসে আহত রক্তাক্ত নির্মলদার মৃত্যুর ছবি, কানে বাজে বন্দী রামকৃষ্ণদার শেষ কথাগুলি।

ছেলেরা বলে, মৃত বন্ধুদের আমরাও ভুলতে পারছি না মাস্টারদা।

কালি দে বলে, জালালাবাদে বৃটিশ বুলেটে যে বন্ধুরা মারা গেছে, বৃটিশের রক্তেই তাদের তর্পণ আমবা করবো।

ইউরোপীয়ান ক্লাব আক্রমণ করতে গিয়ে আমরা আঠারোই এপ্রিল বিফল হই ঈস্টারের বন্ধের জন্য। তারপর দেবু, মনোরঞ্জন, রজত স্বদেশ এরা মারা গেছে কালারপোলে।—ওদের কাজ আমরা শেষ করবো।

মাস্টারদা তাঁর সিদ্ধান্ত সকলকে জানান,—পাহাড়তলীর ইউরোপীয়ান ক্লাব আক্রমণ করা হবে। তোমরা সব খবর জোগাড় করো, প্রস্তুত হও। আর এই আক্রমণের নেতৃত্বের ভার প্রীতি-কল্পনা তোমাদের দিলাম।

কালি দে ইউরোপীয়ান ক্লাবের এক বাবুর্চির কাছ হতে প্রয়োজনীয় সব খবর জোগাড় করে। টাকা দিয়ে তাকে হাত করে নেয়।

ছেলেরা এদিকে রাইফেলের নল কেটে ছোট করে নেয়, যাতে লুকিয়ে সঙ্গে নিয়ে যেতে বিশেষ অসুবিধা না হয়। নতুন বোমা ইত্যাদি তৈয়ারি করা হয়।

কাটলী গ্রামের গোপন কেন্দ্রে তারকেশ্বর দস্তিদার প্রীতিলতাকে রাইফেল ও বোমা ছুঁড়তে শেখায়।

সমস্ত আয়োজন সম্পূর্ণ হয়। আক্রমণের আগে কল্পনা পুরুষের ছদ্মবেশে তিন জন সঙ্গীসহ সরজমিনে তদারকে যায়। কিন্তু দুর্ঘটনা-ক্রমে সে ধরা পড়ে। কল্পনার ছদ্মবেশ ও চাল-চলন নিখুঁত হয়েছিল কিন্তু যে ঘোড়ার গাড়ি করে তারা এসেছিল, তার চালকের সন্দেহের কারণ হয় কল্পনার কণ্ঠস্বর। গাড়ির ভিতর এরা যখন নিজেদের মধ্যে

কথা বলছিল তখন সে এক নারীর কণ্ঠস্বর কানে শোনে, কিন্তু চোখে দেখে আরোহী ক'জনই পুরুষ। সে পুলিশে খবর দেয়। পুলিশ পুরুষ বেশী কল্পনাকে ধরে ফেলে, কিন্তু অনেক মাথা ঘামিয়েও তার ঐ বেশ ধারণের সঙ্গত কোন কারণ খুঁজে পায় না। গভীর রহস্যের ইঙ্গিত পেলেও কোন সমাধান পুলিশ করতে পারে না।

কল্পনার গ্রেপ্তারের জন্য আক্রমণের দিন এক সপ্তাহ পিছিয়ে যায় এবং আক্রমণের সম্পূর্ণ নেতৃত্ব পড়ে প্রীতির উপর।

আক্রমণের দিন। সকলে যথারীতি প্রস্তুত হচ্ছে। প্রীতিলতার পরণে পায়জামা ও পাঞ্জাবি, মাথায় পাগড়ি। কর্মব্যস্ত তাকে আজ খুব উৎফুল্ল দেখায়।

সঙ্গীদের সে বলে, তোমাদের অস্ত্রগুলি সব দাও তো, ভাই।

কেন, প্রীতিদি ?

ওগুলোকে পূজো করবো।

পূজো! সে কি! বিপ্লবীরা একটু বিস্মিত হয়।

হ্যাঁ, ভাই। ভগবানে বিশ্বাস করি, কাজেই তাঁর আশীর্বাদও প্রার্থনা করি।

এ নেহাৎ ছেলেমানুষি!

তাহোক—নিষ্ঠাবতী প্রীতি বন্দুকগুলি একত্রে সাজিয়ে তার উপর রক্তজবার মালা রাখে। সকলের কপালে সিঁদুরের ফোঁটা দেয়। মনে মনে সকলের মঙ্গল কামনা করে। আর এক ইচ্ছা প্রীতির মনে জাগে, যাবার আগে একবার মাস্টারদার দর্শন। সে সময় বহুদূরের এক গুপ্ত আশ্রয়ে তিনি আছেন।

মাস্টারদা বোধ হয় অন্তর্যামী। নইলে এদের যাত্রার পূর্বে হঠাৎ তিনি উপস্থিত হন কেমন করে একটি ছেলেকে সাথে নিয়ে মুসলমান মাঝির ছদ্মবেশে! তাঁর এই অদ্ভুত নাটকীয় আবির্ভাবে সবাই অবাক হয়।

প্রীতি প্রশ্ন করে, আপনি কি মনের কথা টের পান?

একজন অনুযোগ করে, আপনি কেন এলেন গুপ্ত স্থান ছেড়ে? এ রকম ভাবে বাইরে বেরোলে যে আপনার ধরা পড়ার ভয় আছে।

মাস্টারদা একটু হেসে বলেন, তোরা সবাই আজ কাজে বেরুচ্ছিস, আর আমি লুকিয়ে বসে থাকবো। যাবার আগে নিজে একবার স্বচক্ষে সব দেখে না দিলে নিশ্চিন্ত হতে পারি না। অনন্তলাল আমার এই অভ্যাস করে দিয়েছে। সে নিজে সব কিছু করলেও শেষ মুহূর্তে প্রতিটি খুঁটিনাটি আমাকে দিয়ে একবার পরীক্ষা করিয়ে নিতো।

মাস্টারদা প্রত্যেকের অস্ত্রশস্ত্রগুলি পরীক্ষা করে দেখেন, প্রয়োজনীয় উপদেশ নির্দেশ দেন।

প্রীতি বলে, আপনার কাছে একটি অনুমতি চাই, মাস্টারদা।

বলো!

আমি ধরা দেবো।

পুলিশ তোমায় ধরে অপমান করবে এ আমি চাই না।

অপমান তারা আমায় করতে পারবে না। অপমানের চেয়ে মৃত্যু ভাল। আমি আত্মহত্যা করবো।

আত্মহত্যা আমি অপছন্দ করি। এ আমাদের নীতিবিরুদ্ধ।

কিন্তু আমার যে মরা প্রয়োজন, মাস্টারদা। নিরাপদে পালিয়ে এলে তো লাভ হবে না। সকলে জানবে না যে আজ মেয়েরাও সংগ্রামে যোগ দিয়েছে। দেশে চাঞ্চল্য আনার জন্য, মেয়েদের মধ্যে প্রেরণা আনার জন্য আমায় মরতে হবে।

প্রীতি!

মরে আমি জানিয়ে যাবো পাহাড়তলীর এই আক্রমণ আঠারোই এপ্রিলের সশস্ত্র অভ্যুত্থানেরই অঙ্গ, বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়।

প্রীতিলতা!—কিছু বলতে গিয়ে মাস্টারদা থেমে যান।

আশীর্বাদ করুন, মাস্টারদা।

প্রীতি প্রণাম করে। মাস্টারদা তার মাথার উপর ডান হাতখানি রাখেন।

নেতা সূর্য সেন কি ভেবেছিলেন বিপ্লবের ইতিহাসে নতুন অধ্যায় লেখা হবে নারী-কাহিনী নিয়ে নয়, নারী-শোণিত দিয়ে?

১৯৩২ সাল। ২৪শে সেপ্টেম্বর।

প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদারের নেতৃত্বে মহেন্দ্র চৌধুরী, সুশীল দে, শান্তি চক্রবর্তী, কালী দে, প্রফুল্ল দাস প্রমুখ গুটি কয়েক মৃত্যুভয়হীন তরুণ ইউরোপীয়ান ক্লাব আক্রমণ করল।

ক্লাবের কাছাকাছি অন্ধকার জঙ্গলের মধ্যে বিপ্লবীদল আত্মগোপন করে অপেক্ষা করে। দূর হতে দেখা যায় ক্লাবের হলে 'বল' নাচ চলেছে। বাইরে সারি সারি মোটর গাড়ি দাঁড়িয়ে। দ্বারে সশস্ত্র রক্ষী আছে তা সত্ত্বেও বিপ্লবীরা আক্রমণ করার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

তারা সঙ্কল্প করে—মরবো তবু বিফল হয়ে ফিরবো না।

আক্রমণের পদ্ধতি সম্বন্ধে প্রীতিলতা আর একবার সকলকে স্মরণ করিয়ে দেয়। বলে, আদেশ দিলেই এক সঙ্গে তিন দিক হতে আক্রমণ কবা হবে। আমার সঙ্গে সামনে একদল যাবে। পিছনে একদল ও বিলিয়ার্ড রুমেব দিকে একদল যাবে।

একজন ফিস্ ফিস্ করে বলে, মনে হয় আক্রমণের সময় হয়েছে, সব সাহেবই এসে জুটেছে।

ক্লাবের প্যানট্রির দিকের এক জানলা হতে এক বাবুর্চি টর্চের আলো বার কয়েক জ্বালিয়ে ও নিভিয়ে বিপ্লবীদেব কি এক অজ্ঞাত সঙ্কেত করে।

প্রীতি আদেশ দেয়, Attack!

জন চারেক করে এক একটি দলে তিন ভাগে বিভক্ত হয়ে

বিপ্লবীরা মাঠের মাঝে ছড়িয়ে পড়ে। তারা তীব্র বেগে ক্লাব লক্ষ্য করে দৌড়ায়। প্রীতি, কালি দে ও আর ছ'জন প্রধান ফটকে ঢুকতে যায়। রক্ষীরা হাঁকে, কোন হ্যয় ?

প্রীতি আদেশ দেয়, Rush in !

তারা ক্লাবের কোর্টইয়ার্ডের মধ্য দিয়ে দৌড়য়। পিছনে হল্লা উঠে পাকড়ো ! পাকড়ো !

ওদিকে ছুটি ছেলে লাফিয়ে বিলিয়ার্ড রুমের জানলায় উঠে ঘরের মধ্যে বোমা ছোঁড়ে। টেবিলের উপর বোমা পড়ে টেবিল চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যায়। ক্রীড়ারত কয়েকজন হতাহত হয়। পিছনের দলের চারজন গুলি ছুঁড়তে ছুঁড়তে ছুটে আসে।

হলের নাচ থেমে যায়! সকলে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে। ইতিমধ্যে প্রীতি দরজার কাছে এসে ঘরের ভিতর একটি বোমা ছোঁড়ে। বোমাটি সশব্দে ফাটে—তীব্র চীৎকার আর আর্তনাদ উঠে। কয়েকজন আহত ও নিহত হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। হুড়োহুড়ি, চীৎকার···চেয়ার-টেবিল উল্টে ফেলে কেউ কেউ পালাবার চেষ্টা করে···দমাদম গুলি চলে···ধোঁয়ায় চারদিক অন্ধকার মনে হয়।

ওরি মধ্যে দেখা যায় একটি সাহেব সাহস করে টেবিল থেকে মদের বোতল, গ্লাস, কাপ ইত্যাদি নিয়ে বিপ্লবীদের দিকে ক্রমাগত ছুঁড়ে মারার চেষ্টা করে। প্রীতির অব্যর্থ লক্ষ্যে সংগ্রামী সাহেব মাটিতে লুটোয়।

হঠাৎ রিভলভার হাতে এক মিলিটারি সাহেব এক কোণ থেকে ছুটে এসে প্রীতিকে গুলি করে। গুলি প্রীতির বাহুমূলে লাগে। প্রীতিও সাহেবটিকে গুলি মারে। কালি প্রীতির বন্দুকে গুলি ভরে দেয়। রক্তস্রোতে প্রীতির পাঞ্জাবি ধীরে ধীরে লাল হয়ে উঠে।

চারদিকে সার্চ লাইটের সঙ্কেত চলে। চারদিক হতে বিদ্যুৎ গতিতে মিলিটারি গাড়ি আসে ক্লাবের দিকে। একটি ছেলে হুইসেল বাজিয়ে চেঁচায়—মিলিটারি আসছে।

প্রীতি আদেশ দেয় Retreat ! Retreat !

অন্ধকার মাঠে বিপ্লবীরা দৌড়য়। পিছন হতে চীৎকার, সন্ধানী আলোর সঙ্কেত ও অনবরত গুলির শব্দ শোনা যায়।

প্রীতি দাঁড়িয়ে পড়ে হাঁপাতে হাঁপাতে প্রশ্ন করে, সকলে নিরাপদে ফিরেছে ?

হ্যাঁ। কিন্তু ও কি ? প্রীতিদি, তোমার জামা যে রক্তে ভেসে যাচ্ছে।

দৌড়ও সব। মাস্টারদা অপেক্ষা করে আছেন।

সকলে দৌড়ান শুরু করে। প্রীতি তাদের সঙ্গে সমতালে যেতে পারে না, পিছিয়ে পড়ে। সে সবার অলক্ষ্যে জামার পকেট হতে এক ছোট শিশি বের করে।

পিছন ফিরে কালি দে ডাকে, প্রীতিদি, তাড়াতাড়ি এসো !

প্রীতি মাটির উপর বসে পড়ে। বলে, তোমরা যাও ভাই।

কালি ছুটে কাছে আসে। কি হয়েছে ? বেশী জখম হয়েছ ? দৌড়তে না পারো তো বলো তোমায় কাঁধে তুলে নিই !

হাঁটু গেড়ে প্রীতির পাশে কালি বসে।

আমার কাজ শেষ হয়েছে ভাই। আমি বিষ খেয়েছি।

সে কি ! ছোট ছেলের মত কেঁদে সে প্রশ্ন করে, কেন ? কেন তুমি বিষ খেলে প্রাতিদি ?

অন্ধকারে নদীর মাঝখানে রয়েছে মাস্টারদার সাম্পান। তীর হতে নিঃশব্দে সাঁতার কেটে বিপ্লবীরা সেই সাম্পান লক্ষ্য করে আসে।

জল হতে একটি ছেলে মাথা তুলে এক হাতে সাম্পানের কানা ধরে। সাম্পানের উপর হতে ছায়ামূর্তি প্রশ্ন করে, সকলে ফিরেছে ?

সকলে ফিরেছি, শুধু—

শুধু ?

প্রীতিদি আর ফিরবে না, মাস্টারদা। ছেলেটির গলা কান্নায় বুজে আসে।

মাঠের মাঝখানে অন্ধকারে একটি মানুষ পড়ে আছে।

দূর থেকে খাকী পোষাক পরা টর্চ ও বন্দুক হাতে কয়েকজন দৌড়ে আসে।

টর্চের আলো পড়ে শায়িত শবের উপর···রক্তাক্ত পোষাক, এক হাতে একটি চিঠি আর এক হাতে রিভলভার পরিষ্কার দেখা যায়ঃ আরও দেখা যায় মাথার পাশে খসা পাগড়ির উপর এলায়িত কেশরাশি।

অবাক বিস্ময়ে তারা দেখে প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদারকে। স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রথম বিপ্লবী নারী-শহীদ।

'ফাঁসির রজ্জু ক্লান্ত আজিকে যাহাদের
টুঁটি চেপে।
যাহাদের কারাবাসে
অতীত রাতের বন্দিনী উষা ঘুম টুটি
ঐ হাসে।'
—নজরুল

প্রীতিলতাকে হারাবার পর গুপ্তকার্যের জন্য বিপ্লবীদের কল্পনাকে প্রয়োজন হয়। কল্পনা তখন জামিনে ছাড়া ছিল। পুলিশ তার বিরুদ্ধে আইন সঙ্গত অভিযোগ খুঁজছিল।

সকলের চোখে ধূলা দিয়ে আত্মগোপন করতে পারবে কিনা তাকে জিজ্ঞাসা করে পাঠানো হয়।

কল্পনা কোন দিন কোন কাজ পারবো না বলে না, 'অসম্ভব' শব্দ তার অজানা। তাই পুলিশের কড়া পাহারা সত্ত্বেও কল্পনা একদিন অন্তর্ধান করে।

পুলিশ ও বাড়ির লোকেরা তার কোন খোঁজই পায় না।

কল্পনা পুরুষের ছদ্মবেশে ও ছদ্মনামে বিপ্লবীদের সঙ্গে যোগ দেয় এবং একদিন মাস্টারদা ও তারকেশ্বরের সঙ্গে পুলিশ বেষ্টনী ভেঙ্গে রীতিমত লড়াই করে পালায়।

গৈরলা গ্রামে দলেরই ছেলে ব্রজেন সেনের বাড়ি সকলে একদিন সমবেত হন। ব্রজেনের বৈমাত্রেয় ভাই নেত্র সেন টের পায়। সম্ভবতঃ পুরস্কারের লোভেই সে থানায় গিয়ে খবর দেয়।

এদের গুপ্ত আস্তানায় দৌড়ে একটি ছেলে ঢুকে বলে, মিলিটারি—মিলিটারি ঘিরে ফেলেছে।

সকলে লাফিয়ে উঠে দাঁড়ায়। রিভলভারে গুলি ভরে নেয়।

মাস্টারদা জিজ্ঞাসা করেন, কি করে সন্ধান পেলো ?

নিশ্চয়ই কেউ বলে দিয়েছে।

বাড়ির চারধারে মিলিটারি বেষ্টনী !

গুলি ছুঁড়তে ছুঁড়তে বিপ্লবীরা বাড়ির বেড়া টপকায়। অবিশ্রান্ত গুলি ও সিগন্যাল ফায়ারিং চলে। আলোর ঝলক আসে অবিরাম।

অন্ধকারে পলায়মান কল্পনার পাশে আসেন মাস্টারদা। চাপা স্বরে বলেন, পথ খুঁজে পাচ্ছিস না ? আমার হাত ধর।

কল্পনার হাত ধরে খানিকটা দৌড়ান। হঠাৎ কল্পনা পা পিছলে পড়ে যায় পাশের পুকুরে। মণি দত্ত জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে সঙ্গে সঙ্গে।

কল্পনার কাছে এসে জিজ্ঞাসা করে, কে ? মাস্টারদা ?

আমি ভুলুদা। কল্পনার ছদ্মনাম ছিল ওই।

মাস্টারদা কোথায় ? মাস্টারদা ?

আমার সঙ্গেই তো ছিলেন।

পাড়ের ঐ বাঁশঝাড়ের আশ্রয়ে আসুন।

দুজনে বুকে হেঁটে হামাগুড়ি দিয়ে বাঁশঝাড়ের আড়ালে আসেন। চারদিকে অবিরাম গুলি চলে। এদের খুব কাছ দিয়ে পুলিশেরা ঘোরাঘুরি করে। অন্ধকারে তাদের জুতোর আওয়াজ, দ্রুত নিশ্বাসের শব্দ পরিষ্কার শোনা যায়। এরা নিশ্বাস রুদ্ধ করে থাকে।...

পুলিশ ব্যূহ ভেদ করে মাস্টারদা নিরাপদে বের হন। তিনি দাঁড়িয়ে পিছন ফিরে চারদিক দেখে নেন। আশপাশে কাউকে দেখতে পান না। সঙ্গীদের ফেলে একা পালাতে তাঁর মন চায় না। নেতা তিনি, অনুগামীদের কথাও তাঁকে ভাবতে হয়। কোঁচার খুঁটে কপালের ঘাম মুছে ধীরে সন্তর্পণে অগ্রসর হন।

এক বাঁশঝাড়ের আড়ালে দু' তিনজন পুলিশ দাঁড়িয়েছিল। পদশব্দে তারা প্রস্তুত হয়। মাস্টারদা কাছাকাছি এলে পিছন থেকে হঠাৎ তাঁকে জড়িয়ে ধরে। তিনি প্রাণপণে ছাড়াবার চেষ্টা করেন, কিন্তু মাস্টারদা একা তিনজনের সঙ্গে পেরে উঠেন না। তাছাড়া তারা তাঁর রিভলবার শুদ্ধ হাতখানি কায়দামত ধরে ফেলেছে।...

অন্যদিকে তখন কল্পনাকে মণি দত্ত ব্যাকুল হয়ে জিজ্ঞাসা করে, মাস্টারদা এখনো আসছেন না কেন?

বোধহয় অন্যদিকে পালিয়েছেন।

আমি ফিরে গিয়ে দেখবো।

কোথায় যাবেন? ভীষণ গুলি চলেছে ওদিকে।

যদি মাস্টারদা ধরা পড়ে থাকেন!

কল্পনা অস্ফুট আর্তনাদ করে উঠে!

মিলিটারি অফিসারের কাছে বন্দী মাস্টারদা ও ব্রজেনকে আনা হয়। অফিসার হাতের ছড়ি মাস্টারদার দিকে তুলে গর্জন করে, You devil! what's your name?

I am Surjya Sen.

অফিসারের হাতের ছড়ি শূন্য পথেই থেমে যায়। অবাক বিস্ময়ে হাঁ হয়ে সে এই নিরীহ দুর্বল খর্বাকার মানুষটির দিকে চায়। বিশ্বাস করতে পারে না এই লোক বিখ্যাত বিপ্লবী নেতা। শুধু বলে, My God!

আশপাশের মিলিটারিরা সসম্ভ্রমে সরে দাঁড়িয়ে বিস্ফারিত নেত্রে মাস্টারদাকে দেখে।...

মাস্টারদা ধরা পড়ার পর গুপ্ত আন্দোলনের নেতৃত্ব এসে পড়ে

তারকেশ্বরের উপর। পুলিশ বাকী পলাতক বিপ্লবীদের ধরার জন্য উঠে পড়ে লাগে, বর্মা হতে এক বিখ্যাত বদমাইস অফিসারকে আনা হয়। তাদের নির্যাতন মাত্রা ছাড়িয়ে যায়। পয়জকান্তি চৌধুরী নামে একটি ভাল ছেলেকে পুলিশ এমন মারে যে সে মারা যায়। তার বাপ-মা আত্মীয়স্বজনকে পুলিশ এমন ভাবে শাসায় যে এই হত্যাকাণ্ডের জন্য তাঁরা কোন মামলা করতে সাহস করেন না।

নেপাল দস্তিদারের উপর পুলিশ অকথ্য অত্যাচার করে কথা বের করার জন্য। ভাষার শ্লীলতা রক্ষার জন্য সে অত্যাচার বর্ণনা করা চলে না। অর্ধমৃত নেপালকে শেষে বিপ্লবীরা পুলিশেব কবল হতে উদ্ধার করে লুকিয়ে রাখে।

অবশেষে বিপ্লবীরা একে একে ধরা পড়ে। আশ্রয়দাতারাও রেহাই পায় না। বিধুগ্রাম কেন্দ্রে মণি ও কালির সঙ্গে আশ্রয়দাতা সপরিবারে বন্দী হন। রিভলভার বোমার সন্ধানে পুলিশ সেখানকার পুকুবের সমস্ত জল সেঁচে ফেলে।

কল্পনা ও তারকেশ্বর যে কেন্দ্রে ছিল সেখনে পুলিশের সঙ্গে খণ্ডযুদ্ধের ফলে এক বিপ্লবীর সাথে আশ্রয়দাতার সন্তানও নিহত হয়।

বিনোদ দত্তের সন্ধান পুলিশ পেলেও ধবতে পারে না, রিভলভার ছুঁড়তে ছুঁড়তে সে পালায়। ধরা অবশ্য সে একদিন পড়ল, তবে এগারো বছর পরে।

পলাতকদের মধ্যে নারায়ণ সেনেব কৃতিত্ব সবচেয়ে বড়, পুলিশ তার সন্ধান কোন দিনই পেল না। কলকাতায় পালিয়ে এসে দিব্যি স্বচ্ছন্দে সে বসবাস করে ছদ্ম পবিচয়ে। সম্প্রতি আত্মপ্রকাশ করেছে।

আর একজনের সন্ধান পুলিশ শত চেষ্টা করেও পায়না, সে হচ্ছে, নেত্র সেনের শাস্তিদাতা।

সেদিন নেত্র সেন তাড়াতাড়ি খেয়েদেয়ে শহরে যাবে সূর্য সেনকে

ধরানোর পুরস্কার আনতে। স্ত্রী রান্নাঘরের ভিতর ঢুকেছেন মাছের ঝোলের বাটি আনার জন্য। ফিরে এসে দেখেন ভাতের থালায় উপর পড়ে আছে নেত্র সেনের কাটা মুণ্ড এবং একটি চিঠি···সূর্য সেনকে ধরনোর পুরস্কার—মৃত্যু !

গোপনে একটি ছেলে এসে নিমেষের মধ্যে তলোয়ারের এক কোপে তাকে বধ করে গেছে।

'মুক্তি মোদের পরাণবঁধু, বন্দীশালা বাসর-ঘর
মরণ মোদের পিয়ায় মধু, কামান শোনায় বাঁশীর স্বর।'

—বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়

মাস্টারদার বিচার শুরু হয়। আদালতের কাঠগড়ায় তারের খাঁচার মধ্যে বন্দী মাস্টারদা তারকেশ্বরকে বলেন, ইংরেজ আমায় জীবিত রাখতে সাহস করবে না। কিন্তু তুমি বেঁচে যেতে পারো অনন্তদের মত। আমার মৃত্যুর পর আন্দোলন যাতে না থামে সে ভার নিও।

সকলে আশা করে মাস্টারদার ফাঁসি হবে না, কারণ তাঁর বিরুদ্ধে জোরাল সাক্ষ্য-প্রমাণ কিছু নেই।

অত্যন্ত সতর্ক নেতা তিনি ছিলেন। অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের অন্য বন্দী নেতাদের ডায়রি পুলিশ পেয়েছিল, বাড়িতে অস্ত্র-শস্ত্র ও আরও বহু প্রমাণাদি পায়। কিন্তু মাস্টারদা লিখিত কোন কিছু কাছে রাখতেন না, সব কিছু মস্তিস্কের মধ্যে থাকতো। বিপ্লবী দলের নিয়ন্তা তিনি, বিশ্বনিয়ন্তার মতই গোপনে কাজ করতেন। সবাই ভাবে অস্ত্র-আইন ভঙ্গের অপরাধে তাঁর কয়েক বছর কেবল জেল হবে হয়তো।

কিন্তু বিচার সব সময় আইনানুগ হয় না, মাস্টারদার অনুমানই সত্য হয়। আদালত তাঁর প্রাণদণ্ডাজ্ঞা দেয়। সেই সঙ্গে তারকেশ্বর দস্তিদারেরও।

ফাঁসির আগে জেল হতে মাস্টারদাকে মুক্ত করে আনার ব্যবস্থা

হয়। জেলের ভিতর গোপনে রিভলভার ও কার্টিজ পাঠাবার চেষ্টা করে ছেলেরা। আয়োজন সম্পূর্ণ হবার আগেই জেলখানার কাছে শৈলেশ্বব ধরা পড়ে যায়। পুলিশেরা তাকে ঘিরে ধরে। সে তাড়াতাড়ি এক কাগজের দলা মুখের মধ্যে ফেলে। একজন সঙ্গে সঙ্গে তার গলা টিপে ধরে যাতে না গিলতে পারে। আর একজন তার মুখে এক ঘুষি মেরে হাঁ করায়, কাগজের টুকরোটি বের করে। কাগজে ছিল মাস্টারদার পলায়নের পরিকল্পনা।

এই ঘটনার পর হতে মাস্টারদার সেলের সামনে চারজন মিলিটারি সর্বদা বন্দুক হাতে পাহারা দেয়। জেলের পাঁচিলের দুধারে কাঁটা তারের বেড়া দেওয়া হয়। রাত্রে সার্চলাইট চারদিকে ঘোরে।

মাস্টারদাকে মুক্ত করতে না পেরে বিপ্লবী বালকেরা মনস্থ করে শহরের সমস্ত সাহেবকে তারা হত্যা করবে মাস্টারদার ফাঁসির পূর্বেই। ক্রিকেট খেলার মাঠে সাহেবেরা সব সমবেত হতো। এরা ঠিক করে সাহেবদের বসবার চেয়ারগুলির তলায় ডিনামাইট রেখে তাদের সকলকে এক সঙ্গে উড়িয়ে দেবার।

দিবা দ্বিপ্রহরে চারটি ছেলে এই কাজের জন্য মাঠে যায়, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তারা পুলিশের নজরে পড়ে যায়। সেখানেই পুলিশের গুলিতে নিত্য ও হিমাংশু মারা যায়। হরেন ভট্টাচার্য ও কৃষ্ণ চৌধুরী ধরা পড়ে।

কৃষ্ণ ও হরেনের ফাঁসির সময় অম্বিকা চক্রবর্তী তাদের পাশের সেলেই ছিলেন। তাঁরও ফাঁসির হুকুম হয়েছে, কিন্তু তিনি আপীল করেছেন। সরকারের ঘোষণা অনুযায়ী তিনি তো মৃত। মৃত লোকের আবার ফাঁসী কি? আইনের প্যাঁচে তাঁর বাচার সম্ভাবনা রয়েছে।

কৃষ্ণ ও হরেনের মৃত্যু বরণের কাহিনী অম্বিকা সবই জানেন। কৃষ্ণের এই আক্রমণে অংশ গ্রহণ করাও এক আশ্চর্য ঘটনা। জালালা-

বাদ যুদ্ধের পর সকলকে যখন আত্মগোপনের নির্দেশ দেওয়া হয়, কৃষ্ণ তখন পাহাড়ীদের এক গ্রামে লুকোয়। তাদের সঙ্গে সে একেবারে মিশে যায়, বাঙালী কৃষ্ণ চৌধুরী রূপান্তরিত হয় জংলি পাহাড়ীতে। দিনের পর দিন চলে যায়, বছর কেটে যায়। কৃষ্ণের আকৃতি-প্রকৃতিও বদলে যায়। কিন্তু মন বদলায় না, প্রাণের আগুন নেভে না! তাই বহুকাল পরে একদিন সে শহরে ফিরে আসে, সহযোদ্ধাদের সন্ধান করে। কিন্তু কারও সঙ্গে সংযোগ করতে পারে না। সংবাদপত্রে এদের বৈপ্লবিক কার্যের আভাস বিদ্যুৎ চমকের মত মাঝে মাঝে মেলে। হঠাৎ কৃষ্ণ পরিচিত একজনকে একদিন পথে পায়। কিন্তু সে তাকে মোটেই চিনতে পারে না। এত পরিবর্তন কৃষ্ণের হয়েছে বেশ-ভূষা ও ভাষার। অনেক কষ্টে, অনেক প্রমাণ দিয়ে কৃষ্ণ তার ও অন্যান্য বিপ্লবীদের সন্দেহভঞ্জন করে।

ফাঁসির আগের রাত্রে অম্বিকা চক্রবর্তীর কাছে দুজনে বিদায় নেয়। বলে, দাদা, এতদিন বাদে এবার আমাদের পালা এসেছে। চল্লাম!

অম্বিকা চক্রবর্তীর চোখে জল আসে। ঘরছাড়া এইসব বালকদের পিতৃতুল্য তিনি। গৃহের স্নেহ-মায়া-মোহ বন্ধন ছিঁড়ে যাদের এই দুর্গম পথে এনেছিলেন, অপত্যস্নেহে আগলে রেখেছিলেন, আজ তাঁর বন্ধনও ছিন্ন করে তারা এগিয়ে চল্ল বিপ্লবী জীবনের চরম পরিণতির পানে।

পাশের সেল হতে কৃষ্ণ চেঁচিয়ে বলে, দাদা, দুঃখ করবেন না। মরতে হবে বলে আমাদের কোন দুঃখ নেই।

অন্যজনও জানায়, বরং আনন্দই হচ্ছে এই গৌরবময় মৃত্যুতে। আনন্দে গান গাইতে ইচ্ছে করছে।

সারারাত্রি অম্বিকা চক্রবর্তী শোনেন তরুণ বন্দী দুজনের সুমিষ্ট কণ্ঠের সঙ্গীত। নতুন দিনের দিকে এগিয়ে চলতে চলতে নিঃসঙ্গ চাঁদ অবাক চোখে চেয়ে থাকে অন্ধকার কারার দিকে। পাষাণ পুরীর

প্রাচীর ভেদ করে উঠে আলোর বন্দনা গান…প্রাণের বন্যা…আনন্দের ঢেউ…

শুভ্র জ্যোৎস্না পুলকিত যামিনীম্
ফুল্ল কুসুমিত দ্রুমদল শোভিনীম্
নমামি তারিণীম্…বন্দে মাতরম্!—

চাঁদ ডুবে যায়। ভোর রাত্রির আবছা অন্ধকারে মৃত্যুদূতরা আসে। জেলার জানায় যে সময় হয়েছে।

ও! সময় হয়ে গেছে। যাক্ একটু ব্যায়াম সেরে নেবাব ইচ্ছা ছিল।

ব্যায়াম! রীতিমত বিস্মিত হয় সবাই।

হ্যাঁ। ফাঁসি হবে বলে তার আগে পর্যন্ত নিয়মমাফিক নিত্যকার কাজ করবো না কেন?

ফাঁসিমঞ্চে উঠার আগে জেলাব প্রশ্ন কবে, আপনাদের কিছু বলার আছে?

এরা নীরব থাকে।

জেলার আবার বলে, শেষ সময়ে কারুকে কিছু বলার—

হরেন ম্লান হেসে বলে, বলার যাদের ছিল, যাদের অভিযোগে, যাদের বিচারে আমাদের দণ্ড হলো, তাদেব কারুকে তো দেখতে পাচ্ছি না। চাবপাশে শুধু আমার স্বদেশী ভাইবা আছে। বিদেশীদের আপনাবাই জানাবেন আমাদের শেষ কথা—মৃত্যু সাধনাতেই আমবা আনবো স্বাধীনতা!

১২ই জানুয়ারি, ১৯৩৪ সাল।

শীতের ম্লান সূর্য দিন শেষে দূর দিগন্তে অস্ত যায়। চট্টগ্রাম

শহরের সমুদ্র তটে অতল কালো জলের ঢেউ আছড়ে পড়ে। কাল রাত্রি ঘনিয়ে আসে।

সারা শহরে কার্ফিউ অর্ডার। জেলখানা আজ মিলিটারিদের কর্তৃত্বে।

কালি শান্তিকে বলে, জেল ওয়ার্ডারের কাছ হতে খবর পেলাম, ফাঁসির আয়োজন করছে ওরা।

সে বলে, মাস্টারদা মেথরকে দিয়ে খবর পাঠিয়েছেন—আজ সন্ধ্যায় আমাদের কিছু বলবেন।

রাজবন্দীদের দীর্ঘশ্বাস বাতাসে মিশে যায়।

দূর হতে ভেসে আসে ক্ষীণ কণ্ঠস্বর···বন্দে মাতরম্!···বন্দে মাতরম্!

ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে বন্দীরা কান পেতে শোনার চেষ্টা করে। রাজবন্দীরা কণ্ঠস্বর চিনতে পারে।

মাস্টারদা! মাস্টারদা বলছেন!

কয়েদীরা সবাই চেঁচিয়ে উঠে—। বন্দে মাতরম্! বন্দে মাতরম্!

তুমুল কোলাহল উঠে!

জেলারকে মিলিটারি সাহেব অফিসর প্রশ্ন করে, Why this commotion?

Surjya Sen is addressing the prisoners.

কনডেমড্ সেলের লৌহ গরাদ দুহাত দিয়ে ধরে দাঁড়িয়ে মাস্টারদা বলে চলেন···তাঁর অনুদাত্ত কণ্ঠস্বর ক্রমে উচ্চগ্রামে উঠে দূরত্বের যবনিকা ভেদ করে ভেসে আসে অন্ধকার কুয়াশাঘন রাত্রে। বন্দীরা সব কান পেতে শোনে···জীবনের প্রান্তে দাঁড়িয়ে মৃত্যুমুখ হতে তোমাদের পাঠাচ্ছি আমার শেষ আশীর্বাদ।—প্রথম যৌবনে একদিন পণ করেছিলাম মাতৃভূমির মুক্তির জন্য আমার দেহের শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে যাবো। আজ আমার সে প্রতিজ্ঞা সার্থক হবে—আজ আমার সৌভাগ্যের দিন।···

যে আগুন আমরা জ্বালিয়ে গেলাম, এ আগুন তোমরা নিভতে দিও না। জালিয়ানওয়ালাবাগের জবাব আমরা দিয়েছি জালালাবাদে। অত্যাচারী ইংরেজের দিন শেষ হয়ে আসছে। স্বাধীনতা সুদূর নয়। তোমাদের কাছে শুধু এক অন্তিম অনুরোধ রেখে যাই—দলাদলি করে দেশকে ডুবিও না। শাসকের নাগপাশ আমার কণ্ঠরুদ্ধ করলেও আমার এ কথা তোমরা মনে রেখো।—বন্দে মাতরম্...

মাস্টারদার পর তারেকেশ্বর দস্তিদারও কিছু বলে। বক্তৃতার পর তারকেশ্বর গান গায়।

সব ওয়ার্ডের বন্দীরা উত্তেজনায় প্রাণপণে চীৎকার করে—বন্দে মাতরম্! বন্দে মাতরম্!

মিলিটারিরা ওয়ার্ডে ঢুকে বন্দীদের মারা শুরু করে। চট্টগ্রামের বিপ্লবী বন্দীরা বেশী প্রহৃত হয়। ক্যাপ্টেন স্টিভেনসন ও মণি চৌধুরী বিচারাধীন বন্দীদের সাংঘাতিকভাবে মারেন।

সাধারণতঃ ভোর রাত্রে ফাঁসি দেওয়া হয়। কিন্তু জেলের অভ্যন্তরে এই প্রবল উত্তেজনা দেখে মাস্টারদাকে আর বেশীক্ষণ বাঁচিয়ে রাখতে তারা সাহস করে না। রাত্রি বারোটার সময় তাঁকে ফাঁসি দেওয়ার ব্যবস্থা হয় সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম করে।

মাস্টারদাকে যখন নিতে আসে, তখন তিনি বাধা দেওয়ার সঙ্কল্প করেন। আমরণ সংগ্রাম করবেন এই ছিল তাঁর প্রতিজ্ঞা। মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত শত্রুর কাছে বিনা বাধায় আত্মসমর্পন করা তাঁর অনুচিত। তাই মিলিটারিরা যেই সেলের দ্বার খোলে অমনি তিনি তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েন। প্রথমেই সামনে যাকে পান তাঁকে ঘুষি মেরে মাটিতে ফেলে দেন। তারকেশ্বরও তাঁর দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে

মিলিটারিরা সকলে মিলে এঁদের দুজনকে নির্দয়ভাবে মারা শুরু করে। মাস্টারদার দাঁতগুলি তারা ভেঙে দেয়, নাকের হাড়ও গুঁড়িয়ে

দেয়। সূর্য সেনের সারা মুখ রক্তে লাল হয়ে উঠে, তিনি সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলেন।

প্রহৃত তারকেশ্বরের রুদ্ধ কণ্ঠ হতে ভাঙা ভাঙা শব্দ ভেসে আসে—ব…ন্দে…মা…তরম্—

অন্যান্য ওয়ার্ডেও তীব্র চীৎকার উঠে। বন্দীরা মার খায়। তবু চেঁচায়—বন্দে মাতরম্!

ভীষণ বিক্ষোভে বুঝি জেলখানা আজ ভেঙে যাবে…পাষাণপুরীর বন্দীরা জেগে উঠেছে…দৈত্যের শাসন শেষ হল বোধ হয়…দেশপ্লাবী বিপ্লব-বন্যার অবরুদ্ধ উৎসমুখ বুঝি খুলে গেল তাদের আত্মদানে!

দিশাহারা শাসকেরা সূর্য সেনের অচেতন দেহই ফাঁসিমঞ্চে টেনে তোলে!

কোন সভ্য মানব কী এ দৃশ্য কল্পনা করতে পারে? বিংশ শতাব্দীর সাম্রাজ্যবাদের বর্বরতার এমনি বহু অবিশ্বাস্য নিদর্শনই আছে!…

বন্দীদের চীৎকার ও প্রহারের মাঝে ভেসে আসে একটি ক্ষীণ শব্দ—ফাঁসি দেওয়াব যান্ত্রিক এক আওয়াজ। 'লিভার' টানার সেই শব্দ শুনে বন্দীরা পাথরের মত স্থির স্তব্ধ হয়ে যায়।. সব উত্তেজনা মুহূর্তে মিলিয়ে যায়। মিলিটারিদের প্রহারের তাণ্ডবলীলা কিন্তু সারারাত্রি চলে।

মাস্টারদা ও তারকেশ্বরের মৃতদেহ জেলের মেথর কোথায় টেনে নিয়ে যায় কেউ জানে না। দুই বীর বিপ্লবীর দেহের সন্ধান কেউ আর কোন দিন পেল না!

শুধু অন্ধকার রাত্রে বিন্দু বিন্দু রক্তের ধারা মাটিতে ঝরে পড়ে রক্তিম প্রভাতের সূচনা করে গেল…রক্তবীজ…

বিপ্লব বিনাশহীন!
